বাঙলায় ইসলামী সংস্কৃতি বিকাশে হযরত শাহ্জালাল (রহ.) এর অবদান (১৩৫৪ খ্রি.–১৩৮৪ খ্রি.)

এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত গবেষণাপত্র

জুলাই ২০১৯

বাঙলায় ইসলামী সংস্কৃতি বিকাশে হযরত শাহজালাল (রহ.) এর অবদান (১৩৫৪ খ্রি.–১৩৮৪ খ্রি.)

এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত গবেষণাপত্র

জুলাই ২০১৯

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মুহাম্মদ ইউসুফ ইবন হোছাইন

অধ্যাপক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক

সালমা আক্তার

এ.ফিল গবেষক

শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

রেজি. নং : ২৪৮

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অঙ্গীকার পত্র

আমি এ মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, **"বাঙলায় ইসলামী সংস্কৃতি বিকাশে হযরত শাহজালার (রহ.) এর অবদান (১৩৫৪ খ্রি.–১৩৮৪ খ্রি.)"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভ আমার গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে, এ শিরোনামে ইতিপূর্বে অন্য কেউ গবেষণা করেনি। এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত এ গবেষণাপত্র বা এর কোন অংশ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী বা প্রকাশনার জন্য উপস্থাপিত হয়নি।

(সালামা আক্তার)
শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫
রেজি. নং : ২৪৮
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রত্যয়নপত্র

এ মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, **সালামা আক্তার** কর্তৃক উপস্থাপিত **"বাঙলায় ইসলামী সংস্কৃতি বিকাশে হযরত শাহজালার (রহ.) এর অবদান (১৩৫৪ খ্রি.–১৩৮৪ খ্রি.)"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভ আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এটি একটি মৌলিক গবেষণা। আমার জানামতে, এ অভিসন্দর্ভটি কিংবা এর অংশ অন্যের ডিগ্রী থেকে নেয়া হয়নি অথবা অন্য কোন প্রকাশনায় প্রকাশের জন্য জমা দেয়া হয়নি। সুতরাং গবেষককে এম.ফিল ডিগ্রী প্রদানের নিমিত্তে অভিসন্দর্ভটি পরীক্ষকগণের নিকট প্রেরণের জন্য জমা নেয়ার সুপারিশ করছি।

(ড. মুহাম্মদ ইউসুফ ইবন হোছাইন)
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, যার একান্ত মেহেরবানীতে **"বাঙলায় ইসলামী সংস্কৃতি বিকাশে হযরত শাহজালার (রহ.) এর অবদান (১৩৫৪ খ্রি.–১৩৮৪ খ্রি.)"** শীর্ষক শিরোনামে আমার রচিত অভিসন্দর্ভটি সমাপ্ত করতে সক্ষম হয়েছি। যথাসময়ে বিধি মোতাবেক অভিসন্দর্ভটি লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে উপস্থাপন করতে পেরে আমি মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। দুরূদ ও সালাম পেশ করছি মানবতার মুক্তির দূত মহামানব ও শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর উপর। যার প্রতিটি বাণী ও কর্মে মানবতার সার্বিক কল্যাণ নিহিত।

গবেষণা কর্মে আমার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন, আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউসুফ ইবনে হোছাইন। স্যার অত্যন্ত কর্মব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও আমার এ গবেষণার কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহ ও উদ্দীপনা দিয়েছেন। তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে আমাকে বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদান, উপদেশ ও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করে অভিসন্দর্ভ প্রস্তুতিতে সহায়তা করেছেন। এমনকি স্যারের সংগ্রহ থেকে প্রয়োজনীয় সহায়ক পুস্তক প্রদান করে এবং বিভিন্ন সময়ে নানা পুস্তকের প্রাপ্তির সংবাদ দিয়ে আমার গবেষণা কর্মকে এগিয়ে নেয়ার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছেন। তিনি গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আদ্যপ্রান্ত পরিমার্জন ও সংস্কারের দায়িত্ব পালন করে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। আমি তাঁর জন্য মহান আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম প্রতিদান কামনা করছি।

আমার গবেষণার কাজে আমাকে অনেকেই নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন, উৎসাহিত করেছেন এবং অনেকের দ্বারা আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি। তাদের মধ্যে আমার স্বামী জনাব শরীফ ইকবাল ও আমার বড় ভাই ড. মোঃ আবু হানিফ অন্যতম। তাঁরা আমাকে সার্বক্ষণিক পরামর্শ ও সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন। তাঁদের প্রতি রইল আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

আমি গভীর চিত্তে কৃতজ্ঞতা জানাই আমার শ্রদ্ধেয় আব্বা ও আম্মা এবং আমার সকল শিক্ষক, আমার ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, যাদের স্নেহে আমি লালিত-পালিত, তাঁদের দু'আ ও অকৃত্রিম স্নেহ-মমতার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।

যিনি আমার এ গবেষণা কর্ম কম্পিউটার কম্পোজ করে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন আমি তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

পরিশেষে, হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা ও দু'আ রইল আমার নয়নমণি তুল্য দুটি কন্যা সন্তান– লুবনা উমামাহ ও তাহিয়্যা আফনান (তুবা)-এর প্রতি, তাদের মায়াভরা চাহনি আর মিষ্টি হাসি আমার গবেষণার অবসাদ ও ক্লান্তিকে ভুলিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে নাজাতের উসীলা হিসেবে কবুল করুন। আমীন!

–গবেষক

শব্দ সংক্ষেপ পরিচিতি

অনু.	:	অনুবাদ
আ.	:	আলাইহিস সালাম/আলাইহাস সালাম
ই.ফা.বা.	:	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
ঈ.	:	ঈসায়ী
খ্রি./খৃ.	:	খ্রিস্টাব্দ/খৃষ্টাব্দ
জ.	:	জন্ম
তা.বি.	:	তারিখ বিহীন
পৃ.	:	পৃষ্ঠা
মৃ.	:	মৃত্যু
রহ./র.	:	রহমাতুল্লাহি আলাইহি/রাহিমাহুমুল্লাহু
রা.	:	রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু/‘আনহা (আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকুন)
সং./সংস্ক.	:	সংস্করণ
সা.	:	সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম (আল্লাহ তাঁর উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন)।
হি.	:	হিজরী
P.	:	Page.
Ed.	:	Edition.
Pub.	:	Publisher.
W.D.	:	Without Date.

সূচিপত্র

বিষয়			পৃষ্ঠা
ভূমিকা			১-২
		প্রথম অধ্যায়	
		ইসলামী সংস্কৃতির পরিচয়, উৎপত্তি ও বিকাশ	**৪-১১**
প্রথম পরিচ্ছেদ	:	**ইসলামী সংস্কৃতির পরিচয়**	৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	**ইসলামী সংস্কৃতির উৎপত্তি ও বিকাশ**	৫
		দ্বিতীয় অধ্যায়	
		হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর জীবন পরিক্রমা	**১২-৫৯**
প্রথম পরিচ্ছেদ	:	**হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর জন্ম ও পরিচয়**	**১৩**
		জীবন পরিচিতি	১৩
		হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর পিতৃ ও মাতৃ পরিচয়	১৪
		মাতৃ পরিচয়	১৫
		হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর নসবনামা বা বংশ তালিকা	১৭
		হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর জন্মস্থান	১৭
		জন্মকাল	১৯
		বাল্যকাল ও শিক্ষা	২১
		সাধনা শুরু	২৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	**স্বপ্নে ভারতবর্ষে যাওয়ার নির্দেশ ও বাংলায় আগমন**	**২৫**
		ভারতবর্ষের পথে হযরত শাহজালাল (রহ.)	২৬
		ইয়ামানের রাজার প্রতারণা	২৬
		হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর সামনে বিষের পেয়ালা	২৭
		ইয়ামেনের রাজার করুণ পরিণতি	২৮
		যুবরাজের শিষ্যত্ব গ্রহণ	২৮
		অনুসারীর দল	২৯
		আল্লাহর ওলী হযরত নিযাম উদ্দীনের সাথে শাহজালাল (রহ.)-এর সাক্ষাৎ	৩০
		কবুতর উপহার	৩২
		কবুতর সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক কিছু কথা	৩৩
		হিন্দু রাজা গৌড় গোবিন্দের সময় সিলেটের অবস্থা	৩৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
গোবিন্দের আকার-আকৃতি	৩৪
বুরহান উদ্দীনের পরিচয়	৩৫
শেখ বুরহান উদ্দীনের মানত	৩৫
শেখ বুরহান উদ্দীনের উপর মসিবত	৩৬
শেখ বুরহান উদ্দীনের প্রতি অন্যায় আচরণ	৩৭
চরম নির্যাতনের শিকার বুরহান উদ্দীনের মনে প্রতিশোধ স্পৃহা	৩৮
সন্ধির প্রতীক্ষায় গোবিন্দ	৩৯
গোবিন্দের সাথে সিকান্দার শাহের সন্ধি	৪০
বুরহান উদ্দীনের মর্মবেদনা	৪১
সাইয়্যিদ নাসিরুদ্দীন ও হযরত শাহজালাল (রহ.)	৪১
নাসিরুদ্দিনকে সম্রাটের তলব	৪৪
সিলেট অভিযানে হযরত শাহজালাল (রহ.) ও মুসলিম সেনাদল	৪৬
জায়নামায বিছিয়ে নদী পার	৪৭
সুরমা নদীর তীরে	৪৮
নির্বোধ গোবিন্দের কূট কৌশল	৪৮
হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর ঘোষণা	৪৯
মনা রায়ের দুর্গে আযান	৫১
আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের সিলেটে প্রবেশ	৫১
গৌড় গোবিন্দের সাধ	৫১
অসহায় রাজা গোবিন্দ	৫৩
হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর কর্মস্থল	৫৪
সিলেটের শাসনকর্তা	৫৫
হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর সাথে ইবনে বতুতার সাক্ষাৎ	৫৬

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলার পরিচয় ও বাংলায় ইসলামের আগমন **৬০-৭৪**

প্রথম পরিচ্ছেদ : বাংলার পরিচয় **৬০**

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বাংলায় ইসলামের আগমন **৬২**

চতুর্থ অধ্যায়

হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর আগমনের পূর্বে সিলেটের অবস্থা **৭৫-৯৮**

সিলেটের নামতত্ত্ব ৭৬

		বিষয়	পৃষ্ঠা
		ভৌগোলিক বিবরণ ও প্রসঙ্গ কথা	৭৮
		সিলেটের ভৌগোলিক পরিচিতি	৭৯
প্রথম পরিচ্ছেদ	:	**সামাজিক অবস্থা**	**৮৩**
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	**রাজনৈতিক অবস্থা**	**৮৭**
		প্রাচীন যুগ	৮৭
		সিলেটে প্রাপ্ত তাম্রশাসন	৮৮
		তুর্কি আমল	৮৯
		মুসলিম আমল	৯০
		বৃহত্তর সিলেটে রাজন্যবর্গ ও শাসকবৃন্দ	৯১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	**অর্থনৈতিক অবস্থা**	**৯৩**
		ক্রীতদাস প্রথা	৯৪
		রণপৌত ও ব্যবসা-বাণিজ্য	৯৫
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	:	**ধর্মীয় অবস্থা**	**৯৬**

পঞ্চম অধ্যায়

		সিলেটে ইসলাম প্রচার ও বাংলায় ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ	**৯৯-১৫৯**
প্রথম পরিচ্ছেদ	:	**তিনশত ষাট আউলিয়াসহ হযরত শাহজালাল (রহ.)**	**৯৯**
		গাজী সিকান্দার খান	১০০
		সেনাপতি সাইয়্যিদ নাসিরুদ্দীন (রহ.)	১০০
		নীরব সাধক সাইয়্যিদ নাসিরুদ্দীন (রহ.)	১০০
		খাজা আদীনা (রহ.)	১০১
		শাহজাদা আলী (রহ.)	১০১
		খাজা বুরহান উদ্দীন কাত্তাল (রহ.)	১০২
		হযরত নূর উল্লাহ (রহ.)	১০২
		শাহ গাবরু (রহ.)	১০৩
		হযরত চাশনী পীর (রহ.)	১০৩
		হযরত মাখদুম রহিম উদ্দীন (রহ.)	১০৪
		শাহ আলাউদ্দীন (রহ.)	১০৪
		শেখ সামসুদ্দীন বিহারী (রহ.)	১০৪
		সাইয়্যিদ শাহ মোস্তফা (রহ.)	১০৫
		হযরত শাহপীর (রহ.)	১০৭
		শাহ বদর (রহ.)	১০৭

		বিষয়	পৃষ্ঠা
		শাহ হেলিমুদ্দীন (রহ.)	১০৮
		ফতেহ গাযী (রহ.)	১১০
		শাহ শরীফ (রহ.)	১১০
		সাইয়্যিদ রুকনুদ্দীন (রহ.)	১১০
		শাহকালা মুজাররদ (রহ.)	১১১
		শাহ জিয়া উদ্দীন (রহ.)	১১১
		হামিদ ফারুকী (রহ.)	১১২
		পীর গোরাচাঁদ (রহ.)	১১২
		শাহ কামাল ও শাহ জামাল (রহ.)	১১২
		পীর জালালুদ্দীন (রহ.)	১১৩
		খতীব দাওর বখশ (রহ.)	১১৩
		কুতুবুল আওলিয়া (রহ.)	১১৪
		চন্দ্র চুরি	১১৪
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	**:**	**হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর ইসলাম প্রচার**	**১২৪**
		হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর মাহফিল	১২৫
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	**:**	**সিলেটে ইসলাম প্রচার কেন্দ্র নির্বাচন**	**১২৭**
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	**:**	**হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর কারামাত, ইবাদাত ও তাওয়াক্কুল**	**১২৯**
		অলৌকিকত্বের প্রকারভেদ	১৩০
		১. আগাম মৃত্যু সংবাদ ও নসিহত প্রদান	১৩১
		২. জায়নামাযে উপবেশন করে নদী অতিক্রমন	১৩১
		৩. ধনুতে গুন যোজন	১৩২
		৪. গৌড় গোবিন্দের প্রাসাদ ধ্বংস	১৩২
		৫. আযানের ধ্বনিতের দুর্গ পতন	১৩২
		৬. সাপুড়িয়ার ঝুড়িতে রাজা গৌড় গোবিন্দ	১৩৩
		৭. মনা রায়ের দুর্গ পতন	১৩৩
		৮. সুরমা নদীর পানি সুপেয় ও স্বাস্থ্যকর	১৩৩
		৯. দু'টি দৈত্য হত্যা	১৩৪
		১০. বাঘের উপযুক্ত বিচার	১৩৪
		১১. ইয়ামান রাজার মৃত্যু	১৩৫
		১২. শাহজালাল (রহ.)-এর ঝরণা	১৩৫
		১৩. জ্বলন্ত অঙ্গার খাদ্যে পরিণত হওয়া	১৩৬

		বিষয়	পৃষ্ঠা
		১৪. টগা তীরের সাহায্যে সপ্তকোদালী ছেদ	১৩৭
		১৫. সিলেটের নামের উৎপত্তি	১৩৭
		১৬. গজার মাছের উপাখ্যান	১৩৭
		১৭. মাযারের বৃহৎ ডেকচি	১৩৮
		১৮. সিপাহসালার নাসির উদ্দীনের মৃতদেহ শূন্যে বিলীন	১৩৯
		১৯. সিলেট-১ আসনে বিজয়ী দল সরকার গঠন করে থাকে	১৩৯
		২০. বিবি গয়রত এবং বিবির মোকাম	১৩৯
		হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর ইবাদত	১৪১
		চিরকুমার হযরত শাহজালাল (রহ.)	১৪২
		হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর তাওয়াক্কুল	১৪২
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	:	**সংস্কারক হিসেবে হযরত শাহজালাল (রহ.)**	**১৪৪**
		ইবনে বতুতার দৃষ্টিতে হযরত শাহজালাল (রহ.)	১৪৫
		কবির ভাষায় হযরত শাহজালাল (রহ.)	১৪৫
		জালালী তরীকার প্রভাব	১৪৭
		হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর শেষ জীবন	১৪৭
		খলীফাদের তলব	১৪৯
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	:	**হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর জীবনাদর্শ ও সামাজিক জীবনে এর প্রভাব**	**১৫০**
		১. অবিবাহিত জীবন যাপন	১৫০
		২. সমাজ সেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ	১৫০
		৩. অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে জিহাদ করা	১৫১
		৪. নিরীহ জন্তু-জানোয়ার ও পশুপাখির প্রতি দয়ার ব্যবহার	১৫১
		৫. আধ্যাত্মিক শক্তির চরম উৎকর্ষ সাধন	১৫১
		৬. সিলেট জেলার নওয়াবী সনদ প্রত্যাখ্যান এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে কসবে সিলেট (নিস্কর সিলেট) ঘোষণা	১৫২
		৭. সহজ সরল জীবন-যাপন	১৫২
		সামাজিক জীবনে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর প্রভাব	১৫২
		১. কিস্তি টুপি	১৫৩
		২. ধর্মপরায়ণতা	১৫৩
		৩. হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতি	১৫৩
সপ্তম পরিচ্ছেদ	:	**হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর বিদায় ভাষণ**	**১৫৫**
অষ্টম পরিচ্ছেদ	:	**হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর প্রাণ বিয়োগ**	**১৫৭**

		বিষয়	পৃষ্ঠা
		হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর পবিত্র দরগাহ শরীফ	১৫৯

ষষ্ঠ অধ্যায়

		হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর অবদান	**১৬০-১৭৬**
প্রথম পরিচ্ছেদ	:	**রাজনৈতিক ক্ষেত্রে**	**১৬০**
		অস্ত্রের শক্তি ও আধ্যাত্মিক সমন্বয় সাধন	১৬০
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	**অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে**	**১৬৩**
		রাজস্বমুক্ত সিলেট	১৬৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	**ধর্মীয় ক্ষেত্রে**	**১৬৫**
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	:	**সামরিক ক্ষেত্রে**	**১৬৭**
		সিলেট বিজয়	১৬৭
		তরফ বিজয়	১৭৩
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	:	**ইসলামী সংস্কৃতির উন্নয়নের ক্ষেত্রে**	**১৭৪**
		তরফ (লস্করপুর) মাদ্‌রাসা	১৭৪
		মুফতি মাদ্‌রাসা	১৭৪
		ফুলবাড়ী আজিরিয়া মাদ্‌রাসা	১৭৫
		সৈয়দপুর শামছিয়া মাদ্‌রাসা	১৭৫
		সৈয়দিয়া মাদ্‌রাসা, সিলেট	১৭৫
		জামেউল উলুম আলিয়া মাদ্‌রাসা, গাছবাড়ী	১৭৫
		গভর্নমেন্ট আলিয়া মাদ্‌রাসা, সিলেট	১৭৫
		উপসংহার	**১৭৭**
		পরিশিষ্ট	**১৭৮**
		গ্রন্থপঞ্জি	**১৮৫**

ভূমিকা

বাঙলায় ইসলামী সংস্কৃতি বিকাশে হযরত শাহজালাল (রহ.) এর অবদান অপরিসীম। মূলত তাঁরই কারণে আজ বাঙলায় ইসলামী কৃষ্টি-কালচার, সংস্কৃতির উন্নয়নের স্রোতধারা লক্ষ্য করা যায়।

আল্লাহর প্রদত্ত পয়গম ও ইসলামী শরীয়তের আলোকে মানুষের সামাজিক জীবনের সৌজন্যমূলক আচরণ, শিষ্টাচার, সৎকর্মশীলতা ও উন্নত নৈতিকতাকে ইসলামী সংস্কৃতি বলা হয়। মানুষের জীবনের সকল কর্মকাণ্ডই সংস্কৃতির আওতাভুক্ত। জীবন চর্চাই হলো সংস্কৃতি। আর জীবন যেহেতু গতিশীল তাই সংস্কৃতিও সব সময় গতিশীল। জীবনের শুরু যেখানে সংস্কৃতির সূচনাও সেখানেই। পৃথিবীতে মানুষের প্রথম জীবন চর্চা যেহেতু মহান আল্লাহর হেদায়াত ও আনুগত্য দিয়ে শুরু, তাই এ প্রথম জীবন চর্চাই ছিল ইসলামী সংস্কৃতির সুতিকাগার।

সুতরাং নিশ্চিতভাবেই এ কথা বলা যায় যে, হযরত আদম (আ.)-এর মাধ্যমে ইসলামী সংস্কৃতির গোড়াপত্তন হয়। যুগে যুগে নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে বিকশিত হয়ে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করেছে। মূলত মহানবী (সা.) একমাত্র উন্নত সংস্কৃতি ও জীবন ধারাকে পূর্ণতা দান করার উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন।

মোটকথা, ইসলামী সংস্কৃতি সম্পূর্ণরূপে দ্বীনভিত্তিক, আর এ দ্বীনী ভাবধারাই তার প্রাণশক্তি ও আসল নিয়ামত। এ সংস্কৃতির মাধ্যমে একজন মানুষ ধর্মভীরু, নীতিবান ও অনুপম চরিত্র মাধুর্যে সুশোভিত হতে পারে। সৎ, নিষ্ঠাবান, মানবসম্পদ সৃজনে এর বিকল্প কোন মাধ্যম নেই। ইসলাম একমাত্র আল্লাহর মনোনীত জীবন ব্যবস্থা।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) ইসলামের দাওয়াতকে নবুওয়্যাতের সূচনালগ্ন থেকে ক্রমান্বয়ে সারা বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে সচেষ্ট ছিলেন। সে দাওয়াত ছিল সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের দাওয়াত। যার লক্ষ্য ছিল জীবন জগৎ ও সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস ও অজ্ঞতা হতে মাবনজাতিকে মুক্ত করে তাদেরকে সঠিক আকীদা-বিশ্বাস, জীবন চলার পথ প্রশস্ত ও পদ্ধতির দিকে হেদায়েত দান করা। ইসলাম প্রচারশীল ধর্ম। মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় সমগ্র আরব জুড়ে ইসলাম ব্যাপ্তি লাভ করে মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর নবুওয়্যাতের ধারাবাহিকতা চিরদিনের মতো বন্ধ হয়ে যায়। তাই বলে নবুওয়্যাতের প্রচার ও প্রসার রহিত হয়ে যায়নি। মহানবী (সা.)-এর পর মহান আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে অসংখ্য মহাপুরুষ প্রেরণ করেন যাদেরকে অলী বা মুজাদ্দিদ বলা হয়।

ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম মনীষীদের তালিকায় এক অবিস্মরণীয় নাম হযরত শাহজালাল (রহ.)। ইসলামের দুর্জয় ঘাঁটি বাংলার মাটিতে ইসলাম কায়েম করে ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তির অপসারণে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর অবদান চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আর এটাও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, **"বাঙলায় ইসলামী সংস্কৃতি বিকাশে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর অবদান"** বাংলাদেশে আজকের ইসলাম ও মুসলিমদের বিকাশে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করছে। শুধু তাই নয়, তিনি বাঙলায়

ইসলামী সংস্কৃতি বিকাশে ইসলামী কৃষ্টি-কালচার, ইতিহাস ঐতিহ্য অক্ষুণ্ন রেখে ইসলাম তথা বাঙালি জাতির মূল শিক্ষার ভিত্তি সংরক্ষণ, সংস্কার ও সম্প্রসারণে যে ভূমিকা পালন করেছেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

"বাঙলায় ইসলামী সংস্কৃতি বিকাশে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর অবদান" এ শিরোনামটি নির্ধারণ করার কারণ হচ্ছে, বাঙলায় ইসলামী সংস্কৃতি বিকাশে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর অবদানের সঠিক ঐতিহাসিক লিখিত নির্ভরযোগ্য দলীল সংরক্ষিত রাখা।

হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর জীবন সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানা, বাংলাদেশে তাঁর আগমন ও ইসলাম প্রচারে ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং এ সম্পর্কে অজানাকে সুস্পষ্ট চিত্রে ফুটিয়ে তোলা। হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর অবদান সম্পর্কে সঠিক ইতিহাস জাতিকে জাগরিত করবে। হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর শিক্ষা বাংলার যুব সমাজের কাছে তুলে ধরলে বাংলায় ইসলামী সংস্কৃতি বিকাশের পথ সুগম হবে।

মহান আল্লাহর কাছে বিনীতভাবে ফরিয়াদ করছি, তিনি যেন এ গবেষণাকর্মটি কবুল করেন এবং সবার জীবনে ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ সাধিত করেন। আমীন!

প্রথম অধ্যায়

ইসলামী সংস্কৃতির পরিচয়, উৎপত্তি ও বিকাশ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসলামী সংস্কৃতির পরিচয়

মহান আল্লাহ প্রদত্ত পয়গাম ও ইসলামী শারী'আতের আলোকে মানুষের সামাজিক জীবনের সৌজন্যমূলক আচরণ, শিষ্টাচার, সৎকর্মশীলতা ও উন্নত নৈতিকতাকে ইসলামী সংস্কৃতি বলা হয়। মানুষের জীবনের সকল কর্মকাণ্ডই ইসলামী সংস্কৃতির আওতাভুক্ত, যাতে মানবতার আদর্শ মুহাম্মদ (সা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। ইসলামী চিন্তাবিদগণ ইসলামী সংস্কৃতির যে সংজ্ঞা প্রদান করেছেন সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো নিম্নরূপ :

১. বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ অধ্যাপক হাসান আইয়ুব[১] বলেন, "কুরআন ও সুন্নাহর বুনিয়াদে পরিচালিত মানব জীবনের সকল কর্মকাণ্ড, ক্রিয়াকলাপ ও আচরণই হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতি।"[২]

২. আব্দুল মান্নান তালিবের মতে, "ইসলামী জীবন চর্চাই ইসলামী সংস্কৃতি। মুসলমানরা যেভাবে তাদের জীবন গড়ে তোলে ইসলামী সংস্কৃতি ঠিক তেমনি রূপ লাভ করে। মুসলমানরা যখন পুরোপুরি ইসলাম তথা ইসলামী বিধান মেনে চলে তখন তারা পূর্ণ ইসলামী জীবন যাপন করে।"[৩]

৩. এ. জেড. এম শামসুল আলম ইসলামী সংস্কৃতিকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে, মানুষের জৈবিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণের পর যে সমস্ত আচার-আচরণ, কাজ-কর্ম, রুচি, চেতনা মানব জীবনকে সুন্দর করে এবং জীবনে আনে অনাবিল সুখ ও শান্তি সে সমস্ত আচার-আচরণকে ইসলামী সংস্কৃতি বলা যায়, যদি তা ইসলামী মূল্যবোধভিত্তিক হয়। ইসলামী সংস্কৃতির অন্যতম লক্ষ্য হলো জীবনকে সুন্দরতম করা, সুখ-শান্তি ও কল্যাণময় করা। ইসলামী সংস্কৃতির সর্বোত্তম প্রতীক হলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা.)। আর তাঁর সুন্নাহই হলো মৌলিক মুসলিম সংস্কৃতি।[৪]

৪. ইসলামী গবেষক ফায়জীর[৫] মতে, ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা আর এ জীবনব্যবস্থার চিন্তামূলক দিকই হলো ইসলামী সংস্কৃতি। তাই ইসলামী সংস্কৃতি বলতে তিনটি জিনিস বুঝায় : ১. উন্নত চিন্তার মান, যা ইসলামী রাষ্ট্রের কোন এক যুগে বাস্তবায়িত হয়েছিল। ২. ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে

---

১. ড. হাসান আইয়ুব (মৃত্যু ২০০৮ খৃ.) : বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক। ইখওয়ানুল মুসলিমীন এর প্রথম সারির নেতা। কর্ম জীবনে তিনি আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। দ্রষ্টব্য: http://ar.wikipedia.org/wiki

২. ড. হাসান আইয়ুব, *ইসলামী দর্শন ও সংস্কৃতি*, পৃ. ১৯।

৩. আবদুল মান্নান তালিব, *আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ ও ইসলাম* (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ২০০১ খৃ.), পৃ. ৯৫

৪. এ. জেড. এম শামসুল আলম, *মুসলিম সংস্কৃতি* (ঢাকা : মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ২০০২ খৃ.), পৃ. ১১

৫. আবুল ফায়েজ ফাইজী (১৫৪৭-১৫৯৫ খৃ.) : বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, মুফাস্‌সির ও চিকিৎসক। দ্রষ্টব্য: লুইস মা'লুফ, *আল-মুনজিদ ফীল-আ'লাম* (বৈরূত : দারুল মাশরিক, ১৯৮৬ খৃ.), পৃ. ৪২৫

সাহিত্য ও বিজ্ঞান এবং শিল্পের ক্ষেত্রে ইসলামের অর্জিত সাফল্য। ৩. মুসলমানদের জীবনধারা, ধর্মীয় কাজকর্ম, ভাষার ব্যবহার ও সামাজিক নিয়ম-প্রথার বিশেষ সংযোজন।

৫. মাওলানা আব্দুল রহীম[৬] বলেন, ইসলামী সংস্কৃতি হচ্ছে এক বিশেষ ধরনের মানসিক অবস্থা। যা ইসলামের মৌল শিক্ষার প্রভাবে গড়ে ওঠে। যেমন আল্লাহর একত্ব, মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও মানব বংশের ঐক্য ও সাম্য সংক্রান্ত বিশ্বাস।

৬. ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন এর মতে, 'ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সংস্কৃতিই ইসলামী সংস্কৃতি। পবিত্র কুরআন এবং সুন্নাহই হলো এর মূল ভিত্তি। কুরআন সুন্নাহর ভাবধারার সাথে সাংঘর্ষিক কোন সংস্কৃতিই ইসলামী সংস্কৃতি হতে পারে না। ইসলামের দৃষ্টিতে মানবতা বিরোধী সব কিছুই অপসংস্কৃতি।[৭]

৭. এস জেড সিদ্দীকী[৮] বলেন, ইসলামী সংস্কৃতির দু'টি অর্থ, একটি হলো তার চিরন্তন দিক। আর অপরটি হলো সাহিত্য, বিজ্ঞান, ভাষা ও সমাজ সংস্থা।[৯]

৮. মাওলানা মওদূদীর ভাষায়, "ইসলামী সংস্কৃতি কোন জাতীয়, বংশীয় বা গোত্রীয় সংস্কৃতি নয়; বরং সঠিক অর্থে এটি হচ্ছে মানবীয় সংস্কৃতি। যে ব্যক্তি তাওহীদ, রিসালাত, কিতাব ও আখিরাত বিশ্বাস করে, তাকেই সে নিজের চৌহদ্দির মধ্যে গ্রহণ করে। এভাবে এ সংস্কৃতি এক বিশ্বজনীন উদার জাতীয়তা গঠন করে, যার মধ্যে বর্ণ-গোত্র-ভাষা নির্বিশেষে সকল মানুষই প্রবেশ করতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে, সমগ্র দুনিয়ার বুকে বিস্তৃত হবার মতো অনন্য যোগ্যতা।"[১০]

পরিশেষে বলা যায় যে, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। ইসলামের আলোকে জীবন পরিচালনা করাই হলো ইসলামী সংস্কৃতি। ইসলামী চিন্তাবিদগণ ইসলামী সংস্কৃতির যে সংজ্ঞা প্রদান করেছেন, সেগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ইসলামী সংস্কৃতি বলতে বুঝানো হয়েছে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে জীবন পরিচালনাসহ সকল কর্মকাণ্ড, ক্রিয়াকলাপ ও আচার-আচরণ। আর ইসলামী সংস্কৃতি সম্পূর্ণরূপে দ্বীনভিত্তিক। এ সংস্কৃতির মাধ্যম্যে একজন মানুষ ধর্মভীরু, নীতি-নৈতিকতার আদর্শের ধারক-বাহক ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে পারে। তাই প্রতিটি মুসলিমের উচিত ইসলামী সংস্কৃতির চর্চা অব্যাহত রাখা। কেননা সৎ ও নিষ্ঠাবান মানবসম্পদ সৃজনে এর বিকল্প কোন মাধ্যম নেই।

---

৬. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম (১৯১৮-১৯৮৭ খৃ.): বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক, সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ। দ্রষ্টব্য : মাওলানা আব্দুর রহীম, *আল-কুরআ'নের আলোকে উন্নত জীবনের আদর্শ* (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৮ খৃ.), লেখক পরিচিতি অংশ।

৭. ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন, *ইসলামী সংস্কৃতি, জাতীয় সম্মেলন স্মারক* (ঢাকা : জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিষদ, ২০০৪ খৃ.), পৃ. ২৪৭

৮. বিশিষ্ট ইসলামী গবেষক ও প্রবন্ধকার। দ্রষ্টব্য: সংস্কৃতি স্মারক, ২০০৪ খৃ., প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৭

৯. আবুল কালাম আজাদ, *ইসলামী সংস্কৃতির রূপায়ন*, অপ্রকাশিত, পৃ. ৫

১০. *ইসলামী সংস্কৃতি : জাতীয় সংস্কৃতির সম্মেলন স্মারক*-২০০৪ খৃ., পৃ. ২৪৮

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলামী সংস্কৃতির উৎপত্তি ও বিকাশ

জীবন চর্চাই হলো সংস্কৃতি। আর জীবন যেহেতু গতিশীল তাই সংস্কৃতিও সব সময় গতিশীল। জীবনের শুরু যেখান থেকে সংস্কৃতির সূচনা সেখান থেকেই। পৃথিবীতে মানুষের প্রথমে জীবন চর্চা যেহেতু মহান আল্লাহর হিদায়াত ও আনুগত্য দিয়েই শুরু, তাই এ প্রথম জীবন চর্চাই ছিল ইসলামী সংস্কৃতির সূতিকাগার। সুতরাং নিশ্চিতভাবেই একথা বলা যায় যে, হযরত আদম (আ.)-এর মাধ্যমেই ইসলামী সংস্কৃতির গোড়াপত্তন হয়। যুগে যুগে নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে তা বিকশিত হয়ে শেষ রাসূলের (সা.) যুগে এসে পূর্ণতায় পৌঁছায়। মোটকথা, রাসূল (সা.) একমাত্র উন্নত সংস্কৃতি ও জীবনধারাকে পূর্ণতা দান করার উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন।[১১] একমাত্র তাঁরই আদর্শ অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا.

"নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে অনুকরণীয় আদর্শ। এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তা প্রযোজ্য, যে আল্লাহ তা'য়ালার সাক্ষাৎ পেতে আগ্রহী এবং যে পরকালের আশা করে এবং বেশি পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ করে।"[১২] তিনি আরো বলেন :

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا.

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।"[১৩]

মানুষের বিগত হাজার বছরের ইতিহাস তার সংস্কৃতির ইতিহাস। কারণ প্রথম থেকেই মানুষ সভ্য এবং একটি সুন্দর রুচিশীল সাংস্কৃতিক জীবনের অধিকারী। একটি অভিন্ন সাংস্কৃতিক জীবন ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ থেকে এর যাত্রা শুরু। আল্লাহ তা'য়ালা প্রথম মানুষকে জ্ঞান দিয়েছেন এবং সংস্কৃতি শিক্ষা দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে : وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا "এবং আল্লাহ আদম (আ.)-কে সকল বস্তুর নাম শিখিয়েছেন।"[১৪] এর অর্থ হচ্ছে তিনি সকল বস্তুর তাৎপর্য, ব্যবহারবিধি এবং অনুসঙ্গ আল্লাহর কাছ থেকে শিখেছেন। যা পরিপূর্ণ জ্ঞান তা তিনি এভাবে আহরণ করেছিলেন। তিনি কোন মুহূর্তেই পার্থিব কারো নির্দেশ পাননি; বরং মহান আল্লাহর নির্দেশে চালিত হয়ে সত্যের

---

১১. উন্নত সংস্কৃতি জীবনধারাকে পূর্ণতা দান করার জন্য আমি প্রেরিত হয়েছি। দ্রষ্টব্য: তাবারানী, *আল-মু'জামুল আওসাত* (কায়রো : মাওকা'উ জামি' আল-হাদীস, তা. বি.), ১৫শ খণ্ড পৃ. ১৬৫

১২. আল-কুরআন, ৩৩:২১

১৩. আল-কুরআন, ৫:৩

১৪. আল-কুরআন, ২:৩১

প্রবর্তনায় পার্থিব জীবনাযাপন করেছিলেন। আল্লাহ তাঁকে জ্ঞান দান করে নিজ সত্তার মধ্যে এর পরিচালনা, উন্নয়ন ও বিকাশের ক্ষমতা রেখে দিয়েছেন। যা তিনি যুগে যুগে দেশে দেশে প্রয়োগ করেছেন। ফলে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির মধ্যে এর ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে। তাই অনুসন্ধান করলে সবার মূলে একটি অভিন্ন মৌল সংস্কৃতির কাঠামো পরিদৃষ্ট হয়।[১৫]

মানুষের সংস্কৃতিতে রয়েছে একটি উল্টো ধারা। শয়তানের প্ররোচনা, বিদ্রোহ ও অবিশ্বাসই এ ধারার উৎস। সংস্কৃতিতে বিভ্রান্তি, সংস্কৃতির বিকার ও অপসংস্কৃতি এসবই এ উৎস থেকে উৎসারিত। ইসলামী সংস্কৃতির পাশাপাশি শয়তানের অপসংস্কৃতির চর্চাও আবহমানকালের। আদম ও হাওয়া (আ.) জান্নাত থেকে পৃথিবীতে অবতরণ করার সাথে সাথে শয়তানও আসে। দ্বন্দ্ব শুরু হয় সত্য ও মিথ্যার, হক ও বাতিলের, ন্যায় ও অন্যায়ের। এখানে একদিকে হিদায়াত অন্য দিকে গোমরাহী, প্রতিযোগিতা চলে সমান তালে। সংস্কৃতির সূচনা বিন্দুতে কোন ভ্রষ্টতা নেই, কোন জড়তা নেই; আছে প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত সত্যনিষ্ঠা। মানুষ কোনদিন অসভ্য, অমানুষ বা অপমানুষ ছিল না। একজন মানুষ থেকেই তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন, মহান আল্লাহ বলেন :

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ.

"হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের সেই রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক আত্মা থেকে সৃষ্টি করেছেন।"[১৬]

তদুপরি স্থান ও কাল তার বৃদ্ধির সাথে যুক্ত হয়ে মানুষ বিচিত্র ও নিত্য-নতুন রূপ নিয়েছে। জ্ঞানই মানুষকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। জ্ঞান থেকেই তার যাত্রা শুরু। জ্ঞানই শয়তানকে তার চিরশত্রুর সারিতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। শয়তানের আছে বুদ্ধির অহঙ্কার, মানুষের আছে বুদ্ধি ও জ্ঞানের সম্পদ। জ্ঞানের অভাবেই শয়তান পথভ্রষ্ট। বুদ্ধির অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্যের কারণেই শয়তান চিরকালের জন্য অভিশপ্ত। তাই শয়তানের কোন সৃষ্টি নেই, আছে শুধু ধ্বংস। মানুষের সৃষ্টিতে ভাঙ্গার কাজে তার ভূমিকা সক্রিয়। আর আদম[১৭] (আ.) নতুন পৃথিবীর সম্রাট। কারণ তার মধ্যে লজ্জাবোধ ও অনুশোচনা ছিল। তিনি সবসময় লজ্জিত ছিলেন এ কারণে যে, তিনি আল্লাহর আদেশ অমান্য করে জান্নাত থেকে বিতাড়িত হয়েছেন। আল্লাহর প্রতিনিধি ও প্রেরিত হিসেবে আদম (আ.)-এর প্রধান দায়িত্ব ছিল,

---

১৫. আবদুল মান্নান তালিব, *আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ ও ইসলাম* (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ৮৮

১৬. আল-কুরআন, ৪:১

১৭. আদম (আ.) পৃথিবীর প্রথম মানব ও প্রথম নবী। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেন। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে : আল্লাহ আদম (আ.)-কে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন যে, হও আর ওমনি সে হয়ে গেল। দ্রষ্টব্য: সূরা আলে ইমরান : ৫৯। আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-এর মাধ্যমে এ পৃথিবীতে মানব সভ্যতার সূচনা করেন। দ্রষ্টব্য: হাফিজ ইবন কাছীর, *কাসাসুল আম্বিয়া* (কায়রো : মাওকা'উ ইয়া'সূর, তা.বি.), ১ম খণ্ড পৃ. ১-৮৪; ইমাম জারীর আত-তাবারী, *তারীখুর রসূল ওয়াল মুলূক* (কায়রো : মাওকা'উল ওয়াররাক, তা.বি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২-৩৫; ইবনুল আছীর, *আল-কামিল ফীত তারীখ* (মাওকা'উল ওয়াররাক, তা.বি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ১০-২০

দুনিয়ায় আল্লাহর খিলাফত কায়েম করা এবং পৃথিবীকে মানুষের বাসোপযোগী করে তোলা। এভাবে আদম (আ.)-এর মাধ্যমে সর্বপ্রথম দ্বীন ইসলাম তথা ইসলামী সংস্কৃতির মূল ভিত্তি রচিত হয়।[১৮]

ইসলামী সংস্কৃতির পূর্ণতা আসে রাসূলুল্লাহ[১৯] (সা.)-এর মাধ্যমে। ইসলাম যেমন সকল দ্বীনের সর্বশেষ সংস্করণ, রাসূলুল্লাহ (সা.) ছিলেন তেমনি সর্বশেষ ঐশী বাণীবাহক। তাই দেখা যায়, ইসলামই একমাত্র দ্বীন যেখানে সকল দ্বীনের সুন্দরতম গুণাবলীর পূর্ণতা বিকাশ সম্ভবপর হয়েছে। আর মুহাম্মদ (সা.)-এর চরিত্র-বৈশিষ্ট্যেও সকল নবী-রাসূল ও মহাপুরুষদের শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর অভূতপূর্ব সমাবেশ ঘটেছে। তার মধ্যে আদম (আ.)-এর মহত্ত্ব, নূহ[২০] (আ.)-এর প্রচারনিষ্ঠা, সালিহ[২১] (আ.)-এর বিনীত প্রার্থনা, ইবরাহীম (আ.)-এর একত্ববাদ, ইসমাইল[২২] (আ.)-এর আত্মত্যাগ, মূসা (আ.)-এর পৌরুষ্য, হারুন[২৩] (আ.)-এর কোমলতা, ইউসুফ[২৪](আ.)-এর সৌন্দর্য, ইয়াকুব[২৫] (আ.)-এর ধৈর্য, আইয়ুব[২৬]

---

১৮. আদম (আ.)-এর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়াটি যথার্থরূপে শাস্তিস্বরূপ ছিল না যদিও শাস্তির কথা উল্লেখ আছে। জান্নাত থেকে পৃথিবীতে অবতরণ প্রাথমিক বিবেচনায় শাস্তিই মনে হবে, কিন্তু মানুষের পৃথিবীতে আগমনের ফলে সমগ্র বিশ্বে মহান আল্লাহর খিলাফত পূর্ণতা সাধন ঘটল। দ্রষ্টব্য: সৈয়দ আলী আহসান, *ইসলামের আরম্ভ ও ক্রমধারা*, অগ্রপথিক, ১০ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খৃ.), পৃ. ১০-১১

১৯. মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে আরবের মক্কা শহরে কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সর্বশেষ নবী ও রাসূল। তারপর আর কোন নবী বা রাসূল আগমন করবেন না। মহান আল্লাহ তাঁর প্রতি আল-কুরআন অবতীর্ণ করেন। ২৩ বছরের দাওয়াতী মিশন শেষে একটি সফল ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র বিনির্মাণ করে ৬৩২ খৃ. মৃত্যুবরণ করেন। দ্রষ্টব্য: *আল-মুনজিদ ফীল আ'লাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২২; *তারীখুর রসূল ওয়াল মুলূক*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৩; *আল-কামিল ফীত-তারীখ*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৯

২০. হযরত নূহ (আ.) প্রথম রাসূল এবং দ্বিতীয় নবী। আল্লাহ তাঁকে বর্তমান ফোরাত ও দজলা নদী মধ্যবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী সামীরিয় মূর্তিপূজকদের নিকট প্রেরণ করেন। তার সময়ে মহাপ্লাবনের মধ্যে সমগ্র পৃথিবী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তিনি আল্লাহর নির্দেশে একটি নৌকা তৈরি করেন এবং সামান্য কিছু সংখ্যক অনুসারীদের নিয়ে ধ্বংসের হাত থেকে মুক্তি পান। দ্রষ্টব্য: *কাসাসুল আম্বিয়া*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৪; *আল-মুনজিদ ফীল আ'লাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২২; *আল-কামিল ফীত-তারীখ*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১।

২১. হযরত সালিহ (আ.) প্রায় ৫০০০ বছর পূর্বে 'হিজর' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে ছামূদ জাতির নিকট প্রেরণ করেন। শেষ পর্যন্ত ছামূদ জাতি চরম নাফরমানী করলে আল্লাহ তাদের ধ্বংস করে দেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন, 'আমি ছামূদ সম্প্রদায়ের নিকট উটনী এনে দিলাম আর তারা তার উপর জুলুম করল' সূরা বনী ইসরাঈল : ৫৯। দ্রষ্টব্য: *কাসাসুল আম্বিয়া*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৫; *আল-মুনজিদ ফীল আ'লাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৩

২২. হযরত ইসমাঈল (আ.) হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দ্বিতীয় স্ত্রী হাজেরা (আ.)-এর গর্ভে আজ হতে প্রায় ৩৯১০ বছর পূর্বে ফিলিস্তিনের হেবরুন শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ইসমাঈল (আ.) ১৩৭ বছর জীবিত ছিলেন। দ্রষ্টব্য: *কাসাসুল আম্বিয়া*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৫; *আল-মুনজিদ ফীল আ'লাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭; *তারীখুর রসূল ওয়াল মুলূক*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২০; *আল-কামিল ফীত-তারীখ*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১

২৩. হযরত হারুন (আ.) হযরত মূসা (আ.)-এর জন্মের তিন বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন মূসা (আ.)-এর চাচাতো ভাই। আল্লাহ তাকে মূসা (আ.)-এর সাহায্যকারী হিসেবে প্রেরণ করেন। দ্রষ্টব্য: *কাসাসুল আম্বিয়া*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২; *আল-মুনজিদ ফীল আ'লাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৯

২৪. হযরত ইউসুফ (আ.)-কে আল্লাহ নবী হিসেবে বনী ইসরাঈলের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি ইয়া'কূব (আ.)-এর ১১তম সন্তান ছিলেন। পবিত্র কুরআনে তার নামে এককটি স্বতন্ত্র সূরা অবতীর্ণ হয়েছে। ইউসুফ (আ.) ১১০ বছর বয়সে মিসরে মৃত্যুবরণ করেন। দ্রষ্টব্য: *আল-মুনজিদ ফীল আ'লাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২৪; *কাসাসুল আম্বিয়া*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯০; *আল-কামিল ফীত-তারীখ*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪

(আ.)-এর সহনশীলতা, দাউদ[২৭] (আ.)-এর সাহসিকতা, সুলায়মান[২৮] (আ.)-এর বিচার জ্ঞান ও ঐশ্বর্য, ইয়াহইয়া[২৯] (আ.)-এর সরলতা, ইউনুস[৩০] (আ.)-এর অনুশোচনা, ঈসা[৩১] (আ.)-এর অমায়িকতা ইত্যাদি সকল সুমহান গুণের পূর্ণ সমন্বয় ঘটেছিল। রাসূল (সা.)-এর প্রচারিত দ্বীনে যেমন সকল দ্বীনের সারবস্তু পরিমার্জিত হয়ে বিকাশ লাভ করেছে, তেমনি তাঁর ব্যক্তি জীবন সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে সকল প্রেরিত পুরুষদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে।[৩২] তাই বলা হয়, তার প্রচারিত আদর্শই মানবজাতির জন্য পূর্ণাঙ্গ আদর্শ। কুরআন মাজীদে বিধৃত হয়েছে :

---

২৫. ইয়া'কূব (আ.) কেনানা অর্থাৎ বর্তমান ফিলিস্তিনের জেরুজালেম-এ জন্মগ্রহণ করেন। ইয়া'কূব (আ.)-এর উপাধি ছিল ইসরাঈল। হিব্রু ভাষায় ইসরাঈল শব্দের অর্থ আল্লাহর বান্দাহ। ইয়া'কূব (আ.) ১২ সন্তানের জনক ছিলেন। তিনি ১৪৭ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন এবং তাকে ফিলিস্তিনের হেবরুনে দাফন করা হয়। দ্রষ্টব্য: *কাসাসুল আম্বিয়া*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২২; *আল-মুনজিদ ফীল আ'লাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২০

২৬. আইয়ূব (আ.) খৃষ্টপূর্ব ১৫০০-১৩০০ সনের মধ্যে দক্ষিণ আরবের আওজ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দীর্ঘ ১৮ বছর অসুস্থ থাকার পর ১৪০ বছর বয়সে রোগ থেকে মুক্তি লাভ করেন। আইয়ূব (আ.) ২০১০ বছর জীবিত ছিলেন। দ্রষ্টব্য: *আল-মুনজিদ ফীল আ'লাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭; *আল-কামিল ফীত-তারীখ*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১।

২৭. দাউদ (আ.) ইয়া'কূব (আ.)-এর বংশে বর্তমান ফিলিস্তিনে জন্মগ্রহণ করেন। ৪০ বৎসর বয়সে তিনি নবুওয়াত প্রাপ্ত হন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর যাবূর নাযিল করেন। তিনি অত্যন্ত সুমিষ্ট কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। নবীদের মধ্যে দাউদ (আ.) প্রথম যিনি একাধারে রাসূল ও সুদক্ষ রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, হে দাউদ ভূ-পৃষ্ঠে আমি তোমাকে খলীফা নিযুক্ত করেছি। অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করে না। দ্রষ্টব্য: *কাসাসুল আম্বিয়া*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬২; *আল-কামিল ফীত তারিখ*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৩; *আল-মুনজিদ ফীল আ'লাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০

২৮. হযরত সুলায়মান (আ.) ছিলেন নবী এবং দাউদ (আ.)-এর সুযোগ্য পুত্র। আল্লাহ তা'আলা তাকে সীমাহীন ক্ষমতা দান করেছিলেন এবং জিন ও বায়ু প্রবাহকে তাঁর অধীন করে দিয়েছিলেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সম্পর্কে বলেন, 'আর বশীভূত করে দেয়া হয়েছে অবাধ্য জিনকে, সে সর্বপ্রকার কর্ম সম্পাদনকারী, ইমারত নির্মাণকারী এবং সমুদ্রে ডুবুরী রূপে' (সূরা সোয়াদ : ৩৭); হযরত সুলায়মান (আ.) বায়তুল মুকাদ্দাস পুনঃনির্মাণ করেন। দ্রষ্টব্য : *কাসাসুল আম্বিয়া*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮২; *আল-কামিল ফীত-তারিখ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৫; *আল-মুনজিদ ফীল আ'লাম*, পৃ. ৩০৭

২৯. হযরত ইয়াহইয়া (আ.) ছিলেন হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর পুত্র। তিনি ছিলেন ঈসা (আ.)-এর খালাতো ভাই। তাঁর প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন, 'হে যাকারিয়া! আমি নিঃসন্দেহে তোমাকে সুসংবাদ প্রদান করছি এক পুত্রের, তার নাম হবে ইয়াহইয়া। পূর্বে আর কারো জন্য এ নাম নির্ধারিত করিনি' (সূরা মারইয়াম : ৭)। দ্রষ্টব্য : *কাসাসুল আম্বিয়া*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬০; *আল-মুনজিদ ফীল আ'লাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৮

৩০. হযরত ইউনুস (আ.) ইরাকের নিনেয়া শহরে (বর্তমান নাম মাসূল) খৃষ্টপূর্ব ৩৭২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল আসতাহ। তিনি ২৮ বছর বয়সে নবুওয়াতের দায়িত্ব পান। তাঁর ব্যাপারে মহান আল্লাহ কুরআনে বলেন, 'নিশ্চয় ইউনুস প্রেরিত পুরুষদের মধ্যে অন্যতম' (সূরা আস-সাফফাত : ১৩৯)। দ্রষ্টব্য: *তারীখুর রাসূল ওয়াল মুলূক*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬২; *আল-মুনজিদ ফীল আ'লাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২৭-৬২৮; *আল-কামিল ফীত-তারীখ*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২১

৩১. ঈসা (আ.) আল্লাহর বান্দাহ, নবী ও রাসূল। আল্লাহ তাঁকে বিশেষ কুদরতে পিতা ছাড়াই জন্ম দান করেন। তাঁকে আসমানী গ্রন্থ ইনজীল দেওয়া হয়। বনী ইসরাঈল তাঁকে শুলে ছড়িয়ে হত্যার ষড়যন্ত্র করলে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ৩২ বছর বয়সে চতুর্থ আসমানে উঠিয়ে নেন। বিভিন্ন হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী কিয়ামতের পূর্বে আল্লাহ তাঁকে আবার পৃথিবীতে প্রেরণ করবেন। দ্রষ্টব্য: *তারীখুর রাসূল ওয়াল মুলূক*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫০; *আল-কামিল ফীত-তারীখ*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০২

৩২. ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন, *ইসলামী সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا.

"নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে অনুকরণীয় আদর্শ; এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ্ তা'য়ালার সাক্ষাত পেতে আগ্রহী এবং পরকালের আশা করে, যে বেশি পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ করে।"[৩৩] এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন :

وَمَآ اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ.

"রাসূল (সা.) তোমাদের নিকট যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ কর এবং তিনি যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।"[৩৪]

বস্তুত রাসূলুল্লাহ (সা.) মানবজাতিকে নিছক মুক্তির পথ দেখাননি; বরং তিনি সকল মানুষকেই ইহজগত থেকে পরজগত পর্যন্ত সুন্দর জীবনের সন্ধান ও পূর্ণস্বাদ পাওয়ার পথ দেখিয়েছেন। ইসলামী সংস্কৃতির যথার্থ বিকাশ হয়েছিল রাসূল (সা.)-এর মাধ্যমেই, কেননা একজন সংস্কৃতিবান মানুষের যেসব গুণ থাকা প্রয়োজন শৈশব থেকেই রাসূল (সা.)-এর মধ্যে তা বিদ্যমান ছিল।

একথা স্পষ্ট যে, ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ হয়েছিল স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত একটি চারিত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিচার করলে দেখা যায় যে, প্রথমে রাসূল (সা.) ও পরে হযরত খাদিজা (রা.) যে ইসলামী সমাজের ভিত্তি গড়ে তোলেন, অল্প সময়ের ব্যবধানে তাতে যোগ দেন হযরত যায়েদ ও হযরত আলী (রা.)[৩৫] তাঁরা চারজনে সে সময়ে একটি নতুন সংস্কৃতির জন্ম দেন। আরবের মুশরিক সমাজের অভ্যন্তরে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থান করেও নিজেদেরকে তাঁরা একেবারে আলাদা মনে করতে থাকেন। মুশরিকরা কা'বাঘরে যেত প্রতিমা পূজা করার জন্য; কিন্তু রাসূল (সা.)-এর অনুসারীরা কা'বাঘরে প্রতিমা পূজা করতেন না। প্রতিমাগুলোর প্রতি কোন প্রকার শ্রদ্ধাবোধ তাদের মনে জাগতো না; বরং উল্টো মূর্তিগুলোকে তারা সামান্য মাটির পুতুল এবং ক্ষমতাহীন জড় পদার্থ মনে করতেন।[৩৬]

মুশরিকরা ঘরে-বাইরে, পথে-ঘাটে, হাটে-বাজারে অন্যায়-অত্যাচার করতো। দুর্বলের উপর যুল্‌ম করতো। সুযোগ পেলে মানুষকে ঠকাতো। মিথ্যা বলা ও প্রতারণা করাকে বুদ্ধিমানের পরিচয় মনে করতো, বিশ্বস্ততা ও আমানতদারীকে বোকামী মনে করতো। কিন্তু এ নতুন মুসলিম সমাজের সদস্যবৃন্দ সর্বক্ষেত্রে ন্যায়-নীতি অবলম্বন করতেন। মানুষকে ঠকানো ও ইয়াতিমদের সম্পদ গ্রাস করাকে তাঁরা

---

৩৩. আল-কুরআন, ৩৩:২১।

৩৪. আল-কুরআন, ৫৯:৭

৩৫. হযরত 'আলী (রা.) (মৃত্যু ৬৬১ খৃ.) : পূর্ণাঙ্গ নাম 'আলী ইব্‌ন আবী তালিব ইব্‌ন 'আব্দিল মুত্তালিব। উপনাম- আবুল হুসাইন ও আবু তুরাব। উপাধি-আসাদুল্লাহ আল-গালিব। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চাচাতো ভাই ও জামাতা এবং বালকদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী। তিনি খুলাফায়ে রাশিদীনের চতুর্থ খলীফা হিসেবে পরিচিত। দ্রষ্টব্য: জালালুদ্দীন সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা* (মিসর : মাওকা' আল-ওয়াররাক, তা.বি.), পৃ. ৬৮-৭০; *আল-মুনজিদ ফিল আ'লাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৯।

৩৬. আবদুল মান্নান তালিব, *আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ ও ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

দুনিয়ার সবচেয়ে বড় যুল্‌ম মনে করতেন। আমানতদারী ছিল তাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। মুশরিকদের সংস্কৃতি থেকে মক্কায় এভাবে মুসলিমদের পৃথক সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে ওঠে। এমনিভাবে তাঁরা সব ব্যাপারে নিজেদের সাংস্কৃতিক ভিন্নতা লুকিয়ে রাখতে পারতেন। কারণ এ সবগুলোই মানবিক বিবেচনায় শ্রেষ্ঠ ও উন্নত গুণাবলী হিসেবে চিহ্নিত। স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের কারণে মানুষ এগুলোর কদর করতে অভ্যস্ত। যতদিন তাঁরা প্রকাশ্যে আল্লাহর ইবাদত করেননি, ততদিন তাঁদের অন্যান্য চারিত্রিক গুণাবলী জনসমক্ষে নন্দিত হয়েছে। কিন্তু যখনই তাঁরা কা'বাঘরে এসে মূর্তি পূজার পরিবর্তে আল্লাহর ইবাদত করতে শুরু করেছেন এবং সালাত আদায় করেছেন তখনই মুশরিকদের চোখে তাঁরা নিন্দিত হয়েছেন। মুশরিকরা বুঝতে পেরেছে এটি তাদের সংস্কৃতির উন্নত অবস্থা নয়; বরং এটি ভিন্ন একটি সংস্কৃতির রূপ, যার ভিত্তি হচ্ছে তাওহীদবাদ।[৩৭] এর সারকথা হলো এক আল্লাহর ধারণা উপস্থাপনা করা। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন :

قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ. اللهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ. وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ.

"(হে রাসূল!) আপনি বলে দিন, তিনিই আল্লাহ, যিনি একক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ অভাব মুক্ত (আল্লাহর কাছে সবাই অভাবী)। তাঁর কোন সন্তান নেই; তিনিও কারো সন্তান নন। কেউই তাঁর সাথে তুলনার যোগ্য নয়।"[৩৮]

তাই রাসূল (সা.) ইসলাম ও কুফরীর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য উল্লেখ করেছেন। হযরত জাবির (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন :

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاَةِ.

"আমি নবী কারীম (সা.)-কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয় ব্যক্তির সালাত ত্যাগ করা, শিরক ও কুফরের মধ্যবর্তীতে অবস্থান করার শামিল।"[৩৯] সালাত মুসলিম ও কাফিরদের সংস্কৃতির মধ্যে একটি স্থূল পার্থক্য রেখা চিহ্নিত করে দিয়েছে। মক্কা থেকে মদনীর মুক্ত পরিবেশে ইসলামী সংস্কৃতি দ্রুত বিকাশ লাভ করে।

এ নির্দেশ প্রত্যেক মুসলমানকে সৌন্দর্য চর্চায় উদ্বুদ্ধ করেছে। অবশ্য এর মোকাবিলায় সূফীবাদী দর্শনের একটি ধারায় অপরিচ্ছন্ন পোশাক ধারণ করার মধ্যে অহংকার নির্মূল ও আল্লাহর কাছে নিজেকে দীন-হীন হিসেবে প্রকাশ করার ধারণা পেশ করা হয়েছে। মুষ্টিমেয় একদল সূফী ও তাদের অনুসারীরা এ দর্শনে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। কিন্তু সাধারণ মুসলমান ও বৃহত্তর মুসলিম জনগোষ্ঠী, পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট বক্তব্যের মোকাবিলায় এ সূফীদর্শনকে মোটেও গুরুত্ব দেয়নি। কাজেই স্বাভাবিকভাবে মুসলিম সমাজে সৌন্দর্য চর্চা বিকাশ লাভ করেছে। মক্কা ও মদীনার মুশরিক সমাজ থেকে মুসলমানদের মধ্যে খাদ্য ও রুজি-রোজগারের মধ্যে একটি পার্থক্য বোধ জেগে উঠে। কুরআনে কিছু খাদ্যবস্তুকে হারাম

---

৩৭. আবদুল মান্নান তালিব, *আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ ও ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭

৩৮. আল-কুরআন, ১১২:১-৪

৩৯. ইমাম মুসলিম ইবন হাজ্জাজ, *আস-সহীহ*, আল-কুতুব আস-সিত্তাহ (রিয়াদ : মাকতাবাতুর রুশদ, ২০০৫ খৃ.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৬৪, হা. নং ১৩৪

Dhaka University Institutional Repository

গণ্য করে। কাফিরদের মধ্যেও তার অনেকগুলো খারাপ বিবেচিত হতো। কিন্তু এরপরও তারা সেগুলো ব্যবহার করতো। ইসলাম এ হারাম বস্তুগুলোর ব্যবসা এবং বেচাকেনা করাও হারাম গণ্য করে। এছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থোপার্জনের ক্ষেত্রে হালাল-হারামের সুস্পষ্ট সীমারেখা নির্ধারণ করে। এভাবে মুসলমানদের একটি পৃথক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। মুসলমানদের অর্থনৈতিক আচরণবিধি তাদের সংস্কৃতি বিনির্মাণে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে।[৪০]

মূলত ইসলামী সংস্কৃতির সূচনা হয় মানব সৃষ্টির শুরু থেকে অর্থাৎ হযরত আদম (আ.)-এর সময় থেকেই। মহান আল্লাহ মানুষের হিদায়াতের জন্য যুগে যুগে বহু নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। আর এ নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে তা বিকশিত হয়ে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে তা পূর্ণতায় পৌঁছায়।

৪০. আশ-শাওকানী, *ফাতহুল কাদীর* (বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, ২০০৭ খৃ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭১

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর জীবন পরিক্রমা

মহানবী (সা.)-এর জীবনকাল থেকে শুরু করে তাঁর ইন্তিকালের অর্ধশত বছরের মধ্যে ইসলাম এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল। মহানবী (সা.)-এর পর তাঁর প্রিয় সাহাবী ও তাবেয়ীগণের উত্তরসূরি আলিমগণ ইসলাম প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে থাকেন। সৈন্যবাহিনী ছাড়াও এসব আউলিয়ায়ে কেরাম ইসলাম প্রচারের জন্য দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েন।

এসব ধর্ম প্রচারকদের অনেকেই ভারতবর্ষে এসেছিলেন। কখনো ব্যক্তিগতভাবে কখনো রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ধর্ম প্রচার করেছিলেন। শায়খুল মাশাইখ শায়খ জালাল যিনি শাহজালাল নামে সমধিক পরিচিত, তিনি বিশ্বের মহান দরবেশদের মধ্যে অন্যতম।[৪১] তাঁরই অক্লান্ত কর্ম প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ ও আসামের মানুষ পবিত্র ইসলামের সন্ধান পেয়েছে। বাংলাদেশের আধ্যাত্মিক রাজধানী নামে খ্যাত সিলেট শহরই ছিল তাঁর ধর্ম প্রচারের কেন্দ্রস্থল। সিলেট শহরে সমাহিত সূফী সাধক হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর আধ্যাত্মিক প্রভাব এবং অক্লান্ত সাধনায় সিলেট, কুমিল্লা, নোয়াখালী, মোমেনশাহী, চট্টগ্রাম, ঢাকা তথা বাংলা-আসামের লক্ষ লক্ষ মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করেন। সূফী সাধকের প্রেম-ভালোবাসা, সেবা ও সাধনার প্রভাবেই বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় ইসলাম প্রচারিত হয়।

---

৪১. এ. জেড. এম শামসুল আলম, *হযরত শাহজালাল কুনিয়াভি (রহ.)* (ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল লি., ৩য় সংস্ক., ১৯৯৬ খৃ.), পৃ. ৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর জন্ম ও পরিচয়

হযরত শাহজালাল (রহ.) বাংলাদেশ ও আসাম অঞ্চলের একজন মহান ও বিশিষ্ট সূফী সাধক ছিলেন। তিনি মুসলিম বাংলার ইতিহাসেরও অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাঁকে এদেশের মুসলিম জাতি সত্তার আদি রূপকার বা 'প্রেটন সেইন্ট অব বাংলাদেশ' বলে চিহ্নিত করা হয়। তিনি এতদঞ্চলের পথিকৃৎ ইসলাম প্রচারক সূফী গুরু শায়খুল মাশায়েখ।

জীবন পরিচিতি

হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর জীবন ও কার্যকলাপ সম্পর্কে কোন প্রামাণ্য বিবরণ পাওয়া যায় না। ইবনে বতুতা (১৩০৪-১৩৭৮ খ্রি.) ও আলাউদ্দীন হোসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.) সময়কালীন দুটো শিলালিপিতে তাঁর নাম উল্লেখিত হয়েছে। ১৬১৩ খ্রি. একজন শাত্তারী[৪২] সূফী পণ্ডিত মুহাম্মদ গাউস মানডুবীহ কর্তৃক সংকলিত 'গুলজারে আবরার' গ্রন্থে শাহজালাল সম্বন্ধে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। এই লেখক দাবী করেন যে, তিনি তথ্য সংগ্রহ করেছেন শায়খ আলী শের রচিত 'শারহ-ই নুজহাতুল আরওয়াহ' নামক গ্রন্থ থেকে। শায়খ আলী শের সিলেটের শায়খ জালালের শিষ্য ও সঙ্গী শায়খ নুরুল হুদার একজন বংশধর। আধুনিক কালে হযরত শাহজালাল সম্পর্কে লিখিত প্রথম জীবনী গ্রন্থ হচ্ছে 'সুহেল-ই ইয়ামন'। সিলেটের মুন্সেফ মৌলভী নাসির উদ্দিন হায়দার ফার্সী ভাষায় ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থখানি রচনা করেন এবং তা লক্ষ্ণৌর নেওল কিশোর কর্তৃক প্রকাশিত হয়। সিলেটের মুফতি পরিবারের কাজী মুহাম্মদ হাসানের লাইব্রেরীতে দু'খানি ফার্সী পাণ্ডুলিপি ছিল, একখানি মুহী-উদ-দীন খাদিমের 'রিসালা' এবং অন্য খানি অজ্ঞাত নামা লেখকের 'রাওদ্বাত-উস-সালাতিন'। দু'খানি পাণ্ডুলিপিই বর্তমানে পাওয়া যায় না, তবে নাসির উদ-দীন হায়দার 'সুহেল-ই ইয়ামন' লেখার সময় ঐ দুটি পাণ্ডুলিপির সাহায্য নেন। ঐ দু'খানি পাণ্ডুলিপিও সিলেট মুসলিম বিজয়ের চারশ বছর পরে রচিত। প্রথমটি ১৭১১ খ্রিস্টাব্দ এবং দ্বিতীয়টি ১৭২১ খ্রিস্টাব্দে লিখিত।[৪৩] এর সমর্থন অন্যান্য সমসাময়িক বর্ণনার মধ্যে পাওয়া যায়।

হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর পৈতৃক বাসস্থান জাযিরাতুল আরবের ইয়ামান দেশ। তাঁর পিতার নাম মুহাম্মদ, পিতামহের নাম ইবরাহীম। বাল্যকালে তাঁর পিতা-মাতা ইন্তেকাল করেন। শৈশবে তাঁর মামা সৈয়দ আহমদ কবীর সোহরাওয়ার্দী তাঁকে পুত্র সম লালন-পালন করেন। তাঁর পিতা কুরাইশ ও মাতা সৈয়দ তনয়া ছিলেন।

---

৪২. পঞ্চদশ শতকে শাত্তারিয়া তরিকা বাংলাদেশে প্রবর্তিত হয়। বিখ্যাত সূফী তাইফুর বিস্তামী (৭৫৩-৮৪৫ ঈ.) থেকে এই সিলসিলার উৎপত্তি নিরূপণ করা হয়। ড. এম. এ. রহিম, অনু. মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২য় সংস্ক., ২০০৮ খৃ.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৩

৪৩. প্রফেসর আহমেদ শরীফ উদ্দিন, *সিলেটের ইতিহাস ও ঐতিহ্য* (ঢাকা : বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, ১ম সংস্ক., ১৯৯৯), পৃ. ১০৭

হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর বাল্য জীবন ইতিহাসের হারানো অধ্যায়। তার পিতা মুহাম্মদ অত্যল্প বয়সেই জিহাদে শহীদ হন। সম্ভবত সুন্দর এ পৃথিবীর আলো দেখার পূর্বেই শাহজালাল (রহ.) পিতৃ হারা হন। হযরত শাহাজালাল (রহ.)-এর পরিবারে জিহাদের ঐতিহ্য ছিল। জিহাদী প্রেরণা ছিল তার শোণিতে। পরবর্তী জীবনে তাঁকে দেখতে পাওয়া যায় সংগ্রামী মহামানব রূপে। অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে তিনি জীবনভর সংগ্রাম করে গেছেন। ৯১৮ হি./১৫১২ খ্রি. সুলতান হোসেন শাহের আমলের একটি শিলালিপিতেও[৪৪] হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর পিতার নাম মুহাম্মদ বলে উল্লেখ রয়েছে। এইচ. ইস্টাপলটন শিলালিপির সংশ্লিষ্ট অংশের নিম্নরূপ অনুবাদ করেছেন :

In the honour of the greatness of the respected Shaikhul Mashaikh Makhdum Shaikh Jalal Muzarrad son of Muhammad. [৪৫]

অর্থাৎ "শিলালিপির ভাষায় বআজমতে শায়খুল মাশাইখ মাখদুম শায়খ জালাল মুজাররদ বিন মুহাম্মদ।" মুন্সেফ নাসির উদ্দিন হায়দার প্রণীত 'সুহেল-ই ইয়ামন' (১৮৫৯/৬০ খ্রি.) গ্রন্থ অবলম্বনে ড. জে. ওয়াইজ বলেন :

Shahjalal Mujarrad Yamani was the son of a distinguished saint, whose title of Shaikus shuyuke is still preserved. He belonged to Quraish Tribe, Shah Jalal's Father was named Muhammad. [৪৬]

হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর পিতৃ ও মাতৃ পরিচয়

হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর পিতার সঠিক নাম সম্বন্ধে কিছুটা মতভেদ পরিলক্ষিত হয় :

(১) মুন্সেফ নাসির উদ্দিন হায়দার রচিত 'সুহেল-ই ইয়ামন' (১৮৫৯ খ্রি.) নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে তার পিতার নাম মুহাম্মদ।

(২) তাওয়ারিখ-ই জালালীতে তার পিতার নাম শায়খ-উশ-শুয়ুখ মাহমুদ ইবন মুহাম্মদ ইবরাহিম।

(৩) সিলেট শহরের আম্বরখানায় (৯১১ হি.) আবিষ্কৃত হোসেন শাহী শিলালিপিতে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর পিতার নাম মুহাম্মদ বলে উল্লেখ আছে।[৪৭]

(৪) ড. ওয়াইজ 'সুহেল-ই ইয়ামন' গ্রন্থের আলোকে এশিয়াটিক সোসাইটি জার্নালে যে প্রবন্ধ লিখেছেন তাতে অবশ্য তার পিতার নাম মুহাম্মদ বলে উল্লেখ করেছেন।

---

৪৪. আহমদ হাসানদানী, *বিব্লিওগ্রাফী অব দি মুসলিম ইন্সক্রিপশন্স অব বেঙ্গল* (ঢাকা : ১৯৫৭ খৃ.), এপেনডিক্স-২, দি জার্নাল অব এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান, ভল্যুম-২, পৃ. ৭

৪৫. *জার্নাল অব এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল* (জে.এ.এস.বি, কলকাতা ১৯২২ খৃ.), পৃ. ৪১৩

৪৬. চৌধুরী নুরুল আনোয়ার হোসেন দেওয়ান, *আমাদের সুফিয়ায়ে কিরাম, অগ্রপথিক সংকলন* (ঢাকা : ইফাবা, ১ম সংস্ক., জুন ১৯৯৫), পৃ. ৫

৪৭. ড. ব্লকম্যান, *জার্নাল অব এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল* (কলকাতা : হারমিট অব কুনিয়া, ১৮৭৩ খৃ.), পৃ. ২৮০-৮১

পরবর্তীকালে অধিকাংশ জীবনী লেখক হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর পিতার নাম মাহামুদ অথবা মাহমুদ বিন মুহাম্মদ লিখেছেন।[৪৮]

(৫) হযরত শাহজালাল (রহ.) বিখ্যাত কুরাইশ বংশের লোক ছিলেন। তাঁর পিতার নাম মুহাম্মদ ও পিতামহের নাম ইবরাহীম। তাঁর পিতা মুহাম্মদ ইয়ামনীর পূর্বপুরুষ আরব দেশের ইয়ামন প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন।[৪৯] মুহাম্মদ ইয়ামনী ধর্মযুদ্ধে (জিহাদে) নিহত হন। পিতামাতা উভয়ই ছিলেন কুরাইশ বংশীয় ও বিখ্যাত ওলী আল্লাহগণের বংশধর।

(৬) হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর পিতা মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম কুরায়শী ছিলেন তাইজের (Taiez) নিকটবর্তী আজ্জান দুর্গের আমীর। তিনি ছিলেন ইয়ামনের সুলতান মালিক মুহাম্মদ শামসুদ্দীনের হাদীসের শিক্ষক। সে সময় কেন্দ্রীয় সুলতান ও শক্তিশালী সামন্ত আমীরদের মধ্যে প্রায়ই সংঘাত চলত। এরূপ এক খণ্ডযুদ্ধে শাহজালালের জন্মের পূর্বেই আমীর মুহাম্মদ শাহাদত বরণ করেন।[৫০]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণিত যে, শিলালিপিতে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর পিতার নাম মুহাম্মদ লেখা রয়েছে বিধায় তিনি শায়খ (শাহ) জালাল এবং পিতার নাম মুহাম্মদ, মাহমুদ বা মাহমুদ বিন মুহাম্মদ হতে পারে এবং তিনি কুরাইশ বংশীয়। উর্দু 'দায়েরায়ে মাআরিফে ইসলামিয়্যা' গ্রন্থে বলা হয়েছে, "হযরত শাহজালাল ইয়ামনী কা-তায়ালুক কবিলায়ে কুরাইশ ছে থা। আপকে ওয়ালিদ কা নাম মুহাম্মদ থা। যিনকে আছ'লাফ ইয়ামন ছে কাওনিয়া আয়ে থে। শাহজালাল কে ওয়ালিদাইন উনকে বাছপন হীমে ওফাত পায়ে গায়ে।"[৫১]

অর্থাৎ হযরত শাহজালাল ইয়ামনীর সম্পর্ক কুরাইশ বংশের সাথে ছিল। তার পিতার নাম মুহাম্মদ ছিল। যার পূর্ব পুরুষ ইয়ামন হতে কাওনিয়ায় এসেছিলেন। শাহজালাল (রহ.)-এর পিতা-মাতা শৈশবেই ইন্তেকাল করেছিলেন।

মাতৃ পরিচয়

হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর মাতৃ পরিচয় সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। তার জন্মের কয়েক মাস পরেই কারও কারও মতে তিনমাস পরেই পিতৃহীন শাহজালাল (রহ.) মাতৃহারা হন। মাতৃ-পিতৃহীন এ ইয়াতিম শিশুকে লালন-পালন করার ভার নেন তার এক নিকটাত্মীয়।[৫২] শিশু জালালের সাথে তার কী সম্পর্ক ছিল এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন, তিনি ছিলেন শিশুর খালু।

---

৪৮. চৌধুরী আব্দুল মালিক, *হযরত শাহজালাল* (কলিকাতা : ওরিয়েন্টাল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিসার্স লিমিটেড, তা.বি.), পৃ. ৬

৪৯. মুফতি আজহার উদ্দিন আহমদ সিদ্দিকী, *শ্রীহট্টে ইসলাম জ্যোতি* (সিলেট : ১ম সংস্ক., নভেম্বর ১৯৩৮ খৃ.), পৃ. ২২

৫০. ফজলুর রহমান, *সিলেটের একশত একজন* (সিলেট : ফখরুল কবির খাঁ, ১ম সংস্ক., এপ্রিল ১৯৯৪ খৃ.), পৃ. ১৭

৫১. *উর্দু দায়েরায়ে মাআরিফে ইসলামিয়্যা* (দানিশগা, পাঞ্জাব : ১ম সংস্ক., ১৩৯১ হি./১৯৭১ খৃ.), ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৩২

৫২. ওয়াইজড, *জার্নাল অব এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল*, কলকাতা, পৃ. ২৭৮

Dhaka University Institutional Repository

কারও কারও মতে লালন পালনকারী মনীষী ছিলেন তুর্কিস্তানের মহান সাধক খাজা সৈয়দ আহমদ ইয়াসভী। তবে অধিকাংশ লেখকের মতে তাঁর আধ্যাত্মিক উস্তাদ মাতুল এবং শিশুকালে লালন-পালনকারী সৈয়দ আহমদ কবীর সুহরাওয়ার্দী।[৫৩]

শাহজালাল (রহ.)-এর পিতা মুহাম্মদ ইয়ামনী জালাল সুরুখ বুখারী নামক জনৈক ভদ্রলোকের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। জালাল সুরুখ বুখারী উত্তরকালে ভারতবর্ষে এসে মুলতানের নিকটবর্তী উচে বসতি স্থাপন করেন এবং সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (জ. ৫৯৫ হি., মৃ. ৬৫২ হি.)। মুন্সেফ নাসির উদ্দিন হায়দার লিখেছেন যে, শাহজালাল (রহ.)-এর মাতা হযরত জালাল বুখারীর কন্যা ছিলে।[৫৪] কোন কোন জীবনী লেখক মুলতানের সৈয়দ আহমদ কবির সুহরাওয়ার্দীকে শাহজালালের মাতুল বলে উল্লেখ করেছেন।[৫৫] এ তথ্যের ভিত্তিতে তাঁর মাতার আত্মীয়-স্বজন সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করা যায়।

তবে এ তথ্য কতটুকু সঠিক তাতে সন্দেহ আছে। সৈয়দ জালাল বুখারী উচে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর পুরা নাম সৈয়দ জালাল উদ্দিন মুনীর শাহ সুরুখ বুখারী। উচের এ বিখ্যাত জালাল বুখারী সাইয়্যিদুস সা'দাত এবং সুরুখ বুখারী নামেও পরিচিত ছিলেন।

হযরত জালাল বুখারীর পাঁচ পুত্র ছিলেন। পুত্র সৈয়দ আলী সৈয়দ জাফরের জন্ম হয় বুখারাতে তাঁর বুখারার স্ত্রীর গর্ভে। উচে বসতি স্থাপন করার পর তিনি আরো বিয়ে করেন। তাঁর স্ত্রী বিবি ফাতিমার গর্ভে উচে তিন পুত্রের জন্ম হয়। তাঁরা হলেন সৈয়দ আহমদ কবির, সৈয়দ বাহাউদ্দিন এবং সৈয়দ মুহাম্মদ[৫৬] কুরাইশ বংশীয় ছিলেন। মাতা ছিলেন সৈয়দা।[৫৭] তিনিও ৩ মাসের শিশু জালালকে রেখে ইন্তেকাল করেন। এ স্থলে লক্ষণীয় যে, হযরত শাহজালালের মাজার রয়েছে উপমহাদেশের পূর্ব প্রান্তে সিলেট শহরে এবং তাঁর নানা, মামা ও মামাত ভাইয়ের মাজার রয়েছে উপমহাদেশের পশ্চিম প্রান্তে মুলতানের উচ্ শরীফে। আরও লক্ষণীয় যে, শাহজালালের বাল্যকাল বহুলাংশে রাসূলে করীম (সা.)-এর জীবনের সাথে মিলে যায়। উভয়েই পিতৃহীন হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। অতি অল্প বয়সে মাতৃহারা হন। তাঁর পিতামহ ও চাচা মামা দ্বারা লালিত পালিত হন।[৫৮]

হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর নসবনামা বা বংশ তালিকা তালিকা নিম্নে তুলে ধরা হলো :

---

৫৩. Azhar Uddin Ahmed, *Shahjalal and his Khadims* (Sylhet : Welsah Mission press, 1914), p. 37

৫৪. এ. জেড. এম শামসুল আলম, *হযরত শাহজালাল কুনিয়াভী* (রহ.), পৃ. ৩

৫৫. *Shahjalal and his Khadims,* p. 37.

৫৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

৫৭. সম্পাদনা পরিষদ, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা : ই.ফা.বা., ২য় সংস্ক., নভেম্বর ১৯৮৭ খৃ.), ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৬

৫৮. ফজলুর রহমান, *সিলেটের একশত একজন* (সিলেট : ফখরুল কবির খাঁ, ১ম সংস্ক., এপ্রিল ১৯৯৪ খৃ.), পৃ. ১৭-১৮

Dhaka University Institutional Repository

হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর নসবনামা বা বংশ তালিকা

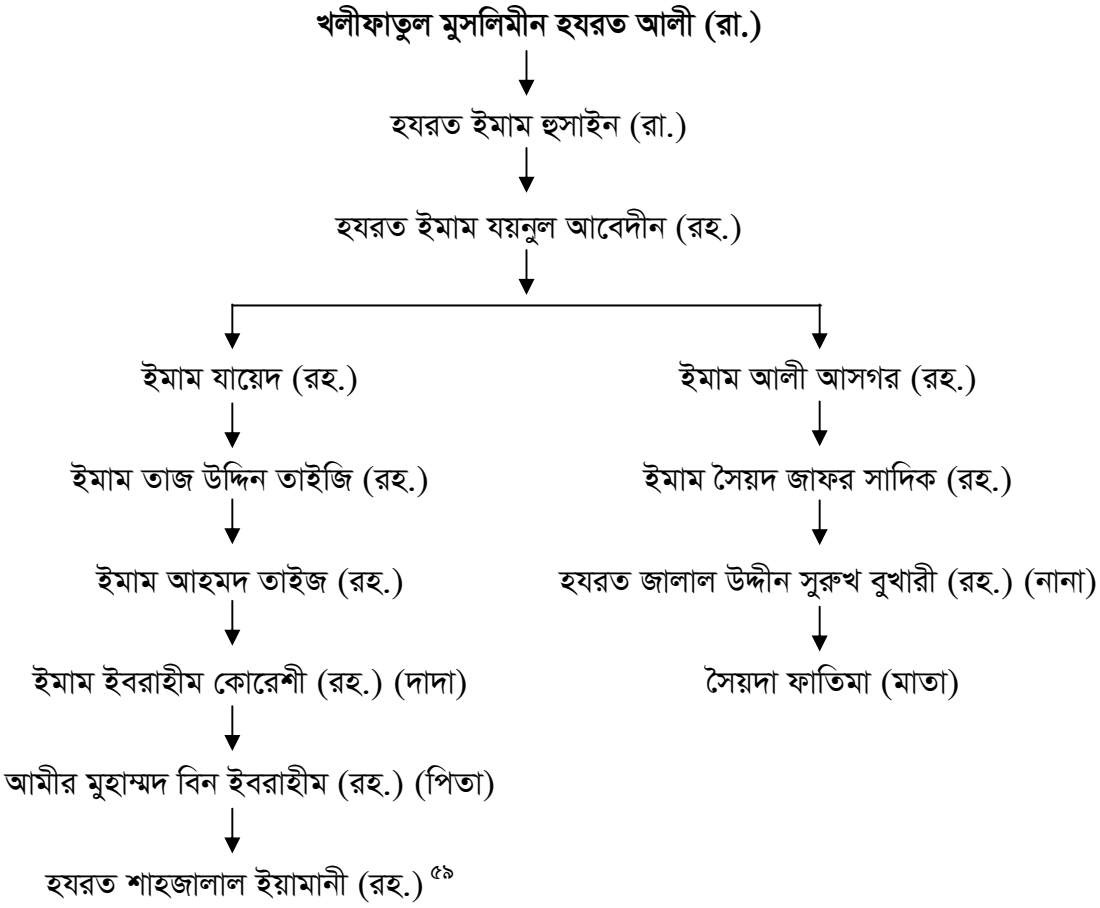

হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর জন্মস্থান

হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর জন্মস্থান নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি অভিমত হলো :

প্রথমত : সিলেট শহরের আম্বরখানায় প্রাপ্ত ৯১১/১৫০৫ সালে আবিষ্কৃত শিলালিপি অবলম্বনে হযরত শাহজালাল (রহ.)-কে কুনিয়ার অধিবাসী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৬০] উল্লেখ্য যে, কেউ কেউ উল্লেখিত হোসেন শাহী শিলালিপির সূত্রে দাবী করেন যে, সিলেটের শাহজালাল (রহ.) জন্মসূত্রে তুর্কিস্তানের কুনিয়ার অধিবাসী ছিলেন। তাঁদের মতে শিলালিপিতে শায়খ জালাল মুজাররদ কুনিয়ায়ি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি অবিবাহিত এবং কুনিয়ার লোক ছিলেন। কুনিয়া বর্তমান তুরস্কের একটি শহর।[৬১]

---

৫৯. মোস্তফা কামাল, *সিলেট বিভাগের পরিচিতি* (সিলেট : রেনেসা পাবলিকেশন্স, ২০০৪ খৃ., ১ম সংস্ক.), পৃ. ২৮

৬০. চৌধুরী নূরুল আনোয়ার হোসেন দেওয়ান, *সিলেট বিভাগের ইতিহাস* (ঢাকা : সৈয়দা তাহেরা বেগম, ১ম সংস্ক., ২০০৬ খৃ.), পৃ. ৭২

৬১. প্রফেসর আহমেদ শরীফ উদ্দিন, *সিলেটের ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয়ত : এস.এম. ইকরাম সি.এস.পি 'গুলজারে আবরার' ১৬১২ ঈ. সূত্রে দাবী করেন যে, শাহজালাল তুর্কিস্তানের জাত বাঙ্গালী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। অথচ শাহজালাল (রহ.) না ছিলেন তুর্কিস্তানী আর না ছিলেন বাঙ্গালী। তুর্কিস্তানের সূফীদের তালিকায় শায়খ জালাল বিন মুহাম্মদ বলে প্রখ্যাত কোন সূফীর উল্লেখ নেই। গুলজারে আবরারে তার মুর্শিদের নাম বলা হয়েছে সৈয়দ আহমদ ইয়েসভী। অথচ তিনি শাহজালাল (রহ.)-এর জন্মের অনেক আগে ১১৭৮ ঈসায়ী ইন্তেকাল করেন।[৬২]

তৃতীয়ত : মুফতী আজহার উদ্দিন দাবি করেন যে, কুনিয়া বুখারায় অবস্থিত। তাই তিনি বুখারার অধিবাসী। তিনি বলেন, "ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হতে আগত একদল তীর্থযাত্রী দৃঢ়তার সাথে আমাদের বলে গেছেন যে, কুনিয়া বুখারার সীমান্তবর্তী একটি ছোট শহর এবং এটা স্বয়ং তারা পরিদর্শন করে এসেছেন।"

চতুর্থত : শেখ শুভোদয়া গ্রন্থের মতে (যা ষোড়শ শতাব্দীতে লিখিত),[৬৩] তিনি ছিলেন ভারতের উত্তর প্রদেশের ইটোয়ায় অধিবাসী। জনৈক ভারতীয় লেখকের মতে, তিনি সিলেটে জন্মগ্রহণ করেন। এটাও একটা ভুয়া ও মনগড়া মত।

পঞ্চমত : শাহজালালের জন্মস্থান ইয়ামন। শাহজালাল (রহ.)-এর জীবন বৃত্তান্তের উৎস হলো দুটি প্রাচীন গ্রন্থ। ঐ প্রাচীন গ্রন্থদ্বয়ের আলোকে মুনসেফ নাসির উদ্দিন হায়দার কর্তৃক ১৯৫৯/৬০ ঈ. রচিত সুহেল-ই ইয়ামন। এতে হযরত শাহজালাল (রহ.) দক্ষিণ আরবের ইয়ামনবাসী বলা হয়।[৬৪]

হযরত শাহজালাল (রহ.) সাম্প্রতিক জীবনীকারদের মধ্যে শামসুল আলম শাহজালাল (রহ.)-কে তুর্কি বংশদ্ভূত বলে দাবি করেন। তিনি বলেন, শায়খ জালালকে যদিও ইয়ামনী বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং স্থানীয় জনসাধারণ বিশ্বাস করেন যে, তিনি ইয়ামনবাসী ছিলেন, আমরা তাঁর ইয়ামনের হওয়ার সম্ভাবনা স্বীকার করতে পারি না। আমরা দেখছি যে, তিনি তুর্কিস্তানের অন্তর্গত কুনিয়াবাসী ছিলেন। তিনি আরো বলেন, ইয়ামনী নামটি হযরত শাহজালালের নামের সঙ্গে এত বেশি জড়িতে যে, মনে হয় হযরত শাহজালালের ইয়ামন দেশের সঙ্গে বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল।[৬৫] তবে একাধিক গবেষক ও জীবনীকারের বরাত দিয়ে তিনি বলেন, "এমন হতে পারে যে, শায়খ জালালের পূর্বপুরুষ ইয়ামনবাসী ছিলেন।"

এমনকি শাহজালালের অসংখ্য হিন্দু মুসলমান ইংরেজি জীবনীকার এ বিষয়ে একমত যে, তিনি ইয়ামনী ছিলেন, আরবী ছিলেন। তাঁর এক শব্দ বিশিষ্ট নাম (জালাল) তার আরবী ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করে।[৬৬] অতএব, তাঁর আরব ও ইয়ামনী হওয়া এবং মুজাররদ (চিরকুমার) হওয়ার বিষয়টি নির্ভরযোগ্য তথ্য দ্বারা সমর্থিত। উদাহরণস্বরূপ নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিগুলো উল্লেখিত হলো :

---

৬২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

৬৩. ড. ওয়াকিল আহমদ [শেখ শুভোদয়া : হলায়ুধ মিশ্র], বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত

৬৪. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭ খৃ.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৪৯

৬৫. এ. জেড. এম. শামসুল আলম, *হযরত শায়খ জালাল (রহ.)* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩ খৃ.), পৃ. ৩১

৬৬. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৫০

Dhaka University Institutional Repository

(ক) হযরত শাহজালাল (রহ.) ছিলেন আরবের অধিবাসী। ইয়ামান দেশ থেকে দিল্লী হয়ে তিনি সিলেট আসেন এবং সেখানেই তার সাধনা সিদ্ধির বাসভূমি রচনা করেন।[৬৭]

(খ) হযরত শাহজালাল (রহ.) হিজাযের আন্তর্গত ইয়ামান প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন।[৬৮]

(গ) এশিয়া মহাদেশের আরবদেশের ইয়ামান[৬৯] প্রদেশের কুনিয়া বা কার্নিয়া নামক স্থানে তাঁর জন্ম। পিতার নাম মুহাম্মদ।

(ঘ) হযরত শাহজালাল মুজার্রদ ইয়ামান[৭০] দেশে জন্মগ্রহণ করেন।

(ঙ) সেনাপতি নাসির উদ্দীন ও সিকান্দার খান গাজী দরবেশ শাহজালাল মুজার্রদ ইয়ামানীর[৭১] (মৃত্যু ১৩৪৫ খৃ.) নেতৃত্বে পরিচালিত হয়ে শ্রীহট্টের রাজা গৌড় গোবিন্দকে পরাজিত করেন।

(চ) Shah Jalal Mujarrad-i-Yaman[৭২] (d. 1346) : The lomb of this saint of Bengal is in the district of Sylhet.

(ছ) The famous fakir Hazrat Shah Jalal had been born in Yaman[৭৩] in Arabic.

(জ) This man was a natike of Yaman[৭৪] in Arabic.

এ আলোচনায়ও হযরত শাহজালাল (রহ.) যে ইয়ামানী ছিলেন তা প্রমাণিত হয়।

জন্মকাল

হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর জন্ম তারিখ সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না। এটা অস্বাভাবিক এবং অপ্রত্যাশিত নয়। যখন এ শিশুর জন্ম হয় তখন কেউ জানতো না যে, এ সন্তানের ভবিষ্যৎ বিপুল সম্ভাবনাময়। যদিও হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর সম-সাময়িককালে ইতিহাস বিজ্ঞান যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছিল, তবুও তখনকার দিনে সাধারণত রাজা-বাদশাহদের কাহিনীই ইতিহাসে স্থান পেত। সূফী সাধকদের নীরব সাধনার কথা তৎকালীন ঐতিহাসিকদের আলোচনার বিষয় হত না। সূফী-সাধকদের জীবন কথা লিখে গেছেন তাদের ভক্ত এবং সঙ্গীগণ। দুর্ভাগ্যবশত হযরত শাহজালাল মুজাররদ (রহ.) এর সঙ্গীদের মধ্যে এমন কেউ ছিলেন না, যিনি তাঁর ঘটনাবহুল জীবনালেখ্য লিখবেন। আর যদিও কিছু লিখে থাকেন তবে যথাযথভাবে সংরক্ষিত হয়নি। ফলে পরবর্তীকালীন লেখকদের জন্য তার জীবনকালের নানা ঘটনা, জন্ম তারিখ জানা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

মুন্সেফ নাসির উদ্দিন হায়দার তাঁর 'সুহেল্-ই ইয়ামন' গ্রন্থে যে তারিখ দিয়েছেন তা শাহজালাল (রহ.)-এর জীবনের অন্যান্য ঘটনার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। তিনি লিখেছেন ৬২ বছর বয়সে ৫৯১

---

৬৭. আ. ন. ম. বজলুর রশীদ, *আমাদের সূফী সাধক* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তা.বি.), পৃ. ৬

৬৮. আবদুল জলীল, *পাক ভারতে আউলিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১

৬৯. চৌধুরী গোলাম আকবর সাহিত্যভূষণ, *ইসলাম জ্যোতি হযরত শাহজালাল (র)* (সিলেট : ১৯৭০ খৃ.), পৃ. ৯

৭০. সৈয়দ মনসুরুল হক মুনসেফ, প্রবন্ধ : *হযরত শাহজালাল (র)*, পৃ. ৭৯

৭১. ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, *মুসলিম বাংলা সহিত্য*, পৃ. ১৩

৭২. Dr. Enamul Huq, *Sufism in Bengal* (Dhaka : 1975), pp 218-24.

৭৩. B. C. Allen, C. S., *Assam District Gazetteers,* Vol. ii, Sylhet (1905), p. 24

৭৪. Provincial Gazett rs of India, *Eastern Bengal and Assam,* pp 54-65

Dhaka University Institutional Repository

হিজরীতে তার ইন্তেকাল হয়। সে হিসেবে তার জন্ম তারিখ দাঁড়ায় ৫২৯ হি.। এ সন সত্য হতে পারে না। কারণ তাতে শাহজালাল (রহ.)-এর জীবনের বহু ঘটনা অসম্ভব হয়ে যায়।[৭৫] পাশ্চাত্য লেখক গীবসের 'হিস্টরী অব ইয়ামনী ডায়নেস্টি' গ্রন্থ সূত্রে কেউ কেউ বলেন যে, হযরত শাহজালালকে ইয়ামনের শাসনকর্তা সুলতান ওমর আশরাফ ১২৯৬ সালে বিষ মিশ্রিত শরবত দিয়ে পরীক্ষা করেন। এ সময় শাহজালালের বয়স ছিল ৩০ বছর[৭৬] সে অনুযায়ী তার জন্ম তারিখ ১২৯৬-৩০ = ১২৬৬ সালে নির্ধারিত হবার কথা।

আবার বাংলা একাডেমী ১২৭১ ঈসায়ী তার জন্ম তারিখ নির্ধারণ করেছে। অথচ ১২৫৮ সালে হালাকু খান কর্তৃক বাগদাদ ধ্বংসের সময় শাহজালাল (রহ.) বাগদাদে ছিলেন। বিধায় ১২৬৬ বা ১২৭১ ঈসায়ী তাঁর জন্ম তারিখ হতে পারে না। কারণ ১২৫৮ ঈসায়ী শাহজালাল (রহ.) বাগদাদে জীবিত ছিলেন বলে স্বয়ং ইবনে বতুতা উল্লেখ করেছেন।[৭৭]

বিশিষ্ট ঐতিহাসিক বাবু সুখময় মুখোপাধ্যায় হযরত শাহজালাল ও শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিযীকে অভিন্ন দেখিয়েছেন এবং তার জন্ম তারিখ ১২০০ ঈসায়ীর কাছাকাছি সময়ে বলে উল্লেখ করেছেন। ইবনে বতুতার উক্তি অনুসারে তার জন্ম এ সময়েই। সৌরসন অনুযায়ী ১১৯৭ ঈসায়ী, চান্দ্রসন অনুযায়ী ৫৯৭ হি./ ১২০২ খৃ.।[৭৮]

ইবনে বতুতার সফর নামার আলোকে শাহজালাল (রহ.)-এর জন্ম তারিখ ৫৯৬/৫৯৮ হিজরী সালে[৭৯] নির্ধারিত হয়েছে। প্রায় সকল আধুনিক পণ্ডিতই এ তারিখের উল্লেখ করে থাকেন।[৮০]

হালাকু খান যখন বাগদাদ ধ্বংস করেছিলেন তখন সাধক শাহজালাল (রহ.) ছিলেন। ঐ ঘটনাটি ঘটেছিল ১২৫৮ ঈসায়ী তথা ৬৫৬ হিজরীতে। তখন শাহজালাল (রহ.)-এর বয়স ছিল ২৫-৩০ এর মধ্যে। এ হিসেবে অনুমান করা যায় যে, তিনি ১২২৮-এর কাছাকাছি কোন এক সময় জন্মগ্রহণ করেন।[৮১]

যদি ধরে নেয়া যায় যে, হযরত শাহজালাল (রহ.) ৩২ বছর বয়সে বাংলাদেশে উপনীত হন, তবে তাঁর জন্মতারিখ দাঁড়ায় ৬৭১ হি. (১২৭১ খৃ.)। কারণ হোসেন শাহী শিলালিপি মতে শাহজালাল (রহ.) ৭০৩ হিজরীতে সিলেট বিজয় সম্পন্ন করেন।[৮২]

---

৭৫. এ. জেড. এম শামসুল আলম, *হযরত শাহজালাল কুনিয়াভী*, পৃ. ১০

৭৬. *ইসলামী ফাউন্ডেশন পত্রিকা* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৫ খৃ.), পৃ. ৯

৭৭. *বাংলা একাডেমী চরিতাবিধান* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২য় সংস্ক., জুন ১৯৮৫ খৃ.), পৃ. ৩৭০

৭৮. অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর (১৩৩৮-১৫৩৮)* (ঢাকা : খান ব্রাদার্স এন্ড বেগ, এপ্রিল ২০০০ খৃ.), পৃ. ৬৮৮

৭৯. ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, *ইসলাম প্রসঙ্গ* (ঢাকা : রেনেসাস প্রিন্টার্স লি., ১৯৬৩ খৃ.), পৃ. ৯৮; *আল-ইসলাহ*, শাহজালাল সংখ্যা, ১৩৬৪ বাংলা

৮০. সম্পাদনা পরিষদ, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২য় সংস্ক., ১৯৮৭ খৃ.), ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৬

৮১. *মাসিক ভারতবর্ষ* (২৯শ বর্ষ, ২খ, ১ম সংস্ক., পৌষ ১৩৪৮ বাংলা), পৃ. ৪০

৮২. এ জেড এম শাসুল আলম, *হযরত শাহজালাল কুনিয়াভী (রহ.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য বিশ্ব বিখ্যাত সূফী পরিব্রাজক ইবনে বতুতার সাক্ষ্যে জানা যায় যে, শাহজালাল (রহ.) ১৫০ বছর বয়সে ৭৪৬ হিজরী ইন্তেকাল করেন। এ হিসেবে তার জন্ম তারিখ (৭৪৬-১৫০) = ৫৯৬ হিজরী সনে হয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত 'সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ'-এ তার জন্ম তারিখ ৫৯৬ হিজরী সনে নির্ধারণ করা হয়। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, তিনি ৭৪৮ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন।[৮৩]এই হিসাবে তার জন্ম তারিখ (৭৪৮-১৫০) = ৫৯৮ হিজরী সনে হয়। ড. মাহদী হাসানের মতে ৭৪৭ হিজরী/১৩৪৭ ঈসায়ী শাহজালাল (রহ.) এর মৃত্যু তারিখ মেনে নিলে তার জন্ম তারিখ হয় (৭৪৭-১৫০) = ৫৯৭ হিজরী সন। ড. এম. এ রহিম বলেন, ইবনে বতুতার বক্তব্য যদি সঠিক হয় তাহলে এ সিদ্ধ পুরুষ ১১৯৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।[৮৪] অতএব, হিজরী তারিখ উল্লেখ না করে অনেক পণ্ডিত ১১৯৭ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম তারিখ নির্ধারণ করেছেন।

তাঁর জন্ম তারিখ সংক্রান্ত সর্বশেষ সিদ্ধান্ত হচ্ছে, ইসলামী বিশ্বকোষ ২৩তম খণ্ডে শাহজালাল (রহ.)-এর জন্ম তারিখ ১১৯৭ খৃষ্টাব্দের স্থলে অধ্যাপক ড. আব্দুল করিম কর্তৃক অনুমিত ১২০১ খৃ. করা হয়েছে। কেননা এতে করে শাহজালাল (রহ.) নিজামুদ্দিন আউলিয়ার সাথে দিল্লীতে (মৃ. ১৩২৫ খৃ.) এবং ১৩০৩ খৃ. সিলেট বিজয় অভিযানে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম ছিলেন।[৮৫]

বাল্যকাল ও শিক্ষা

হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর পিতা যখন জিহাদে নিহত হন তখন তাঁর বয়স পাঁচ বছর। তাঁর মাতা জন্মের তিন মাস পর ইন্তেকাল করেন। হযরতের লালন-পালনের ভার নেন তাঁর মামা সৈয়দ আহমদ কবির (রহ.)। সৈয়দ আহমদ কবির (রহ.) দিল্লির সম্রাট ফিরোজ তুঘলকের মুরশিদ জালালউদ্দিন বুখারী মখদুম জাহানীয়ান জাহানগসতের (মৃত্যু ১৩৮৩ খৃ.) পিতা ছিলেন।[৮৬] এমনকি তিনি উচ্চ পর্যায়ের বিচক্ষণ আলিম, জ্ঞানী ও পরহিতৈষী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ইলমে মারেফতের প্রসিদ্ধ কামিল, ওলী ছিলেন। সৈয়দ আহমদ কবির (রহ.) হযরত শাহজালাল (রহ.)-কে আরবী ভাষায় কুরআন, হাদীস শিক্ষা দেয়াসহ ইসলাম ধর্মের প্রাথমিক বিষয়গুলো অভ্যস্ততার জন্য গুরুত্বারোপ করেন। পরবর্তীতে আহমদ কবির শাহজালাল (রহ.)-কে ইয়ামেন থেকে মক্কায় নিয়ে যান। কারণ মক্কা ছিল আহমদ কবিরের বাসস্থান ও সাধনার ক্ষেত্র। সেখানে অন্যান্য শিষ্যদের সাথে শাহজালালকেও উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে গড়ে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন বলে জানা যায়।[৮৭]

বালক হযরত শাহজালাল (রহ.) জন্মসূত্রেই পিতার সমস্ত গুণের ধারক ছিলেন। একদিকে তিনি যেমন ছিলেন পরম বিদ্যোৎসাহী অন্যদিকে ছিলেন তেমনি অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন। তাঁর

---

৮৩. ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, *ইসলাম প্রসঙ্গ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮

৮৪. ড. এম. এ রহিম, অনু.: মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, *বাংলায় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৩

৮৫. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১ম সংস্ক., ১৯৯৭ খৃ.), ২৩শ খণ্ড, পৃ. ৬৫৩

৮৬. সৈয়দ মুর্তজা আলী, *হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস* (ঢাকা : উৎস প্রকাশন, ২য় সংস্ক., তা.বি.), পৃ. ২০

৮৭. আলহাজ হযরত মাওলানা সিরাজুল ইসলাম, *হযরত শাহজালাল (রহ.) ও শাহ পরান (রহ.)-এর জীবনী* (ঢাকা : তানিয়া বুক ডিপো, ৫ম সংস্ক., ২০১৬ খৃ.), পৃ. ২৯

Dhaka University Institutional Repository

স্মরণশক্তি এত প্রখর ছিল যে, একটি সবক তাঁর মাত্র একবারের অধিক পড়ার প্রয়োজন হত না। তাঁর মামা সৈয়দ আহমদ কবির হযরতের এ অপূর্ব গুণসমূহ প্রত্যক্ষ করে আনন্দে ও আশায় উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন এবং তাঁকে ইল্‌মের বিভিন্ন শাখা শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করেন। হযরত শাহজালাল (রহ.) কঠোর যত্ন ও সাধনার দ্বারা কেবলমাত্র জাহেরী ইলমই নয়; সাথে সাথে বাতেনী ইলম তথা আধ্যাত্মিক ইলমও অর্জনে মনোনিবেশ করেন। একদিকে যেমন তিনি শিক্ষার্জনে আত্মনিয়োগ করেন অন্যদিকে তাঁর মামা তাঁকে মানুষের মূল সৌন্দর্য চরিত্র গঠনেরও শিক্ষা দিলেন। ফলে সংযম, সততা, বিনয় ও কোমলতা প্রভৃতি মহৎ গুণসমূহ তাঁর চরিত্রকে আরো মহৎ করে তুলল।[৮৮]

মানুষ তাঁর বাল্যস্বভাব ও আরচণ দেখে বিস্ময় ও মুগ্ধ হত। বিশেষত জালালের মাতুল আহমদ কবির (রহ.) তাঁর তীক্ষ্ণ জ্ঞান ও অভূতপূর্ব বিচক্ষণতার দ্বারা নিঃসন্দেহরূপে বুঝতে পারলেন যে, তাঁর এ বালক ভাগিনার মধ্যে অত্যুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ লুকিয়ে আছে। যথোপযুক্ত অনুশীলন-চেষ্টার মাধ্যমে নিশ্চয়ই তাঁর আত্মপ্রকাশ করবে। সুতরাং তিনি ভাগিনার বিদ্যার্জনের প্রতি উৎসাহ দিতেন এবং এ ব্যাপারে চেষ্টা ও যত্নে এতটুকু মাত্র ত্রুটি করতেন না। অত্যন্ত অল্প দিনের মধ্যে জালাল উদ্দীনের প্রতিভা পরিলক্ষিত হতে লাগল। কিন্তু মাতুলের প্রেরণায় নিজের সাধনায় মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে তাঁর এমন অবস্থা হলো যে, যে কেউ একবার তাঁর নিকটবর্তী হত বা তাঁর সাথে দু'চারটি কথা বলত তাতে তার আচরণাদি প্রত্যক্ষ করে বলতে বাধ্য হতো যে, বালক শাহজালাল এ কচি বয়সে ওলী আল্লাহর চরিত্রগুণে ভূষিত হয়েছে।

হযরত শাহজালাল (রহ.) প্রখর মেধাবী ছিলেন। মাত্র সাত বছর বয়সে তিনি সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ মুখস্থ করে একজন শ্রেষ্ঠ হাফিযে পরিণত হলেন। সাথে সাথে ইসলামী শিক্ষার বিভিন্ন শাখা যথা কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিকাহ, আকাইদ, আদব ও অন্যান্য শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। এ সময় তাঁর মামা সৈয়দ আহমদ কবির (রহ.) নিজের একার পক্ষে এতগুলো শাস্ত্রের অধ্যাপনা করা কষ্টকর বলে উচ্চ শ্রেণির বিজ্ঞ আলিমকে তিনি জালালের গৃহ শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করেন।

অতঃপর নিজে ও বিজ্ঞ আলিম সাহেব একযোগে ভাগিনাকে শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করেন। যার ফলে মাত্র ষোল বছর বয়সে জালাল উল্লেখিত শাস্ত্রগুলোর প্রত্যেকটিতে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হলেন।[৮৯]

জ্ঞান পিপাসু ব্যক্তির শেখার আগ্রহের শেষ নেই। তাইতো হযরত শাহজালাল (রহ.) এত অর্জন করার পরও যেন পরিতৃপ্ত হতে পারলেন না। যতই তিনি জানতে চান, জানার আগ্রহ যেন প্রবল থেকে প্রবলতর হতে থাকে। অনেক জ্ঞানের পরও যেন কিছুই জানতে পারেননি, এমনই এক ভাব নিয়ে তিনি কী এক অস্থিরতায় ভুগতে লাগলেন। জ্ঞানভার তাঁকে ক্রমেই বিচলিত ও অস্থির করে তুলল।

---

৮৮. সৈয়দ মুর্তজা আলী, *হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

৮৯. আলহাজ হযরত মাওলানা সিরাজুল ইসলাম, *হযরত শাহজালাল (রহ.) ও শাহ পরান (রহ.)-এর জীবনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

Dhaka University Institutional Repository

যারা সত্যিকারে মহান আল্লাহর বন্ধু, যারা সারা জাহানের শিক্ষাগুরু, তারা শিক্ষার্থীর চেহারা অবলোকন করে তার মনের ভাব উপলব্ধি করতে পারেন, হযরত সৈয়দ আহমদ কবির (রহ.) নিজেই এক জ্ঞানী ও বুযুর্গ লোক ছিলেন। তিনি দিব্যদৃষ্টি দ্বারা তাঁর প্রিয় ভাগ্নে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর মনোজ্বালা অবগত হলেন। তাই একদা তিনি তাঁকে কাছে বসিয়ে অতি সোহাগ ভরে জিজ্ঞেস করলেন– আমার মনে হয়, তুমি কোন কিছুর অভাব অনুভব করছ এবং এর কারণ উপলব্ধি করাও আমার পক্ষে তেমন একটা কঠিন নয়। আসলে সত্যিই তুমি অভাবগ্রস্ত! যে তত্ত্বজ্ঞান অর্জন করলে হৃদয়ে প্রশান্তি আসে, অন্তর পরিতৃপ্ত হয় তা এখনও তোমাকে শিক্ষা দেয়া হয়নি। এ কারণেই তুমি অস্থিরতা অনুভব করছ। এতদিন তুমি শুধু দুধ নিয়ে খেলা করেছ; কিন্তু সে দুধ হতে যেসব উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন ও খাবার তৈরি করা যায়, তার সন্ধান এখনও তুমি পাওনি। তার সন্ধান না পাওয়ার কারণেই তুমি অস্থির এবং তোমার মন ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। আস! তোমাকে আমি সে শিক্ষাই প্রদান করবো।[৯০]

হযরত শাহজালাল (রহ.) তখনও অল্প বয়স্ক বালক, এ বয়সে তরুণদের মাঝে সচারচর তারুণ্যের উচ্ছ্বাস পরিলক্ষিত হয়। হাসি, তামাশা, দৌড়-ঝাপ, খেলাধুলা ইত্যাদি নিয়েই তারা ব্যতিব্যস্ত, কিন্তু তিনি ওসবের ধারে কাছেও ছিলেন না। তারুণ্যের উচ্ছ্বাস ও যথেচ্ছাচারীতাকে তিনি খোদাভীরু ও সংযম অবলম্বনের রশি দিয়ে বেঁধে রাখলেন এবং নিজেকে উচ্চমার্গের আধ্যাত্মিক জ্ঞানার্জনে নিয়োজিত রাখলেন। তিনি তাঁর শ্রদ্ধাষ্পদ মামা সাইয়্যেদ আহমদ কবির (রহ.)-এর নিকট ইল্‌মে মা'রেফাতের শিক্ষা গ্রহণ করতে আরম্ভ করলেন।

সাধনা শুরু

হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর বহু প্রতীক্ষিত আধ্যাত্মিক সাধনা আরম্ভ হলো। ছাত্ররা পড়াশোনা করে, পরীক্ষায় পাশ করার জন্য দিনের পর দিন রাতের পর রাত কঠোর পরিশ্রম করে পড়া মুখস্থ করে। এটি একদিকে যেমন নিরস, তেমনি বিরক্তিকরও বটে। অন্যদিকে রয়েছে অনাবিল আনন্দ। সে আনন্দ পরীক্ষা পাশের। পরীক্ষায় পাস করলে সে নিজের শ্রম সফল হয়েছে বলে মনে করে এবং পুনরায় পরবর্তী পরীক্ষায় পাশ করার জন্য আবারো পাঠ আয়ত্ব করতে পাঠাভ্যাসে মনোযোগী হয়ে উঠে; কিন্তু এ সাধনা অন্য ধরনের। এখানে নিরস পাঠ মুখস্থ করতে হয় না; বরং পুস্তকে যে পাঠ পড়েছে তার নির্যাস বের করে উপভোগ করার জন্য সদা-সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হয়। এ সাধনা পড়া অপেক্ষা কঠোর হলেও এর আনন্দ সাথে সাথে লাভ করা যায়। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় না। পবিত্র কুরআন কারীমে বর্ণিত হয়েছে–[৯১] "*আলা বিযিকরিল্লাহি তাত্বমাইন্নুল কূলুব*"– সাবধান, মনে রেখ, মহান আল্লাহর যিকিরে অন্তরসমূহ পরিতৃপ্ত হয়, শান্তি পায়। এ সত্য বাস্তব এবং পরীক্ষিত।[৯২]

---

৯০. আলহাজ মাওলানা মোঃ শহীদুল ইসলাম, *হযরত শাহজালাল ও শাহ পরান (রহ.)* (ঢাকা : সালাহউদ্দিন বইঘর, ২০১৫ খৃ.), পৃ. ৩০

৯১. আল-কুরআন, ১৩:২৮

৯২. আলহাজ হযরত মাওলানা সিরাজুল ইসলাম, *হযরত শাহজালাল (রহ.) ও শাহ পরান (রহ.)-এর জীবনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

Dhaka University Institutional Repository

হযরত শাহজালাল (রহ.) একান্ত সাধনায় মনোনিবেশ করেন, হৃদয়ের আয়না পূর্ব হতেই পরিষ্কার ছিল। মা'রেফাত ও আধ্যাত্মিক সাধনায় এবার তা অধিকতর উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ হয়ে উঠল। এতদিন কামিল মামার তত্ত্বাবধানে থেকে লেখাপড়া শিখেছিলেন, যার ফলে অন্তরে বাইরের মলিনতার ছাপ লাগতে পারেনি। তাই আধ্যাত্মিকতা সাধনায় লিপ্ত হওয়ার পর অতি অল্পকালের মধ্যেই তিনি কামালিয়াত হাসিল করেছিলেন। হৃদয়ে ঐশী প্রেম স্থায়ী আসন পেতে বসল। নূরানী আলোক রশ্মিতে অন্তর প্রদীপ্ত হয়ে উঠল, তিনি কামালিয়াতের সর্বোচ্চ মাকামে পৌঁছালেন। হযরত সাইয়্যেদ আহমদ কবির (রহ.) প্রিয় এ ভাগ্নেটির আশাতীত উন্নতিতে অতিশয় পুলকিত ও আনন্দিত হলেন। তিনি নিবেদিত মনে আল্লাহর কাছে মুনাজাত করলেন, হে আল্লাহ! একে তোমার প্রিয়জনদের তালিকাভুক্ত করে নাও। তোমার সেবায় তাকে নিযুক্ত কর। সে যেন প্রতিটি মুহূর্তে তোমার যিকিরে লিপ্ত থাকে। তাকে জগৎ বরেণ্য কামিল মানুষে পরিণত করো। দুনিয়ার আসক্তি হতে তাকে মুক্ত করে একজন বিশ্ববিখ্যাত আউলিয়া ও সমাজ সংস্কারক হিসেবে নিয়োজিত কর। আমীন।[৯৩]

৯৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্বপ্নে ভারতবর্ষে যাওয়ার নির্দেশ ও বাংলায় আগমন

হযরত সাইয়্যেদ আহমদ কবীর (রহ.)-এর ভাগ্নে শাহজালাল (রহ.)-এর পরীক্ষাপর্ব সমাপ্ত হলো এবং তিনি পরীক্ষায় চমৎকারভাবে উত্তীর্ণ হলেন। ইল্‌মে শরী'আত ও ইল্‌মে মা'রেফাতে তিনি ধারণাতীত উন্নতি লাভ করেন। মুরশীদের কাছে হযরত শাহজালাল (রহ.) কামেল বলে সার্টিফিকেট লাভ করলেন। এবার তাঁকে কর্মক্ষেত্রে যোগদান করতে হবে। কিন্তু কী কাজ তাঁকে দেয়া যায় এ বিষয়ে হযরত সাইয়্যেদ আহমদ কবীর (রহ.) চিন্তা-ফিকির করতে লাগলেন।[৯৪]

দিন যাচ্ছে, দিনের পর মাস, তারপর বছর। হযরত শাহজালাল (রহ.) মামার কাছে অবস্থান করে আরো পরিপক্ক হতে লাগলেন। এ সময়ে এক রাতে হযরত শাহজালাল (রহ.) স্বপ্নে দেখলেন। কে যেন তাঁকে বলছে, 'হে শাহজালাল! তোমার সাধনা, মুরাকাবা, মোশাহাদা এবং আত্মসংযমে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা তোমার প্রতি খুবই সন্তুষ্ট হয়েছেন। তিনি তোমাকে তাঁর মাহবুব বান্দাদের মধ্যে শামিল করে নিয়েছেন। ভারতবর্ষের দায়িত্ব তোমাকে দেয়া হলো। সেখানকার জনসাধারণ মূর্তি পূজার আবর্তে নিমজ্জিত। তারা হরেক রকম পাপ কাজে মত্ত আছে। মহান আল্লাহ তা'য়ালাকে ভুলে বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা করে কালাতিপাত করছে। তাই অবিলম্বে সেখানে গিয়ে বিভ্রান্ত মানুষকে ইসলামের আলোতে আলোকিত করে তাদেরকে আল্লাহর নির্দেশিত পথে পরিচালিত করো। হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর নিদ্রা ভেঙ্গে গেল, তিনি আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ! আসসালামু আলাইকা ইয়া হাবীবাল্লাহ! বলে তড়িঘড়ি করে ঘুম থেকে উঠলেন। তিনি অবাক বিস্ময়ে দেখলেন, তাঁর কক্ষটি উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়ে আছে। এ তো দুনিয়ার আলো বলে মনে হচ্ছে না, এ আলো সমুজ্জ্বল ও স্নিগ্ধ, এর রোশনী অতি অপরূপ, অকল্পনীয় ও অতুলনীয়। ঘরটি শুধু আলোকিতই হয়নি; বরং তা এক বেহেশতি সৌরভে সুরভিত ও আমোদিত হয়ে আছে। কিছুক্ষণ পর সে স্বর্গীয় আলোকরশ্মি তিরোহিত হয়ে গেল; কিন্তু জান্নাতি সৌরভ গৃহ মধ্যে বিদ্যমান ছিল। হযরত শাহজালাল (রহ.) আশ্চর্যান্বিত হলেন। ভাবতে লাগলেন, এটি নিছক স্বপ্ন না পরোক্ষ আদেশ! সময় নষ্ট না করে তিনি হযরত সাইয়্যেদ আহমদ কবীর (রহ.)-এর নিকট গিয়ে স্বপ্নের আদ্যোপান্ত তাঁর কাছে বর্ণনা করলেন। হযরত সৈয়দ আহমদ কবীর (রহ.) বললেন, বাবা! তোমার জন্য সুসংবাদ! এটি নিছক স্বপ্ন নয়; বরং পরোক্ষভাবে আদেশের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা তোমাকে ভারতবর্ষের মানুষকে হিদায়াতের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। ভালোই হলো, তোমাকে কোন কাজে নিয়োজিত করা যায় তা নিয়ে আমিও বহুদিন যাবৎ চিন্তা-ভাবনা করে আসছিলাম। মহান আল্লাহকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং তাঁর শুকরিয়া আদায় করছি যে, তিনিই ব্যাপারটি পরিষ্কার করে দিয়েছেন। যাও! আর দেরী

৯৪. সৈয়দ মুর্তজা আলী, *হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

Dhaka University Institutional Repository

নয়। অবিলম্বে ভারতযাত্রা শুরু কর এবং সেখানকার মানুষদের মূর্তিপূজা হতে মুক্ত করে সেখানে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডিন করো।[৯৫]

হিন্দুস্থান! কে জানে দুনিয়ার কোন প্রান্তে সে দেশ। সেখানকার জলবায়ু, আবহাওয়া, পরিবেশ কোনোটির সাথে তিনি পরিচিত নন। তবুও যেতে হবে এবং প্রভুর আদেশ মতো সেখানেই ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে। হযরত শাহজালাল (রহ.) ভারতবর্ষের পরিচয় জানার জন্য উদগ্রীব হলেন। সাইয়্যেদ আহমদ কবীর (রহ.) তাঁর মনের কথা জানতে পারলেন। তিনি এক টুকরো মাটি হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর হাতে তুলে দিয়ে বললেন, চিন্তা করো না, যাও। এ মাটির টুকরোটি সাথে রাখ। যেখানে তুমি এ মাটির মত মাটি পাবে সেখানে তুমি তোমার আস্তানা বা নীড় রচনা করবে এবং সেখানেই ইসলামের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করবে। যাও বাবা! তোমাকে আমি আল্লাহর হাতে সোপর্দ করলাম। দয়াময় মহান আল্লাহ তা'য়ালাই সর্বাবস্থায় তোমাকে সাহায্য-সহযোগিতা করবেন।[৯৬]

ভারতবর্ষের পথে হযরত শাহজালাল (রহ.)

মাতৃভূমি! প্রতিটি মানুষের কাছে অতিপ্রিয়, তা যে কতবড় আকর্ষণের, তা বলে বুঝাবার মতো নয়। হৃদয়-মনের প্রতিটি তন্ত্রীর সাথে এর সম্বন্ধ। রক্তের প্রতিটি কণায় কণায়, দেহের প্রতিটি শিরা উপশিরার সাথে যোগসূত্র। কিন্তু আকর্ষণ যত গভীর হোক, আল্লাহ তা'য়ালার আদেশের মোকাবেলায় এর কোন দামই নেই। তাই হযরত শাহজালাল (রহ.) চিরদিনের মতো মাতৃভূমির মায়া ত্যাগ করে ভারতবর্ষে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে লাগলেন।

হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর ভারতবর্ষ যাত্রার কথা শুনে বারোজন দরবেশ তাঁর সাথী হলেন। বলা বাহুল্য, ওলিয়ে কামিল বলে ইতোপূর্বেই তাঁর নাম চর্তুদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু কামিল ওলীর তাতে কিইবা এসে যায়? তাঁর নামের কোন দরকার নেই। মহান আল্লাহর আদেশ পালনই তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। হযরত শাহজালাল (রহ.) এ বারোজন আউলিয়াকে সাথে নিয়ে ভারতবর্ষের দিকে রয়াওনা হলেন।[৯৭]

ইয়ামানের রাজার প্রতারণা

পবিত্র মক্কা শরীফ হতে বের হয়ে হযরত শাহজালাল (রহ.) প্রথমে ইয়ামেন গমন করেন। কারণ ইয়ামেন ছিল তাঁর মাতৃভূমি। ভারতবর্ষে যাওয়ার পূর্বে আদি পুরুষের বাসস্থান শেষ বারের মতো দেখার ইচ্ছা মনে নিয়ে হযরত শাহজালাল (রহ.) ইয়ামেনে হাজির হলেন। ঐ সময় ইয়ামেনের সর্বময় ক্ষমতা যার হাতে ছিল তিনি ছিলেন একজন সুচতুর রাজনীতিবিদ। ছলে-বলে কৌশলে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখাই ছিল তার নেশা। তার রাজ্যের ভিতর অবাধ মারামারি, কাটাকাটি, খুনাখুনি চলত; কিন্তু

---

৯৫. দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, *হযরত শাহজালাল (র)*, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় সংস্ক., ১৯৯৫ খৃ./১৪১৬ হি.), পৃ. ৪৭

৯৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

৯৭. মাওলানা সৈয়দ মোঃ মিজানুর রহমান, *হযরত শাহজালাল ও শাহ পরান (রহ.)*, (ঢাকা : রাবেয়া বুক হাউস, ১ম প্রকাশ, ২০১৪ খৃ.), পৃ. ৫৬

Dhaka University Institutional Repository

তাতে তার কোন প্রকার মাথাব্যথা ছিল না। মদ্যপান, জুয়াখেলা, যিনা-ব্যভিচার ইত্যাদির কারণে দেশে মারাত্মক অরাজকতা দেখা দিয়েছিল, রাহাজানি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল কিন্তু বাদশাহর সেদিকে আদৌ ভ্রূক্ষেপ ছিল না। অবিচার-অনাচারে গোটা দেশের অবস্থা যখন এরূপ নাজুক, তখনই শাহজালাল (রহ.) সেখানে উপস্থিত হলেন। তাঁর আগমন সংবাদ শ্রবণ করে একদল সত্যান্বেষী মানুষ শাহজালাল (রহ.)-এর সাথে দেখা করার ইচ্ছা পোষণ করল, তখন দেশটির বাদশাহ মহা চিন্তায় পড়ে গেলেন। কী জানি কোথাকার পানি কোথায় গিয়ে পড়ে। যদি তিনি সত্যিকার আল্লাহ্ তা'য়ালার ওলী হয়ে থাকেন তবে প্রজাসাধারণ তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়তে পারে। এমতাবস্থায় হয় তাকে ধর্মপরায়ণ হয়ে ন্যায়ের ভিত্তিতে দেশ পরিচালনা করতে হবে, না হয় তাকে শাসনভার ত্যাগ করতে হবে। অন্যায়ভাবে কোন কিছুই করা যাবে না।[৯৮]

বাদশাহ চিন্তা করতে লাগলেন কীভাবে এ দরবেশকে শেষ করা যায়। তিনি চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করলেন। ভণ্ড সাধু বেশ ধারণ করে তার পরিষদবর্গকে ডেকে বললেন, দেখ! জীবনে আমি শুধু পাপ অর্জন করেছি। সাওয়াবের খাতায় আমার কিছুই নেই। জীবনের শেষ সীমায় উপনীত হয়ে আমি দারুণ হতাশা ও দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছি। না জানি মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমার জন্য কী শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছেন। তাই মনে বড়ই ইচ্ছা, জীবনের এ পড়ন্ত বেলায় কোন সাধু ব্যক্তির সদুপদেশ লাভ করে তার কাছে দীক্ষা গ্রহণপূর্বক বাকি দিনগুলি পূর্ণ সাধনায় অতিবাহিত করি।

জানতে পারলাম যে, পবিত্র মক্কা শরীফ হতে আমাদের দেশে কোন এক সাধু পুরুষের আগমন ঘটেছে। তিনি নাকি আমাদের এ শহরেই অবস্থান করছেন। আমার বড়ই সাধ হয়, তাঁর কাছে মুরীদ হতে। কিন্তু কথা এ যে, তিনি সত্যিকারই মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার ওলী কিনা তা যাচাই-বাছাই না করে কীভাবে তাঁর কাছে মুরীদ হই। আপনারা যদি আমাকে একটু সাহায্য-সহযোগিতা করেন তাহলে আমি তাঁকে পরীক্ষা করে দেখতে পারি। বাদশাহর এ কথা শুনে সভাসদগণ জবাব দিলেন, এতে তো দোষের কিছুই নেই। বলুন জাঁহাপনা! আমাদের কি করতে হবে। আপনি যা বলবেন আমরা তাই করবো।[৯৯]

হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর সামনে বিষের পেয়ালা

ধূর্ত বাদশাহ বিষমিশ্রিত শরবত তৈরি করে বললেন, কিছুই করতে হবে না। শুধুমাত্র এ বিষপূর্ণ শরবতের গ্লাসটি আপনারা তাঁর কাছে পৌঁছিয়ে দিবেন। বলবেন, আপনি সিদ্ধপুরুষ! রাজ্যের বাদশাহ আপনার নাম ডাক শুনে যারপর নেই প্রিত হয়েছেন। সেজন্য আতিথেয়তাপূর্বক তিনি এ শরবতপূর্ণ গ্লাসটি পাঠিয়েছেন। দয়া করে এ শরবত পান করে তার জন্য দোয়া করলে তিনি উভয় জাহানে ধন্য হবেন বলে মনে করেন। তিনি আপনার দোয়া প্রার্থী। এর ফল এ দাঁড়াবে যে, যদি তিনি সত্যিকার আল্লাহর ওলী হয়ে থাকেন তবে তিনি আগেই সব কথা অবগত হবেন এবং অতঃপর আর কিছুতেই তিনি এ শরবত পান করবেন না। আর যদি ভণ্ড-প্রতারক দরবেশ হন তা হলে না জেনেই তিনি এ

৯৮. আলহাজ হযরত মাওলানা সিরাজুল ইসলাম, *হযরত শাহজালাল (রহ.) ও শাহ পরান (রহ.)-এর জীবনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

৯৯. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

শরবত পান করবেন এবং সাথে সাথে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বেন। এমতাবস্থায় আমরা একজন প্রতারকের হাত থেকে মুক্তি পাব। পরিষদবর্গ সবাই একথা যুক্তিযুক্ত বলে মেনে নিলে এ কাজ সমাধা করার জন্য কয়েকজন লোক নিযুক্ত করলেন। যথাসময়ে নির্বাচিত লোকগুলো শরবতের গ্লাসটি নিয়ে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর আস্তানায় উপস্থিত হলো। নিবেদন করলো, মহাত্মন! আপনার যশ ও খ্যাতি আমরা বহু পূর্ব হতেই অবগত ছিলাম। এবার স্বচক্ষে আপনাকে দেখে আমরা ধন্য হলাম। আমাদের মহামান্য বাদশাহ আপনার সুনাম শুনেছেন। আপনার সম্পর্কে তার ধারণা খুবই উচ্চ। তিনি আপনার দর্শন লাভ করার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছেন। কিন্তু রাজকার্যের নানা ঝামেলায় ব্যতিব্যস্ত থাকায় তিনি আপনার খিদমতে আসতে পারেননি। তাই তিনি উপহার স্বরূপ আপনার জন্য এ সামান্য শরবতটুকু প্রেরণ করেছেন। দয়া করে এ শরবতটুকু পান করে আমাদের বাদশাহর জন্য বিশ্ববিধাতা মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার দরবারে দোয়া করুন।[১০০]

ইয়ামেনের রাজার করুণ পরিণতি

হযরত শাহজালাল (রহ.) অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা বাদশাহর চাতুরীর কথা আগেই অবগত হতে পেরেছিলেন। শরবতের গ্লাসটি তিনি হাতে নিয়ে বললেন, আমি ফকীর মানুষ। ফকীরের জন্য এ শরবত শরাবান তাহুরা। কিন্তু এ শরবত যে প্রেরণ করেছে তার জন্য তা বিষ সমতুল্য। একথা বলেই তিনি বিসমিল্লাহ বলে সবটুকু শরবত পান করে নিলেন। মহান আল্লাহ পাকের কুদরত বুঝার সাধ্য কার! বিষপান করেও তাঁর কিছুই হলো না, এমনকি তাঁর চেহারায়ও সামান্য বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হলো না।

এদিকে বিষমিশ্রিত শরবতের গ্লাস বহনকারী দলটি হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর কাছ থেকে বাদশাহর নিকট গিয়ে দেখল, দুরাচর বাদশাহ আর ইহজগতে নেই। বিষের জ্বালায় ছটফট করতে করতে পরপারে যাত্রা করল। বলা বাহুল্য, হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর বিষপান করার সাথে সাথেই বাদশাহ মৃত্যুমুখে পতিত হলো। বিষ পান করল কে আর মরল কে? এ অত্যাশ্চর্যজনক ঘটনা দেখে বাদশাহর সভাপরিষদের সবাই তাজ্জব বনে গেল। হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর কামালিয়াত সম্বন্ধে তাদের আর কোন সন্দেহ রইল না। তাদের অনেকেই এ মহাপুরুষের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করল এবং অনেকেই তাঁর সাথী হলো।[১০১]

যুবরাজের শিষ্যত্ব গ্রহণ

উক্ত রাজ্যের বাদশাহর একমাত্র পুত্র যুবরাজ শেখ আলীই ছিলেন সিংহাসনের উত্তরাধিকারী; কিন্তু বাবার মৃত্যুর পর তার মনে এমন সংসার বিরাগী ভাব এসে গেল যে, রাজ্য ও রাজত্ব তার কাছে বিষের মতো মনে হলো। পিতার জানাযা ও দাফন কার্য শেষ করে তিনি হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর খেদমতে হাজির হলেন। বললেন, হযরত! আমাকে আপনার খেদমত করার সুযোগ দান করে ধন্য

---

১০০. দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, *হযরত শাহজালাল (র)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

১০১. আলহাজ হযরত মাওলানা সিরাজুল ইসলাম, *হযরত শাহজালাল (রহ.) ও শাহ পরান (রহ.)-এর জীবনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

Dhaka University Institutional Repository

করুন। আমাকে আপনার পদপ্রান্তে আশ্রয় দান করুন। পাপ-পঙ্কিল দুনিয়ার কুলষতা হতে আমি মুক্তি পেতে চাই। আমাকে দয়া করুন। হযরত শাহজালাল (রহ.) মুজাররদে ইয়ামনী তাকে আদরের স্বরে বললেন, বাবা! তুমি রাজপুত্র। রাজ্য পরিচালনা করাই তোমার কাজ। যাও জনগণের প্রতি ভাল ব্যবহার কর। তাদের প্রতি যুলুম-অনাচার করো না। তাদের ন্যায্য দাবি-দাওয়া মেনে নিও। তাদের প্রতি ন্যায় বিচার করো। সর্বোপরি সকল কাজে মহান আল্লাহর আইনকে প্রাধান্য দিও। আমি দোয়া করি মহান আল্লাহ তা'য়ালা তোমাকে সুষ্ঠুভাবে রাজ্য পরিচালনা করার তাওফিক দান করুন। তোমার ইহকাল ও পরকাল মঙ্গলকর হোক।[১০২]

হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর দোয়া ও এজাযত নিয়ে যুবরাজ শেখ আলী সিংহাসনে আরোহণ করলেন বটে; কিন্তু তার মন কিছুতেই রাজকার্যে বসল না। পিতা মারা যাওয়ার পর তার মনে যে বৈরাগ্যের ভাব সৃষ্টি হয়েছিল তা আর কোনভাবেই দূরীভূত হলো না। একদা গভীর রজনীতে রাজ্য, রাজত্ব, পরিবার-পরিজন সবকিছু ছেড়ে তিনি হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর পানে ধাবিত হলেন। হযরত শাহজালাল (রহ.) তো আগেই ইয়ামেন হতে ভারবর্ষের দিকে যাত্রা করেছিলেন। যুবরাজ একাধারে চৌদ্দদিন অবিরাম গতিতে সফর করার পর হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর সাথে মিলিত হলেন।

হযরত শাহজালাল (রহ.) দেখলেন যে, এ যুবরাজ আর কখনো রাজকার্যে মনোনিবেশ করতে পারবে না। অনুশোচনার যে অগ্নি তার মধ্যে প্রজ্বলিত হয়েছে, খোদার রাহে জীবন বিলিয়ে দেয়ার যে আকর্ষণ তার ভিতর পয়দা হয়েছে তা নিভার নয়। সংসার জীবনের প্রতি বিকর্ষণ শুরু হয়েছে। সুতরাং তাকে আর সংসারের মায়াজালে আবদ্ধ করে রাখা উচিত হবে না। তাই তিনি তাকে আধ্যাত্মিক সবক প্রদান করে তাঁকে সাগরিদদের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। যুবরাজ শেখ আলী মহান শিক্ষকের অনুগমন করলেন রাজ্য, রাজত্ব, পরিবার-পরিজন, সিংহাসন, পদমর্যাদা সবকিছু পশ্চাতে পড়ে রইলো। আর তিনি স্রষ্টার আকর্ষণে সামনের দিকে এগিয়ে চললেন। খোদা প্রেমের কাছে হেরে গেল সংসার জীবনের আকর্ষণ।

অনুসারীর দল

আগেই বলা হয়েছে, হযরত শাহজালাল (রহ.) যখন ভারতবর্ষের দিকে যাত্রা শুরু করেন তখন তাঁর সাথী ছিল মোট বারোজন। তাদের মধ্যে আলহাজ ইউসুফ, আলহাজ দরিয়া ও আলহাজ খলিল ছিলেন প্রধান। যাত্রার প্রারম্ভে সৈয়দ আহমদ কবীর (রহ.) যে মাটির টুকরাটুকু দিয়েছিলেন, তা তিনি অপর এক সাগরিদের হাতে অর্পণ করেন। পরবর্তীকালে তিনি সাইয়্যিদ চাশনি পীর নামে অভিহিত হন।

হযরত শাহজালাল (রহ.) যতই সামনে দিকে এগুতে থাকেন ততই তাঁর সাগরিদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। মহান আল্লাহ তা'য়ালার প্রিয় মানুষটির সাথে মিলিত হবার জন্য চার দিক হতে জনগণ ছুটে আসত। এ সফরে হযরত শাহজালাল (রহ.) বিভিন্ন স্থানে গমন করেন রোম, ইরাক, সমরকন্দ, আফগানিস্তান, গযনি, মুলতান, আজমীর প্রভৃতি স্থানে পরিভ্রমণ করে যখন তিনি ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লির যমীনে পা রাখলেন, তখন তাঁর সাগরিদের সংখ্যা অনেক বেশি। সাইয়িদ কাশিম, হেলিমুদ্দীন

১০২. মাওলানা গোলাম রহমান, *হযরত শাহজালাল (রহ.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

Dhaka University Institutional Repository

প্রভৃতি মোকাম্মেল আল্লাহর ওলিগণ হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর সাগরিদ ছিলেন। এ সমস্ত বুযুর্গগণ হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর শিষ্যত্ব লাভ করতে পেরে নিজেদেরকে ধন্য মনে করেছেন।[১০৩]

হযরত শাহজালাল (রহ.) নিবিষ্ট মনে পথ চলছেন। শুধু চলা আর চলা। বিরতিহীন চলা। পীরের আদেশ তাঁকে হিন্দুস্থানে যেতে হবে। পৌত্তলিকতার অভিশাপ দূর করে সেখানে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করতে হবে। তৎকালীন যামানায় যোগাযোগের কোন আধুনিক ব্যবস্থা ছিল না। গাড়ি ঘোড়ার কোন বালাই ছিল না। সে যামানায় হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর অবলম্বন শুধুমাত্র দুখানা পা। এ দুখানা পা অবলম্বন করেই হযরত শাহজালাল (রহ.) সামনের দিকে এগিয়ে চলেছেন। কারণ, তাকে যেভাবেই হোক পীর ও মুর্শীদের আদেশ পালন করতে হবে। পৌঁছতে হবে সুদূর ভারতবর্ষের আম-জনতার মাঝে। এক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন করা চলবে না।[১০৪]

কখনও বিস্তৃত মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকা রাশি, কখনও বিশাল ঘন পর্বতমালা, কখনও বা তুষারাবৃত পিচ্ছিল পথ ইত্যাদি অতিক্রম করে তাঁকে ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হতে হয়েছে। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত দেহ মন নিয়ে কখনও তিনি আশ্রয় নিয়েছেন মসজিদের খোলা চত্বরে, কখনও বা বেদুইনদের তাঁবুতে। শীতের প্রকোপে ভক্ত অনুরক্তদের দল এগিয়ে দিয়েছেন তাদের কম্বল, কিন্তু সেদিকে তাঁর বিন্দুমাত্র খেয়াল নেই। তিনি আপন মনে আল্লাহ্ তা'য়ালার নামের তাসবিহ জপেন আর প্রয়োজন মোতাবেক শাগরিদদের নসিহত করেন। ভারতবর্ষের পৌঁছার আগ পর্যন্ত এ ছিল তাঁর রুটিন ওয়ার্ক।

আল্লাহর ওলী হযরত নিযাম উদ্দীনের সাথে শাহজালাল (রহ.)-এর সাক্ষাৎ

হযরত নিযাম উদ্দীন আউলিয়া ছিলেন তৎকালীন সময়ে দিল্লীর বিখ্যাত ওলী। ভারতবর্ষের সর্বত্র তাঁর নাম ডাক। ভক্ত অনুরক্তের সংখ্যাও অনেক। এমতাবস্থায় হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর আগমন বার্তা জানলেন। মুরীদ বললেন, হুযূর! সুদূর পবিত্র মক্কাশরীফ হতে একজন দরবেশ দিল্লীতে আগমন করেছেন। শুনেছি তিনি নাকি খুবই কামিল দরবেশ। তিনি বিয়ে করেননি। স্ত্রীসঙ্গ তিনি ভালোবাসেন না। এমনকি মেয়েদের মুখ দেখা পর্যন্ত তিনি পছন্দ করেন না। তাই তিনি পথ চলার সময় তার মুখ ঢেকে পথ অতিক্রম করেন। তার খিদমতের জন্য ছোট একটি বালক রয়েছে। সে বালকটিই তার সকল কাজ-কর্ম সম্পাদন করে দেয়।

মুরীদের মুখে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর আগমন বার্তা শ্রবণ করে হযরত নিযাম উদ্দীন (রহ.)-এর সন্দেহ হল। হযরত শাহজালাল (রহ.) ভণ্ড না সত্যিকার আল্লাহর ওলি এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত হতে পারলেন না। তাই তিনি তার এক মুরীদের মাধ্যমে হযরত শাহজালাল (রহ.)-কে নিজের আস্তানায় আমন্ত্রণ জানালেন।[১০৫]

---

১০৩. মাওলানা সৈয়দ মোঃ মিজানুর রহমান, *হযরত শাহজালাল ও শাহ পরান (রহ.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪

১০৪. আলহাজ হযরত মাওলানা সিরাজুল ইসলাম, *হযরত শাহজালাল (রহ.) ও শাহ পরান (রহ.)-এর জীবনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

১০৫. আলহাজ মাওলানা মোঃ শহীদুল ইসলাম, *হযরত শাহজালাল ও শাহ পরান (রহ.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

Dhaka University Institutional Repository

আধ্যাত্মিক সাধনার উচ্চমার্গে আরোহিত হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর নিকট এ অন্যায় সন্দেহ গোপন রইল না। তিনি হযরত নিযাম উদ্দীন (রহ.)-এর আমন্ত্রণের জবাবে একটি কৌটার মধ্যে একটি জ্বলন্ত অঙ্গার ও সামান্য তুলা পাশাপাশি রেখে তার কাছে প্রেরণ করে দিলেন। যথাসময়ে উক্ত মুরীদ কৌটাটি হযরত নিযাম উদ্দিন আউলিয়ার হাতে দিলেন। কৌতুহল সহকারে হযরত নিযাম উদ্দিন (রহ.) কৌটাটি খুলতেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন! কি আশ্চর্য! জ্বলন্ত আঙ্গারের কাছে তুলা! অথচ তুলার গায়ে আগুনের ছোঁয়াও লাগেনি। তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন যে, এ তাঁর অন্যায় সন্দেহের প্রতিবাদ। হযরত শাহজালাল (রহ.) দুনিয়ার কালিযুক্ত পরিবেশে অবস্থান করেও কলুষতা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। পাপ-পঙ্কিলতা তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নিষ্ককলঙ্ক চরিত্রের অধিকারী। হযরত নিযাম উদ্দীন আউলিয়া আপন আচরণের জন্য খুবই অনুতপ্ত হলেন। মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে তিনি প্রাণপনে ছুটে চললেন হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর আস্তানা অভিমুখে। হযরত শাহজালাল (রহ.) এমন একটি মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। হযরত নিজাম উদ্দীন আসামাত্র হযরত শাহজালাল (রহ.) তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। দুই ওলীর সে মহামিলনে ভক্ত-অনুরক্তদের হৃদয়-মন আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে গেল। তারা দাঁড়িয়ে আল্লাহর উভয় ওলীকে স্বশ্রদ্ধ সম্মান প্রদর্শন করলো। মিলন শেষে নিজাম উদ্দীন (রহ.) হযরত শাহ জালাল (রহ.)-এর কাছে অন্যায় সন্দেহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। দুইজন পরস্পর প্রীতির বাঁধনে আবদ্ধ হয়ে একে অপরের জন্য কায়মনোবাক্যে দোয়া করলেন।[১০৬]

গুণী ছাড়া গুণের কদর কে বুঝতে পারে? হযরত শাহজালাল (রহ.) যেমন গুণী ছিলেন তেমনি হযরত নিজাম উদ্দিন (রহ.)ও গুণী ছিলেন। তাঁরা একে অপরের সাথে মিলে যেন সোনায় সোহাগা হয়ে উঠলেন। তাঁরা উভয়েই ছিলেন একই পথের পথিক। উভয়েই ছিলেন আল্লাহ প্রেমের অথৈ সাগরের দক্ষ ডুবুরি। উভয়ের ভিতরেই জাজ্বল্যমান ছিল ঐশী প্রেমের আলোক রশ্মি।

হযরত নিযাম উদ্দীন (রহ.) হযরত শাহজালাল (রহ.)-কে নিজ আস্তানায় আমন্ত্রণ জানালেন। হযরত শাহজালাল (রহ.) আনন্দের সাথে তা কবুল করলেন। হযরতের সাথে তাঁর সাগরিদবৃন্দও আমন্ত্রিত হলেন। একদিন হযরত শাহজালাল (রহ.) সহ সকলেই হযরত নিজাম উদ্দীন আউলিয়ার আস্তানায় আগমন করলেন। নিযাম উদ্দীনের আস্তানাটি হযরত শাহজালাল (রহ)-এর পদভারে সজীব হয়ে উঠল। রাতদিন সবাই মিলে যিকির-আযকার, মোরাকাবা, মোশাহাদা ও কুরআন হাদীসের আলোচনায় মশগুল হয়ে সময় কাটাতে লাগলেন। হযরত শাহজালাল (রহ.) যে কয়দিন দিল্লী শহরে ছিলেন সে কয়দিন অপর কারো দাওয়াত তিনি গ্রহণ করেননি। হযরত নিযাম উদ্দীন (রহ.)-এর আস্তানায় থেকেই মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার সান্নিধ্য লাভে ব্যস্ত ছিলেন।[১০৭]

---

১০৬. ড. মোহাম্মদ মুমিনুল হক, *সিলেটের ইতিবৃত্ত* (ঢাকা : গতিধারা, ৪র্থ সংস্ক., ২০১০ খৃ.), পৃ. ৪২৮

১০৭. মাওলানা সৈয়দ মোঃ মিজানুর রহমান, *হযরত শাহজালাল ও শাহ পরান (রহ.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

Dhaka University Institutional Repository

কবুতর উপহার

হযরত শাহজালাল (রহ.) যখন দিল্লী হতে বিদায় নিতে গেলেন তখন হযরত নিযামউদ্দীন (রহ.) তাঁকে একজোড়া কবুতর উপহার দিলেন।[১০৮] যে কবুতরগুলোর গায়ের রং সুরমা। হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর নামানুসারে এ কবুতরগুলো জালালী কবুতর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এ কবুতরগুলো আজো হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর মাযারসহ বাংলাদেশের অধিকাংশ জায়গাজুড়ে দেখা যায়। সাধারণ মানুষের ধারণা উক্ত কবুতরগুলো মারলে অথবা শিকার করে ভক্ষণ করলে অমঙ্গল হয়। তাই কোন হিন্দু বা মুসলমান ঐ কবুতরগুলো শিকার করে না। সিলেটসহ বাংলাদেশের মানুষ আরো বিশ্বাস করে যে, যদি উক্ত কবুরতগুলোর মধ্য কোন কবুতর কারো বাড়িতে এসে আপনা হতেই বাসা বাঁধে তাহলে উক্ত ব্যক্তির সুদিন বা সম্ভাবনার দিন আগত প্রায়। অতি অল্প দিনের ব্যবধানে সে সুখ ও সমৃদ্ধির পথে অনেক দূরে এগিয়ে যাবে। প্রভূত কল্যাণ মঙ্গলের মালিক হবে। পক্ষান্তরে যদি কারো বাসা থেকে জালালী কবুতর বাসা ছেড়ে চলে যায় তাহলে বুঝতে হবে যে, উক্ত বাড়িতে দুর্দিন আগত প্রায়। বিপদ বালা-মুসিবত আঁকড়ে ধরতে পারে। হিন্দু-মুসলিম কমবেশি সকলেরই এমন ধারণা। এ ধারণা কতটুকু সত্য বা মিথ্যা তা নিয়ে আলোচনা সমালোচনা করা নিস্প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। আমরা শুধু এতটুকু বলতে চাই যে, যে মানুষকে কেন্দ্র করে এ পাখিগুলো এত মর্যাদা লাভ করেছে, তিনি নিজে কতবড় মর্যাদাবান আল্লাহ্ তা'য়ালাই ভাল জানেন। কবুতরগুলো সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা বা বিশ্বাস যদি অমূলকও হয় তবুও একথা অস্বীকার করার কোনই উপায় নেই যে, কোন সাধারণ লোকের পোষা পাখি সম্পর্কে শত শত বছর যাবৎ জনসাধারণের মধ্যে এমন বিশ্বাস অটল থাকতে পারে না। তা ছাড়া পাখির এমন কীইবা দাম! হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর মত মহান সাধক পুরুষের কবুতর বলেই তো তার দাম ও মর্যাদা! আর এতেই প্রতীয়মান হয় যে, হযরত শাহজালাল (রহ.) কামেল বা সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন।[১০৯]

জালালী কবুতর প্রসঙ্গে ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী বলেছেন–

"পূর্ববঙ্গের জনসাধারণের বিশ্বাস, যদি কাহারও বাড়িতে জালালী কবুতর আসিয়া বাসা বাঁধে তবে বুঝিতে হইবে তাহার সমৃদ্ধির দিন আসিতেছে। আর লক্ষ্মী ছাড়িয়া যাইবার উপক্রম করিলে কাহারও বাড়িতে জালালী কবুতরের বাসা থাকিলেও সহসা নাকি তাহারা বাসা ছাড়িয়া উড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যায়। এ বিশ্বাস হিন্দু, মুসলমান জনগণের মধ্যে অদ্যাপি সমান প্রবল। লেখক ব্যক্তিগত জীবনে বহুবার এ বিশ্বাসের সাক্ষাৎ পাইয়াছেন।"[১১০]

---

১০৮. ড. এম. এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাস* (ঢাকা : ১৯৮২ খৃ.), পৃ. ১১১

১০৯. আলহাজ হযরত মাওলানা সিরাজুল ইসলাম, *হযরত শাহজালাল (রহ.) ও শাহ পরান (রহ.)-এর জীবনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬

১১০. *ভারতবর্ষ*, পৌষ-১৩৪৮ বাংলা; উদ্ধৃত : সৈয়দ মুর্তজা আলী, *হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

Dhaka University Institutional Repository

কবুতর সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

কবুতরকে উপহার সামগ্রী হিসেবে গ্রহণ করার রহস্য কী হতে পারে? এ প্রসঙ্গে কিছুটা আলোকপাত করা প্রয়োজন।

হিজরত উপলক্ষে হযরত মুহাম্মদ (সা.) মদীনার পথে একটি গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)। দুশমনেরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে এদিকে আসছিল তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁদের নিরাপত্তার জন্য গুহার মুখে বাবলা গাছের শাখা-প্রশাখা প্রসারিত করে দিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে অন্তরার সৃষ্টি করে দেন। দুটি কবুতর এসে সেখানে বাসা বাঁধে। বর্তমানে হারাম শরীফের কবুতরগুলো এবং পবিত্র মদিনার জান্নাতুল বাকীর কবুতরগুলো ঐ কবুতরেই স্মারক মাত্র।[১১১] এসব বিভিন্ন কারণে সিলেটের হিন্দু মুসলমান জালালী কবুতর বধ করে না, কবুতরকে শান্তির কপোত বলে বিশ্বাস করে।

জনৈক দরবেশ রহস্যচ্ছলে বলেছেন, "হে পিপীলিকা! হাঁটিয়া হাঁটিয়া তুমি কা'বা প্রদক্ষিণ করতে পার? তবে হ্যাঁ, যদি তুমি কোন কবুতরের পায়ে কামড় দিয়ে আকড়ে ধরে থাকতে পার তবে আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় তোমার পক্ষে এ কবুতরের সঙ্গে আল্লাহর ঘরের দীদার নসীব হওয়া সম্ভবপর।"[১১২]

হিন্দু রাজা গৌড় গোবিন্দের সময় সিলেটের অবস্থা

দিল্লী হতে বিদায় নিয়ে হযরত শাহজালাল (রহ.) বিহার অভিমুখে যাত্রা করলেন। বিহার হতেও বেশ কয়েকজন হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাঁর সাথে যাত্রা করলেন। বিহার হতে হযরত শাহজালাল (রহ.) বাংলাদেশের সপ্তগ্রামে এসে পৌঁছলেন। সপ্তগ্রাম তখন মুসলমান সুলতানের অধীনে। ইতোপূর্বে ১২৯৮ খ্রিস্টাব্দে জাফর খান গাজীমান নৃপতিকে পরাজিত করে সপ্তগ্রামে মুসলমান আধিপত্য স্থাপন করেছেন। তিনি হযরত শাহজালাল (রহ.)-কে পেয়ে সাদরে বরণ করে নিলেন। তিনি হযরত শাহজালাল (রহ.)-কে সপ্তগ্রামে স্থায়ীভাবে থেকে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন, কিন্তু হযরত শাহজালাল (রহ.) তাতে রাজী হলেন না। কারণ তাঁর পীর ও মুরশিদ হযরত সাইয়েদ আহমদ কবীর (রহ.) প্রদত্ত মাটির অনুরূপ মাটি না পাওয়া পর্যন্ত তিনি কোথাও স্থায়ী আবাস প্রতিষ্ঠিত করতে সম্মত হলেন না। বর্তমান সিলেট জেলার তৎকালীন নাম ছিল শ্রীহট্ট। হযরত শাহজালাল (রহ.) সিলেটে আসার পূর্বে গৌড়ের রাজা ছিলেন গোবিন্দ। গৌড়ের রাজা বলে তাকে গৌড় গোবিন্দ বলা হতো। গোবিন্দের বংশ পরিচয় সম্বন্ধে তেমন কিছু জানা যায়নি। গৌড় গোবিন্দের সম্পর্কে একটি জনশ্রুতি আছে যে, সে দেবতার বংশজাত সন্তান।[১১৩]

---

১১১. সৈয়দ মুর্তজা আলী, *হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯-১০

১১২. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত, সিরাতুন্নাবী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৬

১১৩. আলহাজ হযরত মাওলানা সিরাজুল ইসলাম, *হযরত শাহজালাল (রহ.) ও শাহ পরান (রহ.)-এর জীবনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীনকালে ত্রিপুরা রাজ্যের শাসনকর্তা ছিলেন একজন হিন্দু রাজা। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিলাসি ও আরামপ্রিয় লোক। শত শত যুবতী মেয়ে রাজ মহিষী হয়ে রাজ বাড়ির শোভা বর্ধন করেছিল। তাদের একজন গোপনে গোপনে সমুদ নামক এক দেবতার সাথে প্রেমপ্রণয়ে আবদ্ধ ছিল। আজকাল দেবতা বলে যেমন কোন শরীর বিহীন শক্তিকে বোঝায়, সমুদ তা ছিল না। সে ছিল একজন মানুষ। মানবীয় যাবতীয় উপাদান তার মধ্যে বিদ্যমান ছিল। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য সবকিছু তার ভিতর বিদ্যমান ছিল। তবুও তাকে দেবতা বলা হতো কেন? সে প্রশ্নের জবাব হলো, হয়তো তার মাঝে এমন কোন বিশেষণ ছিল যার দরুন তখনকার সাধারণ মানুষ তাকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করতো। যাই হোক উক্ত রাজ মহিষী রাতের আধারে সমুদ দেবতার সাথে মিলিত হতো। বেশ কয়েক বছর যাবৎ এ প্রেম লীলা চলছিল। গোপন প্রেম অভিসার আর গোপন রইলো না। একদিন রাজার কানে সে গোপন প্রেম কাহিনী পৌঁছে গেল। তা শুনে রাজা হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে সে মুহূর্তেই রাণীকে পরিত্যাগ করে রাজমহল হতে বের করে দিলেন।

রাণী নির্বাসিত হলো ঠিকই; কিন্তু যে বীজ তার গর্ভে প্রবেশ করেছিল তা আর চাপা দেয়া গেল না। নির্ধারিত সময়েই তা আত্মপ্রকাশ করল। যুবতী তার নাম রাখল গোবিন্দ। এ গোবিন্দই গৌড়ের রাজা গৌড় গোবিন্দ নামে পরিচিত।[১১৪]

গোবিন্দের আকার-আকৃতি

গৌড় গোবিন্দ জন্মকাল হতেই ছিল কুৎসিত ও কদাকার প্রকৃতির। তার বীভৎস চেহারা একদিকে যেমন মানুষের মনে প্রচণ্ড ঘৃণার জন্ম দিত অপর দিকে লোকেরা তাকে ভয়ও করতো। সে যেমন সাহসী ছিল তেমনি শক্তিশালীও ছিল। সাহস, শক্তি ও উচ্চাকাঙ্ক্ষাই তাকে পরবর্তীকালে গৌড়ের রাজ সিংহাসন দখল করতে সাহায্য করেছিল।[১১৫]

ঐতিহাসিকদের মতে, একতো অবৈধ কলুষপূর্ণ রক্ত তার দেহের প্রতিটি শিরা উপশিরায় বিদ্যমান ছিল, রাজশক্তি কব্জায় আসার পর সে রক্ত আরো মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। সে যেমনি ছিল কদাকার তেমনি তার চরিত্রও ছিল খুবই জঘন্য। কত যে যুবতী মেয়ে তার সঙ্গীনী হয়ে তাদের সতীত্ব হারিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। অনাচার, অত্যাচার, ব্যভিচার ছিল তার নিত্য দিনের নেশা। রাজ্যের প্রজা সাধারণ তার অত্যাচারে জর্জরিত হওয়ার পরও তার নির্যাতনের ভয়ে কেউ মুখ খুলত না। কারণ, গৌড় গোবিন্দের শাসন ছিল খুব কঠিন। রোষদীপ্ত শাসনদণ্ড যার উপর পতিত হতো তাকে হয়তো পালিয়ে জীবন রক্ষা করতে হতো নতুবা দুনিয়ার মায়া পরিত্যাগ করে চিরদিনের মতো পরজগতের পথে যাত্রা করতে হতো। এমতাবস্থায় কার সাধ্য আছে যে, তার বিরোধিতা করে? কিন্তু মানুষের পক্ষে যা সাধ্যাতীত, মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ্ তা'য়ালার কাছে তা খুবই সহজ। আল্লাহ তা'য়ালা যা চান তাই করেন। গৌড়ের সিংহাসন হতে মারাত্মক প্রতাপশালী গোবিন্দের অপসারণ ও চিরবিদায়ের মধ্য দিয়ে

---

১১৪. দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, *হযরত শাহজালাল (র)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪

১১৫. মাওলানা সৈয়দ মোঃ মিজানুর রহমান, *হযরত শাহজালাল ও শাহ পরান (রহ.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩

Dhaka University Institutional Repository

চিরদিনের জন্য সেখানে হিন্দু রাজত্বের অবসানের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তা'য়ালা সে কথাই প্রমাণ করলেন।[১১৬]

বুরহান উদ্দীনের পরিচয়

তৎকালীন সিলেট শহরের টুলটিকর মহল্লায় থাকতেন শেখ বুরহান উদ্দীন নামক খুব ধর্মপরায়ণ একজন মুসলিম ব্যক্তি। সেকালে রাজা গোবিন্দের আমলে সিলেট তথা গৌড়ের কোথাও মুসলমানদের ব্যক্তি স্বাধীনতা বলতে কিছুই ছিল না। মুসলমানরা ছিল গোবিন্দের একান্ত ঘৃণার পাত্র। স্বাধীনভাবে ধর্মকর্ম পালন করা তো দূরের কথা তারা আপনাপন এলাকা ছাড়া কোন হিন্দু জনপদে যথাতথা ভ্রমণ করতে পর্যন্ত পারত না। মানুষ মানুষকে ঘৃণা করার যে শিক্ষা গৌড় গোবিন্দের আমলে প্রচলিত হয়েছিল তৎকালীন হিন্দু সমাজ তা ভালোভাবেই রপ্ত করতে পেরেছিল। এহেন হিন্দু রাজার একজন সামান্য প্রজা ছিলেন বুরহান উদ্দীন।

বুরহান উদ্দীন অতীব ধর্মপরায়ণ ছিলেন। অগাধ ধন-সম্পদের অধিকারী হওয়ার পরও তাঁর মনে কোন শান্তি ছিল না। কারণ, তাঁর কোন সন্তানাদি ছিল না। সন্তানের অভাব যে কত বেদনাদায়ক তা নিঃসন্তান পিতা-মাতা ব্যতীত অপর কেউই উপলব্ধি করতে পারে না। শেখ বুরহান উদ্দীন নিয়মিত ধর্ম-কর্ম পালন করতেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামায সঠিকভাবে আদায় করতেন। রমযান মাসের রোযা পালন করতেন। ঠিক মতো যাকাত আদায় করতেন, গরিব মিসকিনদের সাধ্যমত সাহায্য-সহযোগিতা করতেন। আর সব সময় বিশ্বপ্রতিপালক মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার শাহী দরবারে একটি পুত্র সন্তান দান করার জন্য বিনীতভাবে মুনাজাত করতেন।[১১৭]

শেখ বুরহান উদ্দীনের মানত

একদিন শেখ বুরহান উদ্দীন মানত করলেন যে, যদি বিশ্বপ্রতিপালক মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা তার প্রতি সদয় হয়ে তাকে একটি পুত্র সন্তান দান করেন তবে তিনি আল্লাহর রাহে একটি গরু আকীকা করবেন। ইসলাম ধর্মে নবজাত শিশুর আকীকা[১১৮] একটি ধর্মীয় দায়িত্ব। সরলমনা শেখ বুরহান উদ্দীন মানত করলেন বটে; কিন্তু একবারও তিনি এ কথা ভেবে দেখলেন না যে, তা কীভাবে সম্পাদন করবেন। রাজা গোবিন্দের রাজ্যে গরু কুরবানী দেয়া কোন সহজ কাজ নয়। তার সময়ে গরু কুরবানী দেয়ার শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। আগপিছ না ভেবেই তিনি মানত করে ফেললেন। কারণ, নিঃসন্তান পিতার মনোজ্বালার কাছে সবকিছুই হার মানলো। সন্তান লাভের আশায় তিনি এক কঠোর পরিণতির কথা বেমালুম ভুলে গেলেন। সন্তানের আকাঙ্ক্ষার কাছে সবকিছু হার মানল। তিনি সন্তানের চাঁদমুখ দর্শন করার জন্য বিভোর হয়ে রইলেন।

---

১১৬. ড. মোহাম্মদ মুমিনুল হক, *সিলেটের বিভাগের ইতিবৃত্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৭

১১৭. মাওলানা সৈয়দ মোঃ মিজানুর রহমান, *হযরত শাহজালাল ও শাহ পরান (রহ.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

১১৮. আকীকা : শিশুর জন্মের পর সপ্তম দিনে শিশুর নামকরণ ও কেশমুণ্ডন উপলক্ষে পশু কুরবানীর নাম। ইসলামী বিধান অনুযায়ী সেদিন নবজাতকের নাম রাখা, তার চুল কাটা ও কুরবানী দেয়া সুন্নাত। দ্র. সম্পাদনা পরিষদ, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ৫ম সংস্ক., ২০০৭ খৃ.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৮

Dhaka University Institutional Repository

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা রাহমানুর রাহীম। তাঁর দয়া ও করুণার শেষ নেই। বুরহান উদ্দীনের সকাতর বিনীত প্রার্থনা তাঁর দয়ার সাগরে ঢেউ তুলল। শেখ বুরহান উদ্দীনের প্রতি তিনি সদয় হলেন। আল্লাহর কুদরত বুঝা মুশকিল। বুরহান পত্নী বৃদ্ধা গর্ভবতী হলেন। তাদের খুশি আর বাধ মানে না। জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে বুরহান উদ্দীন এই প্রথম সন্তানের বাবা হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে যাচ্ছেন। তার আনন্দের কি আর সীমা-পরিসীমা আছে! তিনি তার আপন কৃত সংকল্পে অটল-অবিচল থেকে মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে রইলেন।

দিন যায়, তারপর সপ্তাহ, এমনি করে গত হয় মাস। সময় তো আর কারো জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকে না। নির্দিষ্ট সময়ে শেখ বুরহান উদ্দীনের সহধর্মী স্ত্রী একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিলেন। সুন্দর ফুটফুটে একটি শিশু যেন আকাশের চাঁদ তাদের ঘরে নেমে এলো। শেখ বুরহান উদ্দীন আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। তিনি সে মুহূর্তে ফকির, মিসকীনকে দাওয়াত দিয়ে আহার করালেন ও যথাসাধ্য দান খয়রাত করলেন। মহল্লার সবার গৃহে গৃহে মিষ্টি বিতরণ করে সবাইকে তার সাথে খুশিতে শরীক করলেন।

শেখ বুরহান উদ্দীনের স্বপ্ন সাধ পূর্ণ হলো। এবার তিনি তার কৃত মানত পূর্ণ করতে দৃঢ় সংকল্প হলেন এবং সে মোতাবেক কাজ শুরু করলেন। একদিন ভোর বেলায় হযরত শেখ বুরহান উদ্দীন তার গোয়ালের সবচাইতে মোটা তাজা গরুটি মহান আল্লাহর রাহে কুরবানী করে গরিব-দুঃখীদের মাঝে গোশত বণ্টন করে দিলেন। তার মহল্লার সকল মুসলমান পাড়া-প্রতিবেশি ও আত্মীয়-স্বজনকে দাওয়াত দিয়ে পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করালেন।[১১৯]

দয়াময় আল্লাহর রহমতে শেখ বুরহান উদ্দীনের মানত পূর্ণ হলো। তার কুরবানি শেষ হলো কিন্তু যে মহান কুরবানীকে উপলক্ষ্য করে আল্লাহ্ তা'য়ালা সিলেট তথা সমগ্র বাংলাদেশকে হিন্দু শাসনের নাগপাশ হতে মুক্তি দিবেন সে কুরবানী তখনও বাকি ছিল। এবার তাই ঘটতে চলল।

শেখ বুরহান উদ্দীনের উপর মসিবত

শেখ বুরহান উদ্দীন যখন কুরবানীর গোশত গরিব-দুঃখীদের মাঝে বণ্টন করতে ছিলেন সে সময় একটি কাক ছোঁ মেরে একখণ্ড গোশত নিয়ে উড়ে চলে গেল। উড়ে যাওয়ার সময় কাকটি তার ছোঁ মারা গোশতের টুকরোটি মুখে আটকে রাখতে পারেনি। গোশতের টুকরোটি কাকের মুখ থেকে পড়ে গেল। পড়বি তো পড়, তা একবারে মালির ঘাড়ে! ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! কাকের মুখ হতে গোশতের টুকরোটি গিয়ে পড়ল গৌড় গোবিন্দের রাজ মন্দিরের সদর দরজার সামনে,[১২০] মতান্তরে জনৈক ব্রহ্মণের বাড়িতে। পূজা দিয়ে বেরিয়ে আসার সময় গোশতের টুকরোটি রাজ পুরহিতের নযরে পড়ল। তিনি রাম রাম বলে একেবারে রাজার সামনে গিয়ে হাজির। বললেন, মহারাজ! রাজ্য গেল। রাজা বললেন, কী হয়েছে খুলে বল? পুরোহিত বললেন, মহারাজ সে কথা কি আর মুখে আনা যায়! গো

১১৯. দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, *হযরত শাহজালাল (র)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭

১২০. *আল-ইসলাহ*, শাহজালাল সংখ্যা, ১৩৬৪ বাংলা

Dhaka University Institutional Repository

মাংস! গর্জে উঠে রাজা বললেন, কোথায়? পুরোহিত বললেন, মহারাজ তা একেবারে রাজ মন্দিরের সদর দরজার সামনে। রাজা গোবিন্দ একতো মুসলিম বিরোধী অপরদিকে গরু হলো হিন্দুদের মাতা। রাজা গোবিন্দ হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। কার এতো বড় সাহস যে, তার রাজ্যে গো-হত্যা করল? সে যেই হোক, তবে সে যে মুসলমান তা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। রাজা নির্দেশ দিল, সে যেই হোক তাকে দরবারে ধরে নিয়ে আস। উপযুক্ত শাস্তি তাকে পেতে হবে। রাজার আদেশে রাজপুলিশ ছুটল অপরাধীকে ধরে আনার জন্য। বেশি খুঁজতে হলো না। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তারা শেখ বুরহান উদ্দীনকে গ্রেফতার করে রাজদরবারে হাজির করলো।[১২১]

শেখ বুরহান উদ্দীনের প্রতি অন্যায় আচরণ

মুসলিম বিদ্বেষী রাজা গোবিন্দ শেখ বুরহান উদ্দীনকে দেখামাত্রই ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। রোষদীপ্ত, অত্যন্ত কর্কষ ও কঠোর ভাষায় সে শেখ বুরহান উদ্দীনকে গো হত্যার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। ধর্মপরায়ণ, সরল প্রাণ শেখ বুরহান উদ্দীন কোন কথাই গোপন করলেন না। তিনি পুত্র সন্তান লাভ ও তার শোকরিয়া আদায় স্বরূপ মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার রাহে গরু কুরবানী করার কথা অকপটে স্বীকার করলেন। তা শ্রবণ করে রাজার ক্রোধ আরো বেড়ে গেল। সে তৎক্ষণাৎ আদেশ জারি করল, যে শিশুর জন্য এ গো হত্যা করা হয়েছে, গো হত্যার প্রতিবিধানে সে শিশুকেই দেবতার সামনে বলিদান করা হবে এবং যার হাত দ্বারা গরু জবাই করা হয়েছে তার হাতও কেটে ফেলা হবে এটাই রাজা গোবিন্দের সিদ্ধান্ত। এ সিদ্ধান্তের কোন প্রকার ব্যতিক্রম হবে না।

রাজ সিদ্ধান্ত শুনে শেখ বুরহান উদ্দীন হায় হায় করে উঠলেন। রাজার কাছে তিনি নিজ জীবনের বিনিময়ে পুত্রের জীবন ভিক্ষা চাইলেন। কিন্তু পাষাণের কাছে এ আবেদন অর্থহীন। রাজার আদেশ অনুযায়ী রাজ কর্মচারীরা সদ্যপ্রসূত শিশুটিকে তার মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে পিতার সামনে দেবতার উদ্দেশ্যে বলিদান করলো। তারপর শেখ বুরহান উদ্দীনের ডান হাতখানা কেটে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভরে তাকে রাজ দরবার হতে বের করে দিল।[১২২]

সমস্ত মুসলমান এলাকায় এ সংবাদ প্রচারিত হয়েছিল। ভিতরে ভিতরে তাদের যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়নি তা নয়; কিন্তু রাজার বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস কারোই ছিল না, তাই সকলকেই তা নীরবে সহ্য করতে হলো। আহত অবস্থায় পুত্র শোকে শোকাহত শেখ বুরহান উদ্দীন ঘরে ফিরে এলেন। গতকাল যে ঘরে আনন্দের মহা ধুম ধাম বয়ে যাচ্ছিল আজ সেখানে নির্মম কান্নার আওয়াজ। সে কান্নায় বুঝি বা আকাশের নূরের ফেরেশতারা দুনিয়াতে নেমে এসেছিলেন। আকাশ বাতাস স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, বনের পাখিরা আকুল হয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিল।

শেখ বুরহান উদ্দীনের পাড়া-প্রতিবেশীরা সমব্যথী হয়ে তাকে সমবেদনা জানাতে এসেছিল, কিন্তু ততে কি আসে যায়! পুত্রশোক কি কারো সমবেদনায় প্রশমিত হয়? তা হবার নয় কখনও। শেখ

---

১২১. মাওলানা সৈয়দ মোঃ মিজানুর রহমান, *হযরত শাহজালাল ও শাহ পরান (রহ.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

১২২. ড. মুহাম্মদ মুমিনুল হক, *সিলেটের ইতিবৃত্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৮

বুরহান উদ্দীন সবর করে রইলেন আল্লাহর সাহায্যের জন্য। তিনি তার মনের জ্বালা মনে চেপে রেখেই কাল যাপন করলেন, সে শুভক্ষণের অপেক্ষায় যেদিন ইসলামের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে সারা সিলেট এলাকা এবং মানুষ পাবে মানুষের অধিকার! অবসান হবে চিরদিনের জন্য অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ!

চরম নির্যাতনের শিকার বুরহানের মনে প্রতিশোধ স্পৃহা

সময় তার আপন প্রবাহে প্রবাহমান। তা কারো জন্য অপেক্ষা করে না। কাল প্রবাহে পুত্রপ্রাণ শেখ বুরহান উদ্দীনের পুত্রশোক কিছুটা প্রশমিত হলো এবং ক্ষতজ্বালাও তিনি অনেকটাই ভুলে গেলেন। কিন্তু ইসলাম ধর্ম ও মুসলমানের প্রতি গৌড় রাজার এ অপমানের জ্বালা তিনি কিছুতেই ভুলতে পারলেন না। প্রতিশোধের আগুন তার হৃদয় মনে দাউ দাউ করে জ্বলছিল। শেখ বুরহান উদ্দীন কারো সাথে তেমন কথাবার্তা বলেন না, আপন মনে চিন্তা করেন আর প্রতিশোধের উপায় খুঁজতে থাকেন।[১২৩]

তৎসময়ে বাংলাদেশের রাজধানী ছিল সোনারগাঁয়ে। সামছুদ্দিন আবুল মোজাফ্ফর খাজা ইলিয়াস শাহ ছিলেন তখন বাংলার শাসনকর্তা। ব্যক্তিত্ব, গুণ-গরীমা ও অশেষ শৌর্য বীর্যের অধিকারী ছিলেন তিনি। সামরিক দিক থেকে বলিয়ান ছিলেন বলে তিনি তার রাজ্যসীমা অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন। পশ্চিম প্রান্তে বারানসী এলাকাটিও তাঁর রাজ্যভুক্ত ছিল।

শেখ বুরহান উদ্দীন মনে মনে চিন্তা করলেন, গোবিন্দকে সমুচিত শিক্ষা দিতে হলে কোন মুসলমান বাদশাহর শরণাপন্ন হতে হবে। শক্তির দমন শক্তি দিয়েই করতে হবে। অস্ত্র ছাড়া বা ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে গোবিন্দকে কোনক্রমেই দমন করা যাবে না। রাজা গোবিন্দকে দমন করতে হলে তার চেয়ে অধিক শক্তিশালী কোন নৃপতির দরকার। তা না হলে গোবিন্দের খপ্পর থেকে সিলেটের মুসলমান জনসাধারণকে বাঁচানোর কোন উপায় নেই।[১২৪]

এক পর্যায়ে তিনি কোন এক গভীর রজনীতে সোনারগাঁয়ের দিকে যাত্রা করলেন। তিনি কি উদ্দেশে কোথায় যাচ্ছেন তা একমাত্র মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা ছাড়া আর কেউ জানে না। অপর কারো জানা তাঁর জন্য নিরাপদও ছিল না। কারণ, তখনকার জনসাধারণ রাজদণ্ডকে যেমন ভয় করত তেমনভাবে রাজানুগ্রহ লাভ করাকেও হাতছাড়া করতে চাইতো না। হিন্দু, মুসলমান সবার মাঝেই এ প্রবণতা বিদ্যমান ছিল। বর্তমান সময়ে এ প্রবণতা কিছুটা হ্রাস পেলেও এখনও কিছু কিছু লোক দেখা যায়, যারা রাজা-বাদশাহর ভক্তির চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে স্বার্থসিদ্ধির পথ প্রশস্ত করে নেয়। রাজভক্তি খারাপ একথা আমরা বলি না। কিন্তু যেখানে সরকার নিজ খেয়াল খুশি অনুযায়ী অন্যায় নীতির কৌশল গ্রহণ করে, সেখানে জি হুযূর বলে তার গুণগান করতে হবে এমন কোন অবস্থাতেই মেনে নেয়া যায় না।

শেখ বুরহান উদ্দীন ছিন্ন হস্ত নিয়ে শামছুদ্দীনের দরবারে গেলেন ও গোবিন্দের রাজ্যে মুসলমানদের দুর্দশা ও ধর্মীয় স্বাধীনতার চরম অবমাননাকর অবস্থা ব্যক্ত করে তার সব ঘটনা

---

১২৩. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *সিলেটে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

১২৪. আলহাজ হযরত মাওলানা সিরাজুল ইসলাম, *হযরত শাহজালাল (রহ.) ও শাহ পরান (রহ.)-এর জীবনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করলেন। এ সমস্ত ঘটনা শুনে শামছুদ্দিনের ক্রোধের সীমা রইলো না। তিনি পাঠান মুসলমান। পাঠানের রক্তধারা তার শরীরে পুরো মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। তিনি সে মুহূর্তে আপন পুত্র সিকান্দার শাহকে গৌবিন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করলেন।[১২৫]

যুদ্ধের আদেশে পাঠান বীরের সমগ্র হৃদয় মন উদ্বেলিত হয়ে উঠল। তিনি তৈরি হতে বেশি সময় নিলেন না। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি তিনি সকল আয়োজন সমাপ্ত করে এক বিশাল সেনাদল নিয়ে সিলেট অভিমুখে যাত্রা করলেন। সিকান্দার শাহ সেনাদলসহ সোনারগাঁয়ে গেলেন। অতঃপর সেখান থেকে পাহাড়ী পথে সিলেটের পথে অগ্রসর হতে লাগলেন। এদিকে সুচতুর রাজা গোবিন্দের এ অভিযানের কথা জানতে বাকি রইলো না। গুপ্তচর মারফত সে মুসলিম সেনাদলের অভিযানের বার্তা পূর্বে অবগত হতে পেরেছিলেন। কাজেই সে অনুযায়ী সে প্রতিরোধের ব্যবস্থা করেছেন। ধূর্ত রাজা বুঝতে পেরেছিল যে, তার সৈন্যবল যতই থাকুক না কেন মুসলিম সেনাদলের সাথে তিনি কোনভাবেই পেরে উঠবেন না। আর সেজন্য তিনি তার ফৌজদিগকে গেরিলা যুদ্ধের নির্দেশ দিলেন।[১২৬]

মুসলিম সেনাদল অগ্রসর হচ্ছিল। নীরবে নিভৃতে তারা পথ চলতে ছিলেন। অকস্মাৎ তারা রাজা গোবিন্দের গেরিলা বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হলেন। বনের ভিতর হতে তাদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে আগুনের গোলা বর্ষিত হতে লাগল। সিকান্দার শাহ কোন কিছুই ঠিক করতে পারলেন না। শুধু এতটুকু বুঝলেন যে, তারা শত্রু সেনা কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছেন। কিন্তু কোথায় তাদের অবস্থান এবং কীভাবেই বা তারা যুদ্ধ চালাচ্ছে তা জানার অবকাশ তার মিলল না। আকস্মিক আক্রমণে মুসলিম সেনাদল কোন কিছু বুঝতে না পেরে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় যে যে দিকে পারে পলায়ন করতে লাগল। সেনাপতি সিকান্দার শাহ সেনাদলকে আর সংঘবদ্ধ করতে পারলেন না। ফলে বাধ্য হয়ে অবশিষ্ট সেনা সদস্যসহ তিনি রাজধানীতে ফিরে এলেন।

সন্ধির প্রতীক্ষায় গোবিন্দ

ধূর্ত যালিম রাজা গোবিন্দ চিন্তা করে দেখল যে, পাঠান মুসলিম সেনাদলের সাথে যুদ্ধ করে কোন প্রকার সফলতা আসবে না। সে জানে যে, মুসলমানরা মৃত্যুকে ভয় করে না, বরং তারা মৃত্যুকে সাদরে আলিঙ্গন করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। যুদ্ধের ময়দানে মুসলিম সৈন্যরা এ মনোভাব পোষণ করে মরলে শহীদ, বাঁচলে গাযী। মুসলমানরা হাসতে হাসতে জীবন দিতে পারার এক অসম সাহসী জাতি। অযথা সময় নষ্ট হবে। এক সময় ঠিকই পরাজিত হতে হবে। তা ছাড়া মুসলমানের দৃষ্টি একবার যখন রাজ্যের উপর পড়েছে তখন এতো সহজে যে তাদের দৃষ্টি তার দিক হতে অন্যত্র সরে যাবে তা ভাবার কোনই কারণ নেই। হয়তো বা নতুন সৈন্য সংগ্রহ করে তারা আবার তার রাজ্যে আক্রমণ করার সংকল্প করছে। কাজেই সময় থাকতেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা একান্ত দরকার। কিন্তু কী ব্যবস্থাই বা তিনি গ্রহণ করবেন? এ তো জয় পরাজয়ের খেলা। হারজিত তো এ খেলায় থাকবেই। সর্বোপরি মুসলিম

---

১২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

১২৬. সৈয়দ মুর্তজা আলী, *হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

Dhaka University Institutional Repository

সেনাদলের সাথে এ খেলায় টিকে থাকা দুরূহ ব্যাপার। তাই কৌশল অবলম্বন করা অতি প্রয়োজন। মুসলমানদের সাথে শান্তিতে বসবাস করতে হলে তার সামনে একটিমাত্র পথ খোলা আছে, আর তা হলো সন্ধি। সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হতে পারলেই মুসলমানদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যেতে পারে। রাজা গোবিন্দ সে সুযোগের অপেক্ষায় প্রহর গুণতে লাগলেন।[১২৭]

গোবিন্দের সাথে সিকান্দার শাহের সন্ধি

সুলতান সিকান্দার শাহ দেখলেন, দুইদিকে বিপদ। গোবিন্দকে শাস্তি দেওয়া, সে তো দিল্লী থেকে আগত মুসলমান শত্রুবাহিনীর হাতে যখন তখন হাত মেলাতে পারে। আক্রমণকারী মুসলিম সেনাপতিকে বুঝানো, তাও তো সম্ভব নয়। তারা এতে সুলতানের দুর্বলতাই ধরে নেবে। সাত-পাঁচ ভেবে সিকান্দার শাহ সিদ্ধান্ত নিলেন, হিন্দু হলেও আগে ঘরের শত্রুকে নিরস্ত্র করা প্রয়োজন। তাই সিকান্দার শাহ কালবিলম্ব না করে গৌড়ের রাজা গোবিন্দের কাছে সন্ধি করার জন্য দূত প্রেরণ করেন। গোবিন্দ এ সুবর্ণ সুযোগটির অপেক্ষা করছিল। যাই হোক, সিকান্দার শাহ ও গৌড়ের রাজা গোবিন্দ নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট স্থানে একত্রিত হয়ে সন্ধিপত্র রচনা করেন এবং ঐক্যমত হয়ে স্বাক্ষর করেন।

সন্ধির শর্তাবলী :

১. আগামীতে সুলতান সিকান্দার শাহ এবং রাজা গৌড় গোবিন্দের মধ্যে আর কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ অনুষ্ঠিত হবে না।

২. সুলতান ও রাজা নিজ নিজ দেশে শান্তিতে বাস করবে এবং প্রজা পালন করবে।

৩. আজ থেকে সকলেই স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজ নিজ প্রণীত বিধান অনুযায়ী রাজ্য শাসন করবে।

৪. কিন্তু রাজা গোবিন্দ তার সংখ্যালঘু মুসলিম প্রজাদের উপর তাদের ধর্মে যা কিছু সিদ্ধ আছে তা এমনকি রাজার আইনের চোখে বিপরীত হলেও তাতে বাধা দিতে পারবে না। মুসলিম প্রজারা তাদের নিজ নিজ ধর্ম নির্বিঘ্নে পালন করতে পারবে।

৫. এখন হতে মুসলমানদের প্রতি কোন প্রকার অন্যায় আচরণ করা চলবে না।

৬. কোন হিন্দু প্রজা একক কিংবা সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মুসলমানদের ক্ষতি করতে চাইলে রাজ্য বিধান তা প্রতিহত করবে এবং অন্যায়কারীদের উপযুক্ত শাস্তির বিধান করতে হবে।

৭. অধিকন্তু, রাজা গোবিন্দ নিজ খরচে মুসলমানদের ধর্মকর্ম পালনের জন্য শ্রীহট্টে একটি সুরম্য মসজিদ তৈরি করে দিবেন।[১২৮]

সুলতান সিকান্দার শাহ ও রাজা গৌড় গোবিন্দের মধ্যকার সম্পাদিত সন্ধিতে যে এককভাবে রাজারই সুযোগ হয়েছিল, এমনটি নয়। এতে মুসলমানদের ধর্ম-কর্ম পালনের প্রভূত সুবিধা হয়েছিল ও হিন্দু রাজদণ্ডের অত্যাচার হতে নিরাপদ হয়েছিল। কিন্তু রাজ্যের সংখ্যাগুরু হিন্দু প্রজাদের মুসলমানদের

---

১২৭. আলহাজ মাওলানা মোঃ শহীদুল ইসলাম, *হযরত শাহজালালা ও শাহ পরান (রহ.)*, পৃ. ১১৩

১২৮. মাওলানা সৈয়দ মোঃ মিজানুর রহমান, *হযরত শাহজালাল ও শাহ পরান (রহ.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

Dhaka University Institutional Repository

প্রতি বৈরীভাব এতে এতটুকুও কমলো না; বরং রাজার তরফ থেকে মুসলমানদের নিরাপত্তা লাভ হেতু হিন্দু প্রজাদের অন্তরে ধর্ম বৈরীভাব দাবাগ্নি প্রজ্বলিত হতে শুরু করল। তবু রাজকীয় আইনের কারণে প্রকাশ্যে তারা কিছু বলতে পারছিল না। কিন্তু প্রজাদের অসহিষ্ণুতা রাজা থামাবে কিসের বলে?[১২৯]

বুরহান উদ্দীনের মর্মবেদনা

উভয় রাজা এভাবে পারস্পরিক সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হলেন বটে; কিন্তু বুরহান উদ্দীন আশ্বস্ত হতে পারলেন না। না পারার কারণ, তাঁর প্রতি যে নির্মম অত্যাচার হয়েছিল, তার শিশু সন্তানকে হত্যা করল এবং তাঁর ডান হাতখানা কেটে ফেলল, এমন যুলুমের বিচার তো হলো না। তা ছাড়া এ চুক্তিতে মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতা স্বীকৃত হলেও মত ও আদর্শের দিক দিয়ে সেখানে মুসলমানদেরকে সংখ্যা গরিষ্ঠ হিন্দুদের কবল হতে নিষ্কৃতি দেয়ার সরকারী কোন ব্যবস্থার কথা সন্ধিপত্রে উল্লেখ ছিল না। দ্বিতীয়ত, মুসলিম অধ্যুষিত এলাকার বাইরে স্বাধীনভাবে ধর্মানুষ্ঠান পালন বা ধর্ম প্রচারের কোন কথাও তাতে উল্লেখ ছিল না। এতদ্ব্যতীত এ সন্ধিপত্রটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল উভয় রাজার রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য। রাজা গোবিন্দ সন্ধি করলেন মুসলমানের সাথে সংঘর্ষ এড়াবার নিমিত্ত আর বাদশাহ সিকান্দার শাহ সন্ধি করলেন হিন্দু শক্তিকে দিল্লীর শক্তি হতে বিচ্ছিন্ন রেখে নিজ সিংহাসন কণ্টকমুক্ত রাখার লক্ষে।[১৩০] সুতরাং এ সন্ধি মুসলমানদের কোন উপকারে আসবে না বলে বুরহান উদ্দীনের ধারণা হয়েছিল এবং এজন্যই তিনি এর প্রতি তেমন আস্থা স্থাপন করতে পারেন নি। এ সন্ধিপত্রের উপর বুরহান উদ্দীনের অনাস্থার আরো অন্যতম কারণ ছিল যে, এর ফলে তার নিজ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে চলছিল। তিনি চেয়েছিলেন, পাঠান শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ হতে অত্যাচারী হিন্দু রাজা গোবিন্দের শাসন অপসারণ করে সেখানে ভালো মানুষের শাসন কায়েম করতে। কিন্তু এ সন্ধি চুক্তি সে সম্ভাবনার দ্বার চিরতরে বন্ধ করে দিয়েছিল। আর সে জন্যই বুরহান উদ্দীন এর প্রতি মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারেনি।

সাইয়্যিদ নাসিরুদ্দীন ও হযরত শাহজালাল (রহ.)

অন্যায়, অত্যাচার ও যুলুমের বিচার পবেন এমন আশা নিয়ে বুরহান উদ্দীন বাদশাহ শামছুদ্দীনের দরবারে গিয়েছিলেন; কিন্তু দুই রাজার সন্ধির ফলে শেখ বুরহান উদ্দীন নিরুৎসাহিত হয়ে পড়লেন। তাঁর প্রচেষ্টা এভাবে বিনাশ হয়ে যাবে তা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি। প্রথমবারের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় এবার তিনি নতুন প্রচেষ্টায় মনোনিবেশ করলেন। তার একমাত্র দৃঢ়সংকল্প হলো যত কষ্টই হোক না কেন বাংলাদেশকে অত্যাচারী রাজার হাত থেকে মুক্ত করতে হবে।[১৩১]

তৎকালীন সময়ে দিল্লীর শাসনকর্তা ছিলেন ফিরোজ শাহ তুঘলক। তিনি অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ও প্রজাহিতৈষী সম্রাট ছিলেন। ধর্মীয় বিশ্বাসে তাঁর অবিচল আস্থা ছিল। রাজ্যের প্রজাসাধারণের কল্যাণার্থে

---

১২৯. আলহাজ হযরত মাওলানা সিরাজুল ইসলাম, *হযরত শাহজালাল (রহ.) ও শাহ পরান (রহ.)-এর জীবনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

১৩০. আলহাজ মাওলানা মোঃ শহীদুল ইসলাম, *হযরত শাহজালাল ও শাহ পরান (রহ.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০

১৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৯

Dhaka University Institutional Repository

তিনি রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ, সরাইখানা, স্কুল, কলেজ, মাদরাসা, হাসপাতাল, মসজিদ, মক্তব ইত্যাদি নির্মাণ করেছিলেন। তার শাসনামলে প্রজাসাধারণ অত্যন্ত সুখ ও শান্তিতে দিনাতিপাত করছিল। পাঠান নরপতিদের মাঝে তার ন্যায় উদার ও প্রজা হিতৈষী সম্রাটের সংখ্যা নিতান্তই অপ্রতুল।

বুরহান উদ্দীন চিন্তা করে দেখলেন, বাংলাদেশের দুরাবস্থার কথা জানিয়ে যদি ফিরোজ শাহ তুঘলকের কাছে সংবাদ পরিবেশন করা হয় তাহলে অবশ্যই উপকার পাওয়া যেতে পারে। কোনরূপ দ্বিধা সংকোচ না করে শেখ বুরহান উদ্দীন দিল্লীর পথে পা বাড়ালেন। যে চিন্তা সেই কাজ, বুরহান উদ্দীন দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে অনেক কষ্টের পর অনেক সময় ব্যয় করে দিল্লীতে পৌঁছে তিনি সম্রাট ফিরোজ শাহের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। বাদশাহ ফিরোজ শাহ শেখ বুরহান উদ্দীনের আগমনের কারণ জানতে চাইলে তিনি তার কাটা হাত দেখিয়ে খুবই হৃদয়বিদারক ভাষায় বাংলার মুসলমানদের দুর্দশার কথা সম্রাটকে অবহিত করলেন। ঘটনার বিবরণ শুনে ফিরোজ শাহ তুঘলক ভাবতে লাগলেন কীভাবে গৌড়ের হিন্দু অত্যাচারী রাজা গোবিন্দের কবল থেকে নিপীড়িত মুসলমানদেরকে বাঁচানো যায়। কীভাবে রাজা গোবিন্দকে সমুচিত শাস্তি দেয়া যায়।[১৩২]

ইতোমধ্যে ঠিক একই রকম আরেকটি অভিযোগ ফিরোজ শাহ তুঘলকের কাছে এসে পৌছল, তা ছিল–

রাজা আচক নারায়ণ ছিলেন তরফের শাসনকর্তা। আচক নারায়ণও গোবিন্দের মত রাজ্যের মুসলমানদেরকে কোনদিন সুনযরে দেখেনি। এহেন উপলক্ষে নুরুদ্দীন নামক একজন প্রজা গরু যবেহ করে আমন্ত্রিত মেহমানবৃন্দকে আপ্যায়ন করেছিলেন। রাজা আচক নারায়ণের কানে যখন এ সংবাদ এল তখন রাগে নুরুদ্দিনকে গ্রেফতার করে এনে বিনা বিচারে প্রাণদণ্ড দিলেন। নুরুদ্দিনের ভাই গোপনে তরফ হতে পালিয়ে এসে দিল্লীর বাদশাহর কাছে সবিস্তার বর্ণনা করলেন এবং এর প্রতিকার দাবী করলেন।

ধার্মিক সম্রাটের মুসলমানদের প্রতি এমন যুলুম ও অপমান সহ্য হল না। পর পর এ দু'টি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বুঝে নিয়েছিলেন যে, বাংলার মুসলমানরা সুখে নেই। তারা সেখানে খুব কষ্টে দিনাতিপাত করছে। এ অবস্থার অবসান ঘটানোর লক্ষে তিনি তাঁর আপন ভাগিনা সিকান্দার গাযীকে গৌড় অভিযানের প্রস্তুতি নিতে বললেন। নির্দেশ পেয়ে সিকান্দার গাযী অভিযানে যাত্রার আয়োজনে লেগে গেলেন। খুব বেশি দেরি হল না। মুসলমান সেনাদল অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে মহান আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রের দিকে যাত্রা করলেন। পথ প্রদর্শক হিসেবে ছিলেন বুরহান উদ্দীন।[১৩৩]

সিকান্দার গাযী যে সময়ে যুদ্ধাভিযান নিয়ে বের হলেন সে সময়টা ছিল বর্ষাকাল। যুদ্ধাভিযানের সৈন্যরা মরু প্রান্তরে সারা বছর ঘুরে ঘুরে কাটিয়েছে, তারা বাংলাদেশের বর্ষাকাল দেখে অবাক হবে তাতে সন্দেহ নেই। আমাদের দেশে গ্রীষ্ম আসে প্রচণ্ড গরম নিয়ে, বর্ষা আসে আগুন

১৩২. মাওলানা সৈয়দ মোঃ মিজানুর রহমান, *হযরত শাহজালাল ও শাহ পরান (রহ.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১
১৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাপক শীতল বারিধারা নিয়ে। শিশির ভেজা শরত আসে শেফালী ফুলের বাহার নিয়ে। হেমন্ত ঘোষণা করে শীতের আগমনী বার্তা। বসন্ত নিয়ে আসে কোকিলের সুমধুর তান। বাংলাদেশের এ বৈচিত্র্যময় চক্র বৎসরের সাথে যারা অপরিচিত তারা বাংলার সঠিক প্রকৃতি নির্ণয় করবে কীভাবে?

সম্রাট ফিরোজ শাহের যুদ্ধাভিযানের সৈন্যদল ছিল তুর্কি। এ দেশের আবহাওয়া ও জলবায়ুর সাথে তারা সম্পূর্ণ অপরিচিত। কাজেই অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সিকান্দার গাযী তার সেনাদল নিয়ে ভীষণ সমস্যায় পড়লেন। বর্ষার কারণে সেনাদের অনেকেরই সর্দি কাশি দেখা দিল। অনেকে আবার জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়ল। বিনা চিকিৎসায় অনেক সৈন্য মারা গেল। যারা রোগমুক্ত ছিল তারা শক্তিহীন অবস্থায় পতিত হওয়ায় যুদ্ধ উপযুক্ত ছিল না। ফলে সিকান্দার গাযী নদীর তীরে তার তাঁবু স্থাপন করে সম্রাটকে সকল অবস্থার বিবরণ জানালেন ও অনতিবিলম্বে নতুন সেনাদল পাঠানোর জন্য আবেদন করলেন।[১৩৪]

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ঐ সময়কার মুসলমানগণ অনেকটা কুসংস্কারাচ্ছান্ন ছিল। তারা জ্যোতিষ বিদ্যায় বিশ্বাসী ছিল। তারা কোথাও যাত্রা করতে হলে বা সেনাবাহিনী প্রেরণ করতে হলে পূর্বেই জ্যোতিষীদের মতামত গ্রহণ করতেন। সম্রাট ফিরোজ শাহ তুঘলকও এ কুসংস্কারে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি তা হতে মুক্ত ছিলেন না। সিকান্দার গাযীর পত্র পেয়ে তাই তিনি সভাপরিষদবৃন্দ ও জ্যোতিষীগণকে সিকান্দার গাযীর পত্রের মর্ম অবগত করিয়ে নতুন সৈন্য প্রেরণ করা সম্বন্ধে তাদের মতামত জানতে চাইলেন। সভাসদগণ সায় দিলেন কিন্তু জ্যোতিষীরা এতে দ্বিমত পোষণ করলেন। তারা বললেন, জাহাঁপনা! সিকান্দার গাযী একজন উপযুক্ত সেনাপতি, তাতে কোন সন্দেহ নেই। যুদ্ধ বিদ্যায় ও সমর কৌশলে তার সুনাম সর্বজনবিদিত। তবুও জ্যোতির্বিদ হিসেবে আমরা যা দেখতে পাচ্ছি তাতে মনে হয় না যে, এ যাত্রা সিকান্দার গাযীর পক্ষে অনুকূল। তার বদলে অন্য কোন লোককে সিপাহসালাহ করে প্রেরণ করুন। আমাদের যতদূর বিশ্বাস তিনি ঐ কাজে সফলতা লাভ করতে সক্ষম হবেন।[১৩৫]

জ্যোতিষীদের এ বাণী শ্রবণ করে সম্রাট ফিরোজ শাহ তুঘলক মহা সমস্যায় পড়েছিলেন। সেনা বিভাগে সিকান্দার গাযীর মতো এতো সমর কুশলি আর কে আছে? কাকে সেনাপতির দায়িত্ব অর্পণ করা যায়। জ্যোতির্বিদরা বললেন, জাহাঁপনা! চিন্তার কোন কারণ নেই। বিশ্বনিয়ন্তা যার হাতে আপনাকে জয়ের মালা পরিধান করাবেন তিনি আপনার সেনা বিভাগে কর্মরত আছে। সম্রাট বললেন, তিনি কে? জ্যোতির্বিদরা বললেন, আমরা তাঁর সঠিক চিহ্ন দিতে পারব না, তবে তার একটি বিশেষ চিহ্ন হলো, অতি প্রচণ্ড বায়ু চলার সময়ও তার ঘরের বাতি নিভে যায় না। খুব বেশি অপেক্ষা করতে হবে না। রাশিচক্র অনুযায়ী আগামীকাল প্রচণ্ড ঝড় হওয়ার কথা। আপনি সেনা বিভাগে আদেশ জারি করে দিন ঝড় প্রবাহের সময় সকলেই যেন আপনাপন ঘরের বাতি জ্বালিয়ে রাখে। ঝড়ের তাণ্ডবে প্রদীপ আপনা হতে যেন নিভিয়ে না ফেলে। সম্রাট খুশি হলেন। এত বড় সমস্যার সমাধান এতো সহজে হয়ে যাবে

---

১৩৪. *হযরত শাহজালাল (রহ.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২

১৩৫. মাওলানা সৈয়দ মোঃ মিজানুর রহমান, *হযরত শাহজালাল ও শাহ পরান (রহ.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

Dhaka University Institutional Repository

বলে তার আনন্দের সীমা রইল না। তিনি সে সময় সৈন্যদের মাঝে জ্যোতির্বিদদের বর্ণনা অনুযায়ী আদেশ জারি করে দিলেন।

আশ্চর্যজনকভাবে পরের দিন সত্যি সত্যিই প্রচণ্ড ঝড় দেখা দিল। ঝড়ের তাণ্ডব লিলায় সবকিছু উলট-পালট হয়ে গেল। সমগ্র দিল্লী শহর ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। কারো ঘরে বাতি নেই। রাস্তার গ্যাসের বাতিগুলো পর্যন্ত নিভে গেছে। এমতাবস্থায় দেখাা গেল একটি ঘরে বাতি নিভেনি। খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে, তিনি হলেন পরম ধার্মিক সৈনিক সাইয়্যিদ নাসিরুদ্দীন।[১৩৬]

সাইয়্যিদ নাসিরুদ্দিন ইরাকের বাগদাদের অধিবাসী ছিলেন। যে কোন কারণবশত তিনি বাগদাদ নগরী ছেড়ে ভারতবর্ষে আগমন করেছিলেন। জীবিকা নির্বাহের জন্য তিনি তার আপন পরিচয় গোপন করে দিল্লীর সম্রাটের সেনাবিভাগে সৈনিকের চাকরি গ্রহণ করেছিলেন।

সাইয়্যিদ নাসিরুদ্দিন খুব অমায়িক ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক ছিলেন। তাঁর সরল অথচ মধুর ব্যবহার সেনা বিভাগে তাঁর একটি বিশেষ মর্যাদার অধিকার প্রদান করেছিল। তিনি ছিলেন মিতভাষী। অযথা কথা বলা তিনি পছন্দ করতেন না। কথা খুব কম বলতেন, অথচ যা বলতেন তা খুবই তথ্যপূর্ণ হতো। তাঁর বাচনভঙ্গি হতে যেন মধু ঝরে পড়ত। সাইয়্যিদ নাসিরুদ্দিন নিয়মিত নামায আদায় করতেন, রমাযান মাসে রোযা পালন করতেন, প্রত্যহ ফজরের নামাযের পর পবিত্র কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন এবং যিকির-আযকারে নিমগ্ন থাকতেন। তিনি কখনও নামায কাযা করেন নি। এমন কি তুমুল জিহাদের ময়দানেও যখন সৈন্যরা জীবনমরণ সংগ্রামে লিপ্ত তখনও তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। তাঁর আদব কায়দা দেখলে মনে হতো যেন এমন নিরীহ মানুষ দুনিয়াতে আর একজনও নেই। কিন্তু কি আশ্চর্য! এ নিরীহ মানুষটি যখন যুদ্ধের ময়দানে যেতেন, তখন তার শৌর্য বীর্য ও অপূর্ব রণচাতুর্য এবং অবিচল সাহসিকতা দেখলে কে বলতে পারতো যে, এ সে কোমল প্রাণ নাসিরুদ্দীন। একদিকে তিনি ছিলেন ফুলের মতো কোমল। অপরদিকে তিনি ছিলেন বজ্রের মতো কঠোর। তাঁর শান্ত স্বভাব ও আদব কায়দা যেমন উদাহরণযোগ্য ছিল, সাহসিকতাও তেমন দৃষ্টান্ত স্বরূপ ছিল। বলা বাহুল্য, এ দুটি গুণই তিনি ওয়ারিশসূত্রে লাভ করেছিলেন। সাধনা জগতে তার মাকাম ছিল অতি উচ্চ। তিনি নীরব সাধনা করতেন; কিন্তু কেউই তা অবগত ছিল না। নীরব রজনীতে বহির্জগতের সকল কোলাহল যখন স্তিমিত হয়ে পড়ত তখন তিনি জাগ্রত হয়ে মহান প্রভুর প্রেম সাগরে নিমজ্জিত হতেন।[১৩৭]

নাসিরুদ্দিনকে সম্রাটের তলব

দিল্লীর সম্রাট ফিরোজ শাহ সাইয়্যিদ নাসিরুদ্দিনকে দরবারে ডেকে পাঠালেন। সম্রাট সাইয়্যিদ নাসিরুদ্দিনকে নিজের পাশে বসিয়ে বললেন, আপনার পরিচয় আমার অগোচরে ছিল এখন আর তা আমার জানার বাইরে নয়। বাংলাদেশের মুসলমানদের উপর নির্যাতন চলছে। তাদের প্রতি সেখানকার

---

১৩৬. আলহাজ হযরত মাওলানা সিরাজুল ইসলাম, *হযরত শাহজালাল (রহ.) ও শাহ পরান (রহ.)-এর জীবনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭

১৩৭. মাওলানা সৈয়দ মোঃ মিজানুর রহমান, *হযরত শাহজালাল ও শাহ পরান (রহ.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

Dhaka University Institutional Repository

রাজাদের অত্যাচারের কাহিনী শ্রবণ করতে করতে আমার কান, হৃদয়, মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। তাই সেখানের নিরীহ মুসলমানদেরকে অত্যাচারী রাজাদের অত্যাচার থেকে মুক্ত করার নিমিত্ত আমি বাংলাদেশ দখলের নির্দেশ দিয়ে সিকান্দার গাযীকে সেখানে প্রেরণ করেছি। তারা এখন বাংলাদেশের একটি নদীর তীরে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিনাতিপাত করছে। সিকান্দার গাযী রণনিপুণ তাতে সন্দেহের লেশমাত্র নেই। কিন্তু আমার মনে হয় এস্থলে তার রণ কৌশল কাজে আসবে না। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আপনাকে এ কাজের দায়িত্ব দিয়ে বাংলাদেশে প্রেরণ করব। আমাদের ঐকান্তিক বিশ্বাস, আপনিই এর উপযুক্ত লোক। আপনার হাত দ্বারাই মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বাংলাদেশের বিজয় দান করবেন এবং নির্যাতিত মুসলমানদের হেফাযত করবেন। এ আমার নির্দেশ নামা। যান আপনার অধিনায়কত্বে এখন যেসব সৈন্য রয়েছে তাদেরকে নিয়ে যাত্রা করুন এবং যথাস্থানে গিয়ে পূর্ণ বাহিনীর সেনাপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করুন।[১৩৮]

মহান কৌশলী আল্লাহ তা'য়ালার কুদরতের শেষ নেই। তিনি বাদশাহকে ফকীর আবার ফকীরকেও বাদশাহ করতে পারেন। গতকাল যে নাসিরুদ্দিন সামান্য একজন সৈনিক ছিলেন আজ তিনি পুরো বাহিনীর সেনাপতি। কৃতজ্ঞতাভারে সাইয়্যিদ নাসিরুদ্দিনের মাথা আপনা হতেই নত হয়ে এল। তিনি মহান আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করলেন। পদমর্যাদা কোন মর্যাদা নয়, এর কোন বাস্তব মূল্য নেই যদি তার সাথে আল্লাহর প্রেমের সংমিশ্রণ না থাকে। সাইয়্যিদ নাসিরুদ্দিন একে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার দান বলে গ্রহণ করলেন এবং আনন্দ চিত্তে তা গ্রহণ করে আল্লাহর দরবারে সেজদাবনত হলেন।

এদিকে দিল্লী হতে যাত্রা করে হযরত শাহজালাল (রহ.) এলাহাবাদ পৌঁছলেন। তাঁর সাথে তখন তিনশত এগারজন দরবেশ। ধর্ম প্রচার ও পথহারা মানুষদেরকে পথ দেখানো তাঁর মহান ব্রত। তাঁর আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ও বিভিন্ন অলৌকিক গুণের কথা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। ফুলের সুবাস যেমন আবৃত করা যায় না, তা নিজ হতেই সুঘ্রাণ সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়, হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর যশ ও সুনামও তেমনি সর্বত্র বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। যেই তাঁর নিকটে আসত সেই সদুপদেশ লাভ করে ফিরে যেত।

দিল্লীর বাদশাহ ফিরোজ শাহ তুঘলক কর্তৃক নিযুক্ত সেনাপতি হযরত সাইয়্যিদ নাসিরুদ্দিন (রহ.) হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন ও সকল ঘটনার আদ্যোপান্ত তাঁকে খুলে বললেন। সিপাহসালার কথা শ্রবণ করে হযরত শাহজালাল (রহ.) বললেন, ভয় নেই, বিশ্বনিয়ন্তা মহান আল্লাহ তা'য়ালাই সবকিছুর মালিক। যাকে ইচ্ছা তিনি গৌরব দেন আবার যাকে ইচ্ছা অপমান করেন। চলুন আমরাও আপনার সাথী হবো। সর্বময় ক্ষমতার একমাত্র মালিক মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা রাজি থাকলে কোন অপশক্তিই আমাদের ব্যর্থ করতে পারবে না।

১৩৮.প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২

Dhaka University Institutional Repository

যথাসময়ে সাইয়্যিদ নাসিরুদ্দিন তাঁর সেনাদলসহ সিকান্দার গাযীর সাথে মিলিত হলেন। তাঁর সাথে হযরত শাহজালাল (রহ.) সহ তিনশত এগারজন সহচর ছিলেন। শাহজালাল (রহ.)-এর ন্যায় মহান সাধক ও সাইয়্যিদ নাসিরুদ্দিনের ন্যায় ধার্মিক ব্যক্তিদ্বয়কে পেয়ে সিকান্দার গাযী এবার ভীষণ আনন্দিত হলেন। কেননা এতদিন শুধু সামরিক শক্তিই তাঁর সাথে ছিল এবার আধ্যাত্মিক শক্তিও যুক্ত হল। উভয় শক্তিতে শক্তিমান হয়ে মুসলিম বাহিনী হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর নেতৃত্বে এগিয়ে চলল সিলেটের দিকে।[১৩৯]

সিলেট অভিযানে হযরত শাহজালাল (রহ.) ও মুসলিম সেনাদল

ধূর্ত গৌড় গোবিন্দ গোয়েন্দাদের দেয়া তথ্য অনুসারে আগেই এ অভিযানের সংবাদ জানতে পেরেছিলেন। কিন্তু বাধা দেয়ার মতো শক্তি ও সাহস কোনটাই তার ছিল না। হযরত শাহজালাল (রহ.) ও তাঁর সহচরবৃন্দের আধ্যাত্মিক শক্তি বলে বলিয়ান এ বাহিনী বিনা বাধায় ভাগিরথী নদী পার হয়ে কুমিল্লায় আগমন করল। যদিও সেনাদলের প্রধান সেনাপতি ছিলেন সাইয়্যিদ নাসিরুদ্দিন (রহ.) এবং তাঁর নির্দেশেই সৈন্যদল পরিচালিত হতো, তথাপি হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর নির্দেশ ব্যতিরেকে কোন কাজই সম্পাদন হতো না। আধ্যাত্মিক সম্রাট হযরত শাহজালাল (রহ.) ছিলেন তাদের পথের দিশারী। কুমিল্লায় আসার পর হযরত শাহজালাল (রহ.) সৈন্যদের থেকে দূরে এক নিরিবিলি নির্জন জায়গায় আস্তানা স্থাপন করলেন। হযরত শাহজালাল (রহ.) বেশ কয়েকদিন সেখানে অবস্থান করেছিলেন। এখনও সেখানে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর দরগাহ নামে একটি দরগাহ রয়েছে।

কুমিল্লা হতে হযরত শাহজালাল (রহ.) ও মুসলিম বাহিনী গৌড় রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্তে নবীগঞ্জের কাছে চৌকি নামক স্থানে এসে উপস্থিতহ হলেন। রাজা গোবিন্দের সেনাবাহিনী আগের মতো মুসলিম বাহিনীকে গেরিলা কায়দায় আক্রমণ করল; কিন্তু কী আশ্চর্য! এবারের আক্রমণে একটি মুসলিম সেনাসদস্যও আহত কিংবা নিহত হলো না; বরং তাদের নিজেদের অগ্নিবানে নিজেরাই মরতে লাগল। তাদের নিক্ষিপ্ত অগ্নিবানে গোবিন্দের অনেক সৈন্য মারা পড়ল এবং অনেকে আহত হলো। বাকি যারা ছিল তারা রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়নকরত কোন রকমে আত্মরক্ষা করল। কী হতে কী হলো রাজা গোবিন্দ কিছুই বুঝতে পারল না। এমনকি মুসলিম সেনারাও তা বুঝতে পারলেন না। যিনি বুঝার তিনি সবই বুঝলেন; কিন্তু মুখে কিছুই বললেন না। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার অসাধ্য বলে কিছুই নেই। এ বিশ্বাস নিয়েই তারা সামনের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন।[১৪০]

লড়াইয়ে পরিশ্রান্ত মুসলিম বাহিনী ও সাথী দরবেশগণসহ হযরত শাহজালাল (রহ.) এবার সতরসতী পরগণার অন্তর্গত ফতেহপুর গ্রামে এসে পৌঁছলেন। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল। হযরত শাহজালাল (রহ.) সেনাবাহিনীকে সেখানে তাঁবু খাটানোর নির্দেশ প্রদান করলেন। রাত ভোর হলো। সকাল বেলা ফজরের নামায আদায় করে আবার তিনি সামনের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। অনেক

১৩৯. মাওলানা সৈয়দ মোঃ মিজানুর রহমান, *হযরত শাহজালাল ও শাহ পরান (রহ.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১
১৪০. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *সিলেটে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

Dhaka University Institutional Repository

রাস্তা পার হয়ে বাহাদুরপুরের কাছে বরাক নদীর তীরে হাজির হলেন। নদী পার হয়ে অপর পাড়ে যেতে হবে অথচ পারাপারের কোন ব্যবস্থা নেই। অনুসন্ধানের পর জানা গেল যে, মুসলিম বাহিনীর অগ্রযাত্রা রোধ করার জন্য গৌড় গোবিন্দ তার পরিকল্পনা অনুযায়ী পূর্ব হতে খেয়া পারাপার বন্ধ করে রেখেছিল। তা দেখে হযরত শাহজালাল (রহ.) হয়তোবা মুচকি হাসি দিলেন। ভাবলেন কি সাধ্য রাজা গোবিন্দের, যে মুসলিম বাহিনীর অগ্রযাত্রা প্রতিরোধ করে দেয়। হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর অবিচল আস্থা যিনি পাহাড়কে সাগরে পরিণত করেন, আবার সাগরকে পাহাড়ে পরিণত করে দেন সে মহান আল্লাহর উপর। তিনি কি এ সামান্য নদীটুকু অতিক্রম করে অপর পাড়ে যাওয়া সুযোগ দেবেন না![১৪১]

মুসলিম বাহিনী কোন দেশ জয় করার জন্য এতদূর পথ অতিক্রম করে এখানে আসেনি। তাদের আগমনের কারণ হলো নির্যাতিত, নিপীড়িত মুসলিম জাতিকে অত্যাচারী হিন্দু রাজার করালগ্রাস হতে মুক্ত করা। ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করে অত্র এলাকার অবহেলিত, শিরকে নিপতিত মানুষদেরকে মহান আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী করে গড়ে তোলার সুপথ প্রদান করা। সুতরাং মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা এ বাহিনীর উপর নির্দয় হবেন কেন?

হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর সাথে যারা সাধারণ সৈনিক ছিল তারা কি ভেবেছিল তা গায়েবের মালিক আল্লাই জানেন। তারা হয়তোবা ভেবেছিল যে, এ রাজ্য দখল করাও সম্ভব হবে না। কিন্তু তাদের সাথে যে মহান সাধক রয়েছেন, তাঁর অবিচল বিশ্বাসে সামন্যতম ব্যতিক্রমও দেখা যায়নি। তিনি আপন মনে তাঁর অভিষ্ট লক্ষে পৌঁছার জন্য চলেছেন তো চলছেনই। সুতরাং কার এমন সাধ্য আছে যে, তাঁর নির্দেশের অন্যথা করে?[১৪২]

জায়নামায বিছিয়ে নদী পার

প্রকৃত আল্লাহ প্রেমিকদের আল্লাহ্ তা'য়ালা এমন কিছু গুণ দান করে থাকেন যা আমাদের ন্যায় সাধারণ মানুষের জ্ঞানের আওতার বাহিরে। হযরত শাহজালাল (রহ.) যে জায়নামাযে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতেন, তা ছিল হরিণের চামড়া নির্মিত। তিনি তাঁর সে জায়নামাযখানি বরাক নদীর পানির উপর বিছিয়ে দিলেন। মহান আল্লাহ তা'য়ালার কি অপূর্ণ মহিমা! তিনি জায়নামাযটিকে অপরূপ জলযানে পরিণত করে দিলেন। যার মধ্যে আরোহণ করে সঙ্গি-সাথীসহ হযরত শাহজালাল (রহ.) বরাক নদী পার হয়ে অপর পাড়ে পৌঁছলেন।

ড. এম আব্দুল কাদের এবং জনাব এ. জেড. এম. শামসুল আলম নদী পারাপারে নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা দিয়েছেন–[১৪৩] তারা বলেন : বাংলাদেশে বাঁশ ও কলাগাছের দুর্ভিক্ষ কোন দিনই ছিল না। কাজেই নৌকা চলাচল বন্ধ করলেও পর্যাপ্তসংখ্যক বাঁশঝাড় কেটে 'ভেলা' বানিয়ে অভিযানকারীরা

১৪১. মাওলানা সৈয়দ মোঃ মিজানুর রহমান, *হযরত শাহজালাল ও শাহ পরান (রহ.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪

১৪২. আলহাজ মাওলানা মোঃ শহীদুল ইসলাম, *হযরত শাহজালাল ও শাহ পরান (রহ.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯

১৪৩. *আল-ইসলাহ*, চৈত্র ১৩৭৪ বাংলা, পৃ. ৩১২-১৫, প্রবন্ধ : এ. জেড. এম শামসুল আলম; *আল-ইসলাহ*, বৈশাখ–আশ্বিন ১৩৬৪ বাংলা, পৃ. ৯৭-৯৮, প্রবন্ধ : ড. এম আব্দুল কাদের।

Dhaka University Institutional Repository

বেলাতে করে নদী অতিক্রম করতে সক্ষম হন। আরামের জন্য ভেলার উপর হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর হারণচর্মের জায়নামায বিছিয়ে রেখেছিলেন বলে মনে হয়।

সাইয়্যিদ নাসিরুদ্দিন (রহ.) নামে মাত্র সেনাপতি, যা কিছু নির্দেশ তা হযরত শাহজালাল (রহ.) দিতেন। হযরতের মহাত্ম্যে সাইয়্যিদ নাসিরুদ্দিন (রহ.) নিজেও মুগ্ধ, তার সেনাদলও যারপর নাই আনন্দিত। কারো মাঝে বিদ্রোহী হওয়ার বা বিরুদ্ধাচারণের লেশমাত্র চিহ্ন নেই। সবাই হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত। তারপরও হযরত শাহজালাল (রহ.) সরকারি আদেশের ব্যতিক্রম করেন না। সকল কাজ তিনি পরামর্শ করেই করেন, আর যা নির্দেশ জারি করতে হয় তা সাইয়্যিদ নাসিরুদ্দিন (রহ.)-এর মাধ্যমে জারি করেন। বলা বাহুল্য, যিনি ঐশী প্রেমে মাতোয়ারা, পথহারা মানুষকে সুপথে ফিরিয়ে আনাই যার একমাত্র ব্রত, তিনি দুনিয়াবী সম্মান ও পদমর্যাদার মোহে আবদ্ধ হবেন কেন? তাঁর কাজ হিদায়াত করা, নির্যাতিত মানুষকে অত্যাচারী রাজার করাল গ্রাস হতে মুক্ত করে তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। তারা যাতে যমীনে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার নাম স্মরণ করতে পারে তাদের সে ব্যবস্থা করে দেয়াই তো তাঁর মিশন। এতটুকু হলেই তিনি খুশি। দুনিয়াবী ক্ষণস্থায়ী পদমর্যাদার কি প্রয়োজন তাঁর?

সুরমা নদীর তীরে

হযরত শাহজালাল (রহ.) মুসলিম সেনাবাহিনীকে অগ্রযাত্রার নির্দেশ প্রদান করলেন। হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর নির্দেশপ্রাপ্ত হয়ে এবার সেনাবাহিনী পূর্বদিকে যাত্রা করে শেখ ঘাটের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত বর্তমান রেল স্টেশনের অদূরে ঐতিহাসিক সুরমা নদীর তীরে এসে উপস্থিত হলেন। মুসলিম বাহিনী যাতে না আসতে পারে সেজন্য রাজা গোবিন্দ পরিকল্পনা মোতাবেক এখানেও সুরমা নদীর খেয়া পারাপার বন্ধ করে রেখেছিল। পাপিষ্ঠ রাজা মুসলিম বাহিনীর অগ্রযাত্রা রোধ করার জন্য সকল প্রকার ব্যবস্থাই গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তাতে কী আসে যায়? যিনি মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার প্রিয় মাহবুব, তাঁর কাছে এসব বাধা তেমন কিছু নয়। এসব তুচ্ছ ব্যাপারে মাথা ঘামানোর মতো সময় হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর হাতে নেই। এবারো তিনি পূর্বের মতো তাঁর হরিণের চামড়া নির্মিত জায়নামাযখানি পানিতে বিছিয়ে দিয়ে উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সুরমা নদী পার হলেন।[১৪৪]

নির্বোধ গোবিন্দের কূট কৌশল

মুসলিম বাহিনীর অগ্রযাত্রা রোধ করার জন্য গোবিন্দের সকল অপচেষ্টা বৃথা গেল। মুসলিম বাহিনীর এ অগ্রযাত্রা দেখে রাজা গোবিন্দ একেবারে হতাশ হয়ে পড়ল। তার মনোবল একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছে। দিল্লির সম্রাট ফিরোজ শাহ তুঘলক কর্তৃক প্রেরিত এক হাজার ঘোড়সওয়ার ও তিন হাজার পদাতিক বাহিনীর মোকাবিলা করার মত সাহস ও শক্তি কোনটাই তার ছিল না। সে মনে মনে ভেবেছিল যে, তবুও শেষ চেষ্টা করে দেখা যাক, কিন্তু এ কোন মহা মসীবত যে, খেয়াযান বিহীন উত্তাল

১৪৪. মাওলানা সৈয়দ মোঃ মিজানুর রহমান, *হযরত শাহজালাল ও শাহ পরান (রহ.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২

Dhaka University Institutional Repository

নদী তারা অতিক্রম করে অপর পাড়ে পৌঁছতে পারে অবলিলায়। সে ভাবতে লাগল, এরা কি মানুষ না অন্য কিছু? এদের সাথে কি যুদ্ধ করে পারা যায়? উপায়ন্তর না দেখে রাজা গোবিন্দ কূট কৌশলের আশ্রয় নিল।[১৪৫]

বর্তমানের আধুনিক যুগের মতো তখন অত্যাধুনিক অস্ত্র ছিল না। তখন তা আবিষ্কারও হয়নি। তখন যুদ্ধ হতো ঢাল, তলোয়ার ও তীর ধনুক দ্বারা। রাজা গোবিন্দের অস্ত্রাগারে একটি ধনুক ছিল। সে ধনুকটি ছিল লোহার দ্বারা নির্মিত। গোবিন্দের সময়কাল পর্যন্ত এ ধনুকে কেউ তীর সংযোজন করতে পারে নাই।

এ ধনুকে কেউ কখনও তীর সংযোজন করতে পারে তা ছিল তার কল্পনার বাইরে। গোবিন্দ সে ধনুকটি এ বলে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর কাছে প্রেরণ করল যে, মুসলিম বাহিনীর কেউ যদি এ ধনুকে তীর সংযোজন করতে পারে তা হলে সে বিনা প্রতিরোধে সিলেটের শাসনভার তার হাতে তুলে দিবে। সিংহাসনের দাবি সে কোন দিন করবে না। রাজ্য পরিত্যাগ করে সে যেদিকে মন চায় সেদিকে চলে যাবে। মূলত এটা ছিল রাজা গোবিন্দের একটি অপকৌশল মাত্র। সে ভেবেছিল যে, এভাবে হয়তো আত্মরক্ষা করা যেতে পারে। কারণ, মুসলিম বাহিনী যখন এ অসম্ভব ধনুকটি দেখবে এবং তাতে তীর সংযোজন করতে পারবে না তখন মনে করবে যে, রাজা গোবিন্দ অপরিসীম শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী।[১৪৬] সুতরাং তাকে পরাজিত করা মোটেই সম্ভবপর নয়। সে ভাবল যে, এভাবে যদি মুসলিম বাহিনীর মনে একবার ভীতির সঞ্চার করা যায় তা হলেই কেল্লা ফতে! আর যুদ্ধ করতে হবে না। মুসলিম বাহিনী হয় পলায়ন করবে নতুবা সন্ধি করতে বাধ্য হবে।

নির্বোধ রাজা গোবিন্দ মারাত্মক ভুল করেছিল। আল্লাহ প্রেমিকদের মনোবল কত ইস্পাত কঠিত দৃঢ়, তা গোবিন্দ জানত না। যারা শক্তির পূজারী, যারা শুধু বাহিরের শক্তিকেই বিশ্বাস করে তাদেরকে হয়তো এভাবে ভয় দেখানো যায়। কিন্তু যিনি দুনিয়ার কোন শক্তিকে ভয় করেন না, পরওয়া করেন না, যার সারাটি অন্তর জুড়ে রয়েছে মহান আল্লাহর প্রেমানল, তিনি এ সামান্য শক্তিকে ভয় করবেন কেন? তাঁর সমস্ত চেতনা জুড়ে একটি মাত্র নাম 'আল্লাহু কাদিরুন'– আল্লাহ তা'য়ালা সকল ক্ষমতার উৎস। তিনি সকল কিছুর উপর প্রভূত ক্ষমতাবান। তাঁর কি কোন দুশ্চিন্তা বা উৎকণ্ঠা থাকা শোভা পায়?

হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর ঘোষণা

হযরত শাহজালাল মুজাররদে ইয়ামনী (রহ.) সেনাবাহিনীর মাঝে ঘোষণা করে দিলেন যে, যে লোক তার সারা জীবনে কখনও আসরের নামায কাযা করেনি, সে যেন আমার কাছে আসে। কারণ আসরের নামায নিয়মিত আদায়কারীর পক্ষেই এ ধনুকে তীর সংযোজন করা সম্ভব। এছাড়া অন্য কেউ তা পারবে না। বলা বাহুল্য যে, হযরত শাহজালাল (রহ.) নিজেই এ কাজ করতে পারতেন; কিন্তু দু'টি কারণে তিনি তা করেননি।

---

১৪৫. আলহাজ হযরত মাওলানা সিরাজুল ইসলাম, *হযরত শাহজালাল (রহ.) ও শাহ পরান (রহ.)-এর জীবনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮

১৪৬. দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, *হযরত শাহজালাল (র)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১

প্রথম কারণ, তিনি এর মাধ্যমে সেনাবাহিনীর ভিতর থেকে সে খাঁটি ঈমানদার ব্যক্তিকে বাছাই করে নিতে চেয়েছিলেন এবং দেখতে চেয়েছেন কে তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

দ্বিতীয় কারণ, এভাবে কুসংস্কারাচ্ছন্ন অত্যাচারী রাজা গোবিন্দের ও তাঁর সেনাদের মনোভাব পরিবর্তন করাও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল।[১৪৭] কেননা রাজা গোবিন্দ জানত যে, একমাত্র কোন মহা পুরুষের আধ্যাত্মিক শক্তি বলে বলিয়ান হয়েই মুসলিম বাহিনী বহুদূর পথ অতিক্রম করে এ পর্যন্ত আগমন করেছে। তা না হলে এতো বাধা অতিক্রম করে এতো দূরে আসা কোন বাহিনীর পক্ষে কখনো সম্ভব হতো না। সুতরাং এমতাবস্থায় রাজা যখন দেখতে পাবে যে, হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর একজন সাধারণ মুরীদ যখন তা করতে সক্ষম তখন গোটা মুসলিম বাহিনী সম্পর্কে তার ধারণা কল্পনাতীতভাবে পরিবর্তন হয়ে যাবে এবং সে সাথে সে নিজেও প্রভাবিত হয়ে পড়বে। ফলে সেও ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যেতে পারে।

হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর নির্দেশে সমস্ত সৈন্যবিভাগ অনুসন্ধান করে একজন মাত্র লোক পাওয়া গেল যিনি তার সমগ্র জীবনেও আসরেরে নামায কাযা করেন নি। আর তিনি হলেন স্বয়ং প্রধান সেনাপতি সাইয়্যিদ নাসিরুদ্দীন (রহ.)।[১৪৮]

হযরত শাহজালাল (রহ.) হযরত সাইয়্যিদ নাসিরুদ্দীনের পরিচয় আগেই পেয়েছিলেন। এবার তাঁর প্রতি হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর মমত্ববোধ ও আন্তরিকতা আরো গভীরভাবে আকৃষ্ট হলো। আনন্দ চিত্তে হযরত শাহজালাল (রহ.) সাইয়্যিদ নাসিরুদ্দীন (রহ.)-এর হাতে ধনুক দিয়ে বললেন, যাও বৎস! সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্ তা'য়ালার নাম স্মরণ করে এতে তীর সংযোজন কর। কি আশ্চর্য! এ পর্যন্ত কোন মহা শক্তিধর বীরপুরুষ যে ধনুকে তীর সংযোজন করতে সাহসী হয়নি, যার সম্পর্কে গোবিন্দের বদ্ধমূল ধারণা যে, দুনিয়ার কারো পক্ষেই এ ধনুকে তীর সংযোজন করা অসম্ভব ব্যাপার, পীরের আদেশে তার সিপাহসালাহ সাইয়্যিদ নাসিরুদ্দীনের কাছে খুবই সহজ মনে হলো। তিনি বিসমিল্লাহ বলে ধনুকে চাপ দিলেন। চাপ দেওয়ার সাথে সাথে ধনুকের দু'প্রান্ত বেঁকে এলো এবং মধ্য বৃত্ত সম্প্রসারিত হলো। সিপাহসালাহ সাইয়্যিদ নাসিরুদ্দীন (রহ.) অতি সহজভাবেই তাতে তীর সংযোজন করে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর কাছে অর্পণ করলেন। হযরত শাহজালাল (রহ.) তখন সে তীর সংযোজিত ধনুক রাজা গোবিন্দের কাছে প্রেরণ করলেন। এমন অসম্ভব কাজ সহজেই সম্পাদন হওয়ায় গোবিন্দের অন্তরাত্মা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। প্রবল প্রতাপশালী রাজা গোবিন্দ তার শেষ আশাটুকুও হারিয়ে ফেললেন। গোবিন্দ অনুধাবন করতে পারল যে, এ মহা সাধকের সামনে কোন কিছুই টিকে থাকতে পারবে না। তাই আর যুদ্ধ করা তিনি সমীচীন মনে করলেন না। প্রাণভয়ে তিনি গড় দুয়ারে অবস্থিত নিজস্ব দুর্গে আশ্রয় নিলেন।[১৪৯]

---

১৪৭. মাওলানা সৈয়দ মোঃ মিজানুর রহমান, *হযরত শাহজালাল ও শাহ পরান (রহ.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭

১৪৮. আলহাজ হযরত মাওলানা সিরাজুল ইসলাম, *হযরত শাহজালাল (রহ.) ও শাহ পরান (রহ.)-এর জীবনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩

১৪৯. দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, *হযরত শাহজালাল (র)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯

মনা রায়ের দুর্গে আযান

হযরত শাহজালাল (রহ.) রাজা গোবিন্দের প্রধানমন্ত্রী মনা রায়ের টিলার উপর স্থাস্থিত দুর্গ প্রাসাদে গমন করে শাহচট নামক তাঁর এক শাগরিদকে আযান দিতে বললেন। দরবেশ শাহচট (রহ.) আযান দিতে আরম্ভ করলেন। সে আযান তো কতিপয় শব্দের সমষ্টি ছিল। কিন্তু তাতে এমন এক শক্তির প্রভাব বিদ্যমান ছিল যা সাধারণত আযান দেয়ার সময় বিদ্যমান থাকে না। তাতে ছিল হৃদয়ের গভীরতম কুঠুরী হতে উৎসারিত ও সুললিত মধুর কণ্ঠস্বর হতে নিঃসৃত মহান আল্লাহ তা'য়ালার বিজয় গানের প্রলয়ংকরী ধ্বনি। যে ধ্বনির তেজ প্রধানমন্ত্রী মনা রায়ের সাততলা দুর্গ সহ্য করতে পারল না। সে সময়ই তা ঠাস ঠাস করে মাটিতে ধ্বসে পড়ল। যা কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ার মানুষের জন্য হযরত শাহজালাল (রহ.) এর অলৌকিকত্বের এক অক্ষয় কীর্তি হয়ে রইল।[১৫০]

আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের সিলেটে প্রবেশ

মহান আল্লাহর কুদরতের শেষ নেই। যে প্রাসাদ স্বাভাবিক নিয়মে ভাঙ্গতে বহু লোকের প্রয়োজন হতো, অথচ সুমধুর আযানের শব্দে সে প্রাসাদটি সমান্যতম সময়ে ধ্বংস হলো। মনা রায়ের সাততলা দুর্গ প্রাসাদ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে পড়ার সাথে সাথে মুসলিম সেনাবাহিনী আল্লাহু আকবর ধ্বনি তুলে ঐতিহাসিক সিলেট শহরে প্রবেশ করল। কেউ কোনরূপ বাধা দানে সাহস হলো না। সামান্যতম রক্তক্ষয় পর্যন্ত হলো না। বিনা যুদ্ধে সিলেট মুসলমানদের অধিকারে এলো। মনা রায়ের দুর্গ প্রাসাদের টিলার উপর উড্ডীন হলো ইসলামের বিজয় পতাকা। সন্তান হারা ও নির্যাতিত হযরত বুরহান উদ্দিনের স্বপ্নসাধ পূর্ণ হলো, এতদিনে তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। সন্তান হারানোর মনোবেদনা কিছুটা লাঘব হলো। মুসলমানগণ স্বাধীনতা পেয়েছে, স্বাধীনভাবে আপন ধর্ম-কর্ম পালন করতে তাদের আর কোন বাধা নেই। কথায় কথায় নির্যাতন-নিপীড়নের ভয় নেই। এর চেয়ে বড় শান্তি আর কী আছে! বুরহান উদ্দিনসহ সিলেটের সমস্ত মুসলমানগণ সিজদাবনত হয়ে মহান আল্লাহর দরবারে শোকরিয়া আদায় করলেন।

গৌড় গোবিন্দের সাধ

সুমধুর কণ্ঠের আযানের সাথে সাথে মনা রায়ের দুর্গ ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেল। রাজা গৌড় গোবিন্দ এবং তার প্রধানমন্ত্রী তাদের আশ্রয়স্থল সুরক্ষিত দুর্গে বসে প্রত্যক্ষ করছে এবং ভাবছে এ কেমন ঘটনা! এরা কেমন শক্তিধর মানুষ! দৈহিক শক্তি ব্যতিরেকে মাত্র কয়েকটি শব্দের প্রভাবে প্রাসাদ ধ্বংস হয়ে গেল। বিনা রক্তপাতে শহর মুসলমানদের অধিকারে চলে গেল। এমনসব অত্যাশ্চর্য ঘটনা দেখে রাজা-মন্ত্রী সকলে থর থর করে কাঁপছে। তাদের অন্তরাত্মা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। এক আযানের শব্দেই এত বড় বড় কাণ্ড ঘটে গেল। মুসলমানদের সাথে পারা যাবে না।[১৫১]

যে মহান সাধকের আধ্যাত্মিক শক্তি বলে মুসলিম সেনাবাহিনী অলৌকিকভাবে দু'টি উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ নদী বরাক ও সুরমা পার হয়ে এলো, যার আদেশে তাঁরই একজন সাধারণ অনুচর লৌহ

---

১৫০. আলহাজ মাওলানা মোঃ শহীদুল ইসলাম, *হযরত শাহজালাল ও শাহ পরান (রহ.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫

১৫১. ড. মোহাম্মদ মুমিনুল হক, *সিলেট বিভাগের ইতিবৃত্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৭

ধনুতে তীর সংযোজন করে অসাধ্য সাধন করলো, যার শাগরিদের আযান ধ্বনিতে মনা রায়ের টিলাস্থিত লৌহকঠিন দুর্ভেদ্য দুর্গ প্রাসাদ ধ্বসে পড়ল– সে মহান ব্যক্তিত্বকে এক নজর দেখার সাধ কার না হয়! রাজা গোবিন্দেরও হযরত শাহজালাল (রহ.)-কে দেখার সাধ জাগল। যেভাবেই হোক এই মহান সাধু পুরুষকে এক নযর দেখতে হবে। কিন্তু তা কী করে সম্ভব! ধরা পড়লে জীবন বিপন্ন হওয়ার সম্ভবনা আছে। বিজয়ী মুসলিম বাহিনী তাকে গ্রেফতার করতে পারলে এক মুহূর্তের জন্যও তাকে দুনিয়ার আলো বাতাস গ্রহণ করতে দিবে না। কারণ, তার শাসনামলে মুসলমানরা ভয়াবহ কষ্ট ভোগ করেছে। রাজ্যের মুসলমানরা যেভাবে নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হয়েছে, যত কষ্ট তারা ভোগ করেছে অন্য কোন শাসকের আমলে তারা এতো কষ্ট ভোগ করেনি। সুতরাং বিজয়ী সাধু পুরুষ বিনা বিচারে তাকে ছেড়ে দিবেন সে আশা বাতুলতা ছাড়া আর কিছু নয়। রাজা গোবিন্দ মহা চিন্তায় পড়ে গেলেন। কিন্তু হযরত শাহজালাল (রহ.)-কে দেখার প্রবল আগ্রহকে সে প্রবোধ দিতে পারেনি। রাজা গোবিন্দ এক সাপুড়িয়ার সাথে পরামর্শ করে সাপের জুড়িতে বসে হযরত শাহজালাল (রহ.)-কে দেখতে যাওয়ার পরিকল্পনা করলেন।[১৫২]

সিদ্ধান্ত মোতাবেক সাপুড়িয়া তার সাপের ঝুড়ির ভিতরে রাজা গোবিন্দকে বসিয়ে তা বহন করে মুসলিম শিবিরের কাছে নিয়ে এলো। আধ্যাত্মিক জ্ঞান-সম্পন্ন হযরত শাহজালাল (রহ.) রাজা গোবিন্দের গোপন অভিসারের কথা অতি সহজেই অবগত হলেন। সাপের খেলা দেখা শাহজালাল (রহ.)-এর উদ্দেশ্য নয় এবং কোন সাধু পুরুষই তা পছন্দ করেন না বা করতে পারেন না। তথাপি হযরত শাহজালাল (রহ.) সাপের খেলা দেখতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সাপুড়িয়া তার ঝুড়িগুলো নামিয়ে রাখল ও নির্ধারিত ঝুড়িটি না খুলে অপরাপর ঝুড়ি হতে সাপ বের করে সাপের খেলা দেখাতে লাগল। হযরত শাহজালাল (রহ.) কোন ভূমিকা না রেখেই বললেন, গোবিন্দ! ভালো চাও তো ঝুড়ির ভিতর হতে বের হয়ে এসো। অনেক চালাকিই তুমি করেছ, কোন চালাকিই তোমার কাজে আসেনি। তোমার শেষ চালাকিতেও তুমি ধরা পড়ে গেছো। তাড়াতাড়ি বের হয়ে এসো নতুবা সারা জীবনের জন্য সাপ হয়ে যাবে।

হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর এহেন কথা শুনে পলাতক রাজা গোবিন্দের কলিজা শুকিয়ে গেল। তার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। এ সাধু পুরুষের নিকট যে কোন কিছুই গোপন থাকে না এ কথাটা কেন যে আগে বুঝলাম না। কী বোকামিই না আমি করেছি। এখন উপায়? কিন্তু তখন আর চিন্তা করার সুযোগ ছিল না। হযরত শাহজালাল (রহ.) বললেন, তোমার ভয় নেই, গোবিন্দ, তুমি বের হয়ে এসো, তুমি নিরাপদ।[১৫৩]

---

১৫২. মাওলানা সৈয়দ মোঃ মিজানুর রহমান, *হযরত শাহজালাল ও শাহ পরান (রহ.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫

১৫৩. দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, *হযরত শাহজালাল (র)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭

অসহায় রাজা গোবিন্দ

গোবিন্দের আর করার কিছু ছিল না। এখান থেকে পলায়ন করারও কোন পথ নেই, তাই নিরূপায় হয়ে রাজা গোবিন্দ ভয়ে ভয়ে সাপের ঝুড়ি হতে বের হয়ে এলো। উপস্থিত সবার দৃষ্টি তার দিকে নিবদ্ধ হলো। এ সেই রাজা গোবিন্দ! যার অত্যাচারে রাজ্যের প্রজারা সব সময় বীতশ্রদ্ধ ও শংকিত থাকত। মুসলমানরা ছিল তার দু'চক্ষের শূল। মুসলিমবিদ্বেষী মনোভাব তার ভিতর প্রবল আকারে ছিল। মুসলমানদের প্রতি তার শত্রুতার শেষ ছিল না। যার কূটনীতি ও সামরিক শক্তির কাছে প্রবল প্রতাপশালী রাজা মহারাজারাও নতি স্বীকার করত। আজ সে-ই কিনা একজন নিরস্ত্র সাধক পুরুষের কাছে গ্রেফতার।

হযরত শাহজালাল (রহ.) শান্ত অথচ গুরু গম্ভীর স্বরে বললেন, গোবিন্দ! তোমার অতীতের ইতিহাস খুঁজে দেখ, তা কলঙ্কের কালিমায় পরিপূর্ণ। তুমি ছিলে দেশের রাজা, সকল জনসাধারণের সর্বপ্রধান ব্যক্তিত্ব। তোমার উচিত ছিল মানুষের প্রতি ন্যায়-নীতি ও ইনসাফ করে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু সে পথ অবলম্বন না করে তুমি প্রজাপীড়ন নীতি গ্রহণ করেছিলে। তোমার অত্যাচার ও অনাচারে দেশবাসী তোমার উপর ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট। সর্বোপরি মুসলমানদের উপর তুমি যে নিষ্ঠুর আচরণ করেছ তার নযীর ইতিহাসের কোথাও পাওয়া যায় না। এর জন্য তোমার কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত।[১৫৪]

অসহায় রাজা গোবিন্দ কী আর বলবেন। হযরত শাহজালাল (রহ.) যে কথাগুলো বলছেন এর একটি কথাও তো অমূলক নয়। তাছাড়া এ সাধক পুরুষের কাছে মিথ্যা বলে বাঁচবার কোন উপায় নেই। নতুবা দুই চারটি মিথ্যা কথা বলে নিজের যৎসামান্য সাফাই গাওয়া তো চলতো। অসহায় রাজা গোবিন্দ নিজের সকল অপরাধের কথা স্বীকার করতে বাধ্য হলেন ও হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাইলেন।

হযরত শাহজালাল (রহ.) বললেন, ক্ষমা! হাঁ, তোমাকে ক্ষমাই করা হবে। কারণ, ক্ষমাকে আল্লাহ তা'য়ালা ভীষণ পছন্দ করেন। আর ক্ষমা করাই যে আল্লাহর ওলীদের ধর্ম! ক্ষমার মতো মহত্ত্ব আর কিছুই নেই। তবে তোমার যদি সুবুদ্ধি জেগেই থাকে এবং তার ফলশ্রুতিতে তোমার অতীত কার্যকলাপ লক্ষ্য করে থাক তবে এ অনুতাপ তোমাকে তিলে তিলে দগ্ধীভূত করবে। সে দহন জ্বালার হাত হতে কেউই তোমাকে নিষ্কৃতি দিতে পারবে না। যাও তুমি মুক্ত। তোমাকে কেউ কিছু বলবে না।

নিঃশর্তভাবে ক্ষমা ও মুক্তি পেয়েও রাজা গোবিন্দ নিজেকে নিরাপদ মনে করতে পারলেন না। বহুদিন যাবৎ তিনি যে অত্যাচার ও কুশাসন চালিয়েছিলেন প্রজাসাধারণের উপর, ফলে তার মনে যে দুর্বলতা জমা হয়েছিল তাই তাকে সংশয়াবিষ্ট করে রাখল। গোবিন্দ হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর অভয়বাণীতে আস্থা স্থাপন করতে পারলেন না। রাতের আধারে গোপনে পলায়ন করে তিনি সিলেট

১৫৪.প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭

Dhaka University Institutional Repository

শহর হতে সাত আট মাইল দূরে পেচাগড় নামক স্থানে একট দুর্গে আশ্রয় নিলেন। রাজা গোবিন্দের এই ইতিহাস ছাড়া আর কিছুই জানা যায় না। তবে সিংহাসন হারাবার পর রাজা গোবিন্দ খুবই কষ্টে দিনাতিপাত করেছিলেন। সিলেট বিজিত হবার পর রাজা গোবিন্দের বিশ্বস্ত অনুচর ঝাড়ুরাম গোবিন্দের মাতা ও স্ত্রীকে নিয়ে গড়গাড় পলায়ন করেছিল। অসহায় মাতা ও রাজ মহিষী সেখানে ঝাড়ুরামের তত্ত্বাবধানে দিনাতিপাত করতে থাকেন। কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস, একদিন ঝাড়ুরামও মুসলমানদের হাতে গ্রেপ্তার হয় এবং নিহত হয়। এর ফলে রাজার মাতা ও রাজ মহিষী সম্পূর্ণ আশ্রয়হীন হয়ে পড়েন। এদিকে রাজা গোবিন্দরও কোন খবর নেই। তিনি বেঁচে আছেন কি মরে গেছেন সে বিষয়েও তারা কিছুই জানতে পারেননি। রাজা গোবিন্দের সে একই অবস্থা। তিনিও মা ও স্ত্রী সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। এর ফলে তারা উভয়েই যে দারুণ মনোকষ্ট ভোগ করছিলেন, সম্ভবত তাই তাদের জীবনে এনে দিয়েছিল অমানিশার ঘোর অন্ধকার। আর সে ঘোর অন্ধকারই এক সময় তাদেরকে মৃত্যুর দুয়ারে নিয়ে যায়।[১৫৫]

গোবিন্দ প্রবল প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। তিনি দীর্ঘ চব্বিশ বৎসরকাল রাজত্ব করেছিলেন। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার সময় একবার তার পেটে ব্রণ হয়েছিল। অনেক চিকিৎসার পরও যখন তিনি সুস্থ হতে পারলেন না তখন তিনি সুবিখ্যাত কবিরাজ চক্রপানি দত্তের শরণাপন্ন হলেন। চক্রপানি দত্ত সিলেটে এলেন ও অনেক চেষ্টা তদবীরের পর তাকে সুস্থ করে তুললেন। চিকিৎসা শেষে চক্রপানি দত্ত নিজ দেশে চলে গেলেন, কিন্তু গোবিন্দ যেতে দিতে চাইলেন না। অবশেষে তার একান্ত অনুরোধে কবিরাজের দুই ছেলে মহীপতি ও মুকুন্দ সিলেট এসে বসবাস করতে লাগলেন। সাতগাঁও এ বর্তমানে যে দত্তবংশ আছে তারা উক্ত দুই ভাইয়েরই বংশধর।

হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর কর্মস্থল

শাসনক্ষমতা মুসলমানদের হাতে এলো, কিন্তু হযরত শাহজালাল (রহ.) চিন্তা মুক্ত হতে পারলেন না। কারণ তিনি তো দেশ জয় করার জন্য অথবা রাজা-বাদশা হবার জন্য আসেন নি। তিনি এসেছেন পথহারা মানুষকে পথের সন্ধান দিতে। মহান আল্লাহ তা'য়ালার সৃষ্ট মানুষ আল্লাহ তা'য়ালাকে ভুলে দুনিয়ার সুখ-সম্ভোগে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে। এদেরকে সঠিক পথে আনতে না পারলে তাদের দুর্দশার শেষ থাকবে না। হযরত শাহজালাল (রহ.) খুবই চিন্তাই পড়ে গেলেন। কোথায় তার কর্মশালা এবং কীভাবেই বা তিনি কাজ আরম্ভ করবেন। এসব কথা চিন্তা করতে করতে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর বেশ কয়েকদিন চলে গেল।

কয়েকদিন অতিবাহিত হবার পর হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর স্মরণ হলো যে, তাঁর পীর ও মুর্শিদ সাইয়্যেদ আহমদ কবীর (রহ.) তাঁকে এক টুকরো মাটি দিয়ে বলেছিলেন, "এই মাটির বর্ণ, গন্ধ

১৫৫. আলহাজ মাওলানা মো. শহীদুল ইসলাম, *হযরত শাহজালাল ও শাহ পরান (রহ.)*, প্রাগুক্ত, ১৪৩

Dhaka University Institutional Repository

ও স্বাদ যেখানে পাবে সেখানেই তুমি অবস্থান ঠিক করবে।"[১৫৬] সেখানেই তুমি তোমার কাজে লেগে যাবে। তিনি তার শিষ্য মৃত্তিকা বিজ্ঞানী হযরত চাশনী পীর (রহ.)-কে ডেকে বললেন, চাশনী তোমার কাছে গচ্ছিত মাটির টুকরোটি নিয়ে আস। হযরত চাশনী (রহ.) মাটির টুকরা নিয়ে এলে হযরত শাহজালাল (রহ.) তা সিলেটের মাটির সাথে মিলিয়ে দেখলেন। একি আশ্চার্য! সিলেটের মাটির সাথে তাঁর পীর প্রদত্ত মাটি একেবারেই মিলে গেল। তা দেখে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর বুক আনন্দে স্ফীত হয়ে উঠল। তিনি মহান আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করলেন। বুঝলেন তার পরম শ্রদ্ধেয় মুর্শিদ তাঁকে এ জায়গায়ই আস্তানা করে মানুষের মাঝে দাওয়াতের কাজ চালাবার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। এতদিনে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর সফর পিপাসা নিবারণ হলো। তিনি স্থায়ীভাবে সিলেটে বসবাস করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।[১৫৭] হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর আরো কিছু কাজ অবশিষ্ট ছিল। কারণ, সিলেট বিজয় করার পর হযরত শাহজালাল (রহ.) কাউকেও সিলেটের শাসনকর্তা হিসাবে নিয়োগ দেননি। এবার তিনি সেদিকে মনোনিবেশ করলেন।

সিলেটের শাসনকর্তা

হযরত শাহজালাল (রহ.) সিলেটে আসার সময় তাঁর সাথে যে সমস্ত দরবেশ আগমন করেছিলেন তাঁদের মাঝে নুরুল হুদা আবুল কারামত সাঈদী হোসাইনি নামক একজন দরবেশ ছিলেন। আধ্যাত্মিক সাধনায় তিনি খুবই উঁচু মার্গে পৌঁছে ছিলেন। তিনি যেমন ছিলেন বিচক্ষণ তেমনি ছিলেন খোদাভীরু। রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, দক্ষতা ও রাজকার্য পরিচালনায়ও তাঁর যথেষ্ট পারদর্শিতা ছিল। হযরত শাহজালাল (রহ.) তাঁর হাতেই বিজিত সিলেটভূমির শাসন ক্ষমতা অর্পণ করলেন। পরবর্তীকালে তিনিই হায়দার গাযী নামে সমধিক পরিচিত হয়েছিলেন।[১৫৮]

শাসনভার অর্পণ করার পর আধ্যাত্মিক জগতের সম্রাট হযরত শাহজালাল (রহ.) অনেকটা দায়িত্ব মুক্ত হলেন। তাঁর চিন্তা কিছুটা লাঘব হলো। অতঃপর তিনি আস্তানা স্থাপন করতে মনোনিবেশ করলেন। সিলেট শহরের একটি উঁচু টিলার উপর হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর আস্তানা নির্মিত হলো। যার নাম হলো আল্লাহর ওলীর হুজরা।

নির্জন, শান্ত ও নিরিবিলি পরিবেশ। আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য এ জায়গাটি খুবই উপযুক্ত। এখানেই তিনি তাঁর ভক্ত অনুরক্তদের সাথে সাক্ষাৎ দান করতেন। তাদেরকে যথোপযুক্ত নির্দেশাবলী প্রদান করতেন, তা'লীম-তরবিয়ত শিখাতেন। জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তিনি এ আস্তানাই অবস্থান করেছিলেন।

---

১৫৬. যে কোন বিজ্ঞানী এখনও এ দু'টি অঞ্চলের মাটি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। ফলাফল এরূপই হবে। সিলেটের সর্বত্র আরবের মতই খনিজ পদার্থ আছে। এই সূত্রে বিজ্ঞানীগণ নিশ্চয়ই উপকৃত হবেন। Occurrence of Natural Gas in Sylhet, the Citizen, Spl. 1963, Vol. 11, pp 77-79.

১৫৭. সৈয়দ মুর্তজা আলী, *হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

১৫৮. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর সাথে ইবনে বতুতার সাক্ষাৎ

ইবনে বতুতা পৃথিবীর বিখ্যাত পরিব্রাজক ছিলেন। পায়ে হেঁটে হেঁটে তিনি সারা দুনিয়া ভ্রমণ করেছিলেন। ইবনে বতুতা নিজেই বর্ণনা করেছেন যে, পবিত্র মক্কা শরীফ যিয়ারত করার সময় তাঁর দেশ ভ্রমণের সাধ জাগে। সাথে সাথে তিনি ধর্মীয় প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ভ্রমণ আরম্ভ করেন। সৌদি আরব, ইয়েমেন, মিসর, সিরিয়া, মরক্কো, লেবানন, তুরস্ক, জাভা, সুমাত্রা, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, পরিশেষে ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেন। তিনি যখন সফর আরম্ভ করেন তখন তিনি যুবক ছিলেন; কিন্তু তিনি যখন তার ভ্রমণ সমাপ্ত করে আপন দেশে গিয়ে পৌঁছান, তখন তার বয়স পৌঢ়ত্বের কোঠা প্রায় শেষ হবার পথে। তা হতেই উপলব্ধি করা যায় যে, দেশ ভ্রমণে তার অনুরাগ কতো গভীর ছিল।

মহান আল্লাহর অপার অনুগ্রহে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর মাধ্যমে শ্রীহট্ট তথা সিলেট মুসলমানদের অধীনে এলে হযরত শাহজালাল (রহ.) আধ্যাত্মিক সাধনা ও তাবলীগে দ্বীনের কাজে ভীষণভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এমনি এক সময়ে ইবনে বতুতা ভারত বর্ষে এসে পৌঁছান। আগেই বলা হয়েছে, তিনি ছিলেন পরিব্রাজক। যানবাহন বলতে ছিল তাঁর দু'খানা পা। পায়ে হেঁটে হেঁটেই তিনি ভারতবর্ষের অধিকাংশ জায়গা ভ্রমণ করেন। ভ্রমণের এক পর্যায়ে তিনি বাংলাদেশের সাতগাঁওয়ে এসে সেখানকার সর্বস্তরের লোকমুখে একটি নাম উচ্চারিত হতে শুনেছেন। আর এ নামটি আমজনতা অতীব সম্মানের সাথে নিচ্ছে। সকলেরই ধ্যানে জ্ঞানে ঐ নামটি এতো বেশি আলোচিত হচ্ছে যে, লোক পরম্পরায় এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় এমনিভাবে সমগ্র বাংলাদেশে এ নামটি ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের মাঝে হয়তো কৌতূহল জাগবে যে, কে এ লোক, এমন কি আছে এ লোকটির মধ্যে যা মানুষকে অতি সহজে আপন করে নিচ্ছে! হ্যাঁ, ইনি আর কেউ নন, ইনি সাধক সম্রাট হযরত শাহজালাল (রহ.)। অবনমিত আচরণ, অমায়িক ব্যবহার, সমধুর কণ্ঠ, ইবাদত-বন্দেগীতে সবসময় মশগুল থাকা মহান আল্লাহর খাস প্রেমিক, মহামানব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশিত পথ ও আদর্শের মূর্ত প্রতীক এবং একনিষ্ঠ ভক্ত ও অনুরক্ত, সর্বোপরি মানব সেবায় এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন হযরত শাহজালাল (রহ.)। শরীয়ত ও মারেফত এ দু'টো ক্ষেত্রেই ছিল তাঁর সমান বিচরণ, এমনি এক পুণ্য চরিত্রের অধিকারী ছিলেন হযরত শাহজালাল (রহ.)। এমনি খাঁটি আল্লাহ প্রেমিকের নাম তো মানুষ সর্বাবস্থায় স্মরণ করবে। আর এটাই তো স্বাভাবিক। ইবনে বতুতা লোক পরম্পরায় হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর মহাত্ম্য ও অপূর্ব আধ্যাত্মিক শক্তির কথা শুনে তাঁকে না দেখেও তিনি তাঁর একজন ভক্ত হয়ে যান। তাঁকে এক নজর দেখার জন্য, তাঁর পবিত্র জবানে কিছু অমীয় বাণী শোনার জন্য ইবনে বতুতা উদগ্রীব হয়ে পড়েন। প্রবল আগ্রহের কারণেই তিনি সুদীর্ঘ এক মাস পথ চলার পর কামরূপের পার্বত্য এলাকায় এসে পৌঁছেন।[১৫৯]

জগৎ স্রষ্টা মহান রাব্বুল আলামীনের প্রিয় বান্দা হযরত শাহজালাল (রহ.) ছিলেন দিব্যজ্ঞান সম্পন্ন মহান এক সাধক। তিনি তাঁর দিব্যজ্ঞান শক্তি বলে ইবনে বতুতার আগমনের সংবাদ জানতে পারেন। তাইতো তিনি তাঁর চারজন শাগরিদকে এ বলে পাঠালেন যে, আরবদেশের একজন পর্যটক

১৫৯. সৈয়দ মুর্তজা আলী, *হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

Dhaka University Institutional Repository

আমার সাথে দেখা করার জন্য আসছেন, তিনি অমুক জায়গায় আছেন, তোমরা তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে আমার কাছে নিয়ে আসো। গুরুর আদেশ পেয়ে শাগরিদবৃন্দ সাথে সাথে রওয়ানা করলেন এবং চারদিনের পথ অতিক্রম করে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর নির্দেশিত জায়গায় পৌঁছামাত্রই যথাস্থানে তার দেখা পেলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, হযরত শাহজালাল (রহ.) শাগরিদদের কাছে ইবনে বতুতার শারীরিক আকৃতি, গঠন ও স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে সমুদয় বিবরণ বলে দিয়েছিলেন।

শাগরিদগণ ইবনে বতুতার কাছে উপস্থিত হলে তিনি তাদের আগমনের কারণ এবং পরিচয় জানতে চাইলেন। তখন তারা বললেন, শ্রীহট্টে হযরত শাহজালাল (রহ.) নামক তাদের একজন পীর আছেন। তাঁর নির্দেশেই তারা ইবনে বতুতাকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছেন। আগন্তুকদের মুখে এ রকম কথা শ্রবণ করে ইবনে বতুতা যারপর নাই আশ্চর্যান্বিত হলেন। তিনি ভাবলেন, যার সাথে জীবনে কোনদিন তার দেখা হয়নি, যার আগমন সংবাদ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, তাকে সংবর্ধনা জানিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এভাবে লোক পাঠানো, ইত্যাদি বিষয় তার কাছে বিস্ময়কর বলে মনে হতে লাগলো। তিনি বুঝলেন, ইনি যেই হোন না কেন, তিনি যে একজন কামেল আধ্যাত্মিক সাধক তাতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই। নতুবা কীভাবে তিনি আমার আসার সংবাদ জানতে পারলেন।[১৬০] এ ঘটনার পর হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর সাক্ষাৎলাভ করার জন্য ইবনে বতুতার আগ্রহ আরো বেড়ে গেল।

পরিব্রাজক ইবনে বতুতা হযরত শাহজালাল (রহ.) প্রেরিত দরবেশগণের সাথে রওয়ানা হলেন। সুদীর্ঘ রাস্তা অতিক্রম করার পর তারা সিলেট পৌঁছলেন। হযরত শাহজালাল (রহ.) ইবনে বতুতাকে দেখে সহাস্য বদনে উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁর সাথে কোলাকোলি করলেন।

কুশল বিনিময়ের পর উভয়ের মধ্যে আলাপ-আলোচনা শুরু হল। হযরত শাহজালাল (রহ.) তার ভ্রমণ কাহিনী সম্বন্ধে অনেক কথাবার্তা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। ইবনে বতুতা বিস্তারিতভাবে তা বর্ণনা করে হযরত শাহজালাল (রহ.)-কে শুনালেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ইবনে বতুতা হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর সৌজন্যমূলক আচরণ ও আন্তরিকতায় এতই মুগ্ধ হলেন যে, দেশে যাওয়ার পর যখনই তার কোন বন্ধুর সাথে দেখা হতো তখন কথায় কথায় শাহজালাল (রহ.)-এর কথা বর্ণনা করতেন। ইবনে বতুতা তিনদিন হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর মেহমান ছিলেন।[১৬১] তিনদিন পর তিনি হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। ইবনে বতুতা যখন প্রথম দিন হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর সাথে দেখা করেছিলেন তখন তার গায়ে ছাগলের চামড়া নির্মিত একটি লম্বা জুব্বা দেখেছিলেন। বিদায় গ্রহণের আগের দিন তার মনে হল, যদি হযরত শাহজালাল (রহ.) জোব্বাটি তাকে দান করতেন তাহলে তিনি জোব্বাটি ভক্তি সহকারে গায়ে দিতেন। তবে সে কথা তিনি মুখ খুলে বলতে পারলেন না। তাঁর মনের কথা মনেই রইলো। যাওয়ার দিন পরিব্রাজক ইবনে বতুতা যখন হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাইরে এলেন, তখন হযরতের এক শাগরিদ

---

১৬০. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *সিলেটে ইসলাম* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তা.বি.), পৃ. ১৯০

১৬১. সাদেক শিবলী জামান, *বাংলাদেশের সূফী সাধক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪

জোব্বাটি ইবনে বতুতার হাতে দিয়ে বলল, শায়খ এ জোব্বাটি আপনাকে দিতে বলেছেন। ইতোপূর্বে তিনি এ জোব্বা আর কোনদিন পরিধান করেননি। আপনার এখানে আসার দিন শায়খ এ জোব্বাটি পরিধান করা শুরু করেন। এ জোব্বাটি যখন তৈরি হয় তখন তিনি বলেছিলেন, জোব্বাটি তাঁর বন্ধু বুরহান উদ্দীন সাগরজির জন্য বানানো হয়েছে। বুরহান উদ্দীন সাগরজি এখন চীন দেশে ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য নিয়োজিত রয়েছেন। হযরত শাহজালাল (রহ.) আরো বলেছিলেন যে, ইবনে বতুতা নামক পরিব্রাজক এখানে আসবেন। জোব্বাটি দেখে তিনি পছন্দ করবেন এবং তিনি মনে মনে তা পাবার আশা করবেন; কিন্তু মুখ খুলে কিছুই বলবেন না। আমি তাকে জোব্বাটি দান করবো। তারপর এক সময়ে এ জোব্বাটি আমার বন্ধুর হাতে পৌঁছবে।

হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর খাদেমের মুখে একথা শ্রবণ করে ইবনে বতুতা খুবই আশ্চর্যবোধ করলেন। বললেন, জোব্বাটি যখন আমাকেই দেয়া হয়েছে তখন আর আমি এ জোব্বাটি কাউকে দিব না। দেখি কিভাবে তা বুরহান উদ্দীন সাগরজীর হাতে পৌঁছে।[১৬২]

বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার ভ্রমণে বের হলেন। সুদীর্ঘকাল ভ্রমণ করার পর এক সময় তিনি চীন দেশে গিয়ে পৌঁছলেন। চীনের খানসা শহরের রাজা ছিলেন ভীষণ চালাক। জোব্বাটি দেখে রাজার খুব পছন্দ হলো। তিনি কৌশল অবলম্বন করে জোব্বাটি পরিব্রাজক ইবনে বতুতার নিকট থেকে ছিনিয়ে নিলেন। জোব্বাটি হাত ছাড়া হয়ে যাওয়ার কারণে ইবনে বতুতা ভীষণ দুঃখ পেলেন; কিন্তু বিদেশ বিভুঁইয়ে তিনি কিইবা করতে পারেন। কে তাকে সাহায্য করবে? অগত্যা নিরাশ হয়ে তিনি আপন কর্তব্য কর্মে আত্মনিয়োগ করলেন।

পরের বছর যখন পরিব্রাজক ইবনে বতুতা পুনরায় সফর আরম্ভ করলেন তখন আবার তিনি চীন দেশে এলেন। তাঁর ইচ্ছা হলো তিনি সাগরজীর সাথে দেখা করে দেখবেন যে, হযরত শাহজালাল (রহ.) প্রদত্ত জোব্বাটি তাঁর নিকট পৌঁছল কিনা। সিদ্ধান্ত মোতাবেক তিনি এক সময় বুরহান উদ্দীন সাগরজীর আস্তানায় উপস্থিত হলেন। দেখলেন, ছাগলের চামড়া নির্মিত একটি জোব্বা পরিধান করে হযরত সাগরজী পবিত্র কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করছেন। পরিব্রাজক ইবনে বতুতা তাঁর কাছে গেলেন এবং হাত দিয়ে বার বার জোব্বাটি পরীক্ষা করতে লাগলেন। হযরত সাগরজী জানতে চাইলেন, কি ব্যাপার? এ জোব্বাটির প্রতি আপনি এভাবে তাকাচ্ছেন কেন? জোব্বাটি আপনি চেনেন নাকি? জবাবে পরিব্রাজক ইবনে বতুতা বললেন, চিনি বৈকি! কিন্তু আমার বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, এ জোব্বাটি আপনার কাছে কীভাবে? সাগরজী তখন হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর একটি চিঠি ইবনে বতুতাকে দেখিয়ে বললেন, জোব্বাটি আমার বন্ধু হযরত শাহজালাল (রহ.) আমার জন্য তৈরি করেছিলেন; কিন্তু কর্মক্ষেত্র পরিত্যাগ করে আমাদের কারো অন্য কোথাও যাওয়ার নির্দেশ নেই বলে এতদিন তিনি আমাকে জোব্বাটি দিতে পারেন নি। তাই তা কীভাবে জোব্বাটি আমার কাছে পৌঁছবে তা সবিস্তারে লিখে তিনি আমাকে অবগত করেছেন। হযরত সাগরজীর মুখের কথা শ্রবণ করে পরিব্রাজক ইবনে

---

১৬২. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *সিলেটে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১

বতুতা চিঠিটি খুলে পড়তে শুরু করলেন। যতই তিনি চিঠিটি পড়েন ততই তার বিস্ময় উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে।[১৬৩]

কবে ইবনে বতুতা ভারতবর্ষ ভ্রমণ করবেন, কখন কীভাবে তিনি হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর সাথে দেখা করবেন, কীভাবে তিনি জোব্বাটি তাঁর কাছে চাইবেন, কেমন করে তা খানসার রাজা জোর করে তাঁর নিকট হতে ছিনিয়ে নিবে এবং শেষ পর্যন্ত কীভাবে জোব্বাটি হযরত সাগরজীর কাছে পৌঁছবে বিস্তারিতভাবে তা উক্ত চিঠিতে লিখিত আছে। চিঠিটি আদ্যোপান্ত পাঠ করার পর হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর দিব্যজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় পেয়ে তাঁর প্রতি পরিব্রাজক ইবনে বতুতার মস্তক আপনা হতেই অবনত হয়ে এল।[১৬৪]

---

১৬৩. দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, *হযরত শাহজালাল (রহ.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭-৬৮

১৬৪. সৈয়দ মুর্তাজা আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলার পরিচয় ও বাংলায় ইসলামের আগমন

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাংলার পরিচয়

বাংলায় ইসলামী সংস্কৃতির উন্নয়নে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর অবদান জানার জন্য বাংলার পরিচয় জানা প্রয়োজন। বাংলা বা বাঙ্গালা নামের উৎপত্তি বঙ্গ শব্দের সাথে 'আল' যুক্ত হয়ে বঙ্গাল বা বাঙ্গালা নামের উদ্ভব হয়েছে। বাংলা ভাষায় 'আল' অর্থ বাধ। নদী প্রধান বাংলার শস্যভূমিকে বন্যা, জোয়ার ও বৃষ্টির কবল থেকে রক্ষা করার জন্য বাধ দেওয়া অপরিহার্য ছিল। প্রাচীন লিপিতে এ ধরনের অসংখ্য বাধের কথা উল্লেখ রয়েছে।[১৬৫] বাধ বা আল এর সমধিক প্রচলন ছিল বলে এদেশের নাম বাঙ্গালা হয়েছে। আবার অতীতে বাংলার প্রধানগণ পাহাড়ের পাদদেশে নিম্নভূমিতে ১০ হাত ও ২০ হাত চওড়া স্তূপ নির্মাণ করে সেখানে গৃহনির্মাণ বা চাষাবাদ করতেন। এসব স্তূপকে বলা হত বাঙ্গলা।

ঐতিহাসিক নীহার রঞ্জন রায় আইন-ই আকবরী গ্রন্থের লেখক আবুল ফজলের (আল এবং পূর্ব বঙ্গীয় ভাষায় আইল) এবং আল গুলিই বাংলার বৈশিষ্ট্য। এ আল বা বাধ আবুল ফজলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সে জন্য বঙ্গ নামের সঙ্গে তিনি 'আল' প্রত্যয় যুক্ত করে দেশটির নতুন নামকরণ করেছেন বঙ্গাল বা বাঙ্গালা। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে বঙ্গ শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। বঙ্গের সাথে 'আল' প্রত্যয় যোগে (বঙ্গ+আল=বঙ্গাল>বাঙ্গাল হয়েছে।[১৬৬] বঙ্গ ও আল শব্দ দুটির সংমিশ্রণে বঙ্গাল নামের উৎপত্তিকে কোন কোন ঐতিহাসিক স্বীকার করেননি। তাদের মতে, প্রাচীনকালের অনেক শিলালিপিতে বঙ্গ ও বঙ্গাল নামে দুটি পৃথক দেশের উল্লেখ রয়েছে। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন, খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী এবং সম্ভবত আরও প্রাচীনকাল হতেই বঙ্গ ও বঙ্গাল দুটি পৃথক দেশ ছিল এবং অনেক প্রাচীন লিপি ও গ্রন্থে এ দুটি দেশের একত্র উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং বঙ্গ দেশের নাম হতে 'আল' যোগে অথবা অন্য কোন কারণে বঙ্গালা অথবা বাংলা নামের উৎপত্তি হয়েছে তা স্বীকার করা যায় না, বঙ্গাল দেশের নাম হতেই কালক্রমে সমগ্র দেশের বাংলা নামকরণ হয়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।[১৬৭]

তবে একথা সঠিক যে, মুসলিম আমলের আগে 'বঙ্গ' ও 'বঙ্গাল' আমাদের দেশের অংশ বিশেষেরই নাম ছিল। সুতরাং এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, বঙ্গ বা বাংলা নামের উৎপত্তি প্রসঙ্গে দুটি মতবাদ পাওয়া যায়।

---

১৬৫. *বিশ্বরূপ সেনের মদনপাড়া তাম্রশাসন*; *Incription of Bengal,* Vol. 11 (কলকাতা : বাউলমন, ১৯৯৬ খৃ.), পৃ. ১০২

১৬৬. দীনেষ চন্দ্র সেন, *বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাস*

১৬৭. ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (প্রাচীন যুগ); ১৯৮৭ খৃ., ২য় খণ্ড

একটি মতবাদের অনুসারীগণ মনে করেন 'বঙ্গ' নামের সাথে 'আল' যুক্ত হয়ে বাঙ্গাল বা বাংলা হয়েছে। আর একটি দলের মতে বঙ্গালাদেশের নাম থেকেই বাংলা নাম করা হয়েছে। দুটি মতের মধ্যে প্রথমোক্ত দলের অভিমত অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। কারণ এদেশের আল বা বাধের প্রয়োজন বেশি বলেই 'আল' যোগে দেশের নামকরণের যৌক্তিকতা অধিক। মুসলিম শাসক-পূর্ব যুগে বঙ্গের যেমন সুনির্দিষ্ট রাষ্ট্রীয় সীমারেখা গড়ে উঠেনি তেমনি একটি পরিপূর্ণ জাতি হিসেবেও বাঙালিদের আত্মপ্রকাশ ঘটেনি। হিন্দু যুগের শাসকবর্গ বাঙালি ছিলেন সত্য; কিন্তু তারা নিজেদের বাঙালি অপেক্ষা গৌড়ীয় কিংবা গৌড়েশ্বর হিসেবেই পরিচয় দিতে অধিকতর গর্ববোধ করতেন। ইলিয়াস শাহের শাসনামলের পূর্ব পর্যন্ত এ অবস্থাই বিদ্যমান ছিল। আবার তার আমলেই গঙ্গা ও বহ্মপুত্রের নিম্নস্থলের এক বিস্তীর্ণ ভূভাগ বাংলা নামে সমধিক পরিচিত হয়ে ওঠে। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত বাঙালি বলতে পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গকে বুঝাতো। ঐতিহাসিক মীনহাজের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, বঙ্গ বা বাঙ্গালা এবং লক্ষনৌতি (লক্ষনীতি বা গৌড়) নামে দুটি পৃথক দেশ ছিল।

চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি সময়েও বাঙ্গালা বলতে পূর্ব[১৬৮] ও দক্ষিণ বঙ্গের ভূখণ্ডকেই বুঝাতো। প্রখ্যাত ভূ-পর্যটক ইবনে বতুতা (১৩৪৫ খ্রিস্টাব্দ–১৩৪৬ খ্রিস্টাব্দ) এতদঞ্চলে আগমন করেন। তিনি পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গের সমন্বয়ে বাঙ্গালার কথা উল্লেখ করেছেন। তার মতে, বাঙ্গালার জনপথ তখন বাঙালি নামে পরিচিত ছিল। ইবনে বতুতার বর্ণনায় লক্ষ্য করা যায় যে, এতদিন সেসব বাঙালি নিজেদের গৌড়ীয় বলে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করতো মুসলিম শাসনামলে তারাই বাঙালি জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। বাঙালি জাতির আত্মপ্রকাশের এ সূচনালগ্নের প্রেক্ষাপটে ছিলেন ইলিয়াস শাহ। তার শাসনামল ছিল বঙ্গ বা বাঙালির ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। ইলিয়াস শাহ প্রথমে লক্ষনৌতি বা লক্ষণাবর্তীর শাসক হিসেবে অবির্ভূত হন। পরে তিনি লক্ষনৌতি এবং বাঙ্গালাকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে আনয়ন করেন। এ দু'টি দেশকে একত্রিত করে সমগ্র ভূখণ্ডকে বাঙ্গালা নামে অভিহিত করেন। এ সম্মিলিত ভূখণ্ডের জনগণ বাঙালি নামে পরিচিত হয়। ইলিয়াস শাহ নিজেকে বঙ্গের স্বাধীন ও সার্বভৌম সুলতান হিসেবে এবং বাঙালি জাতির শাসক হিসেবে ঘোষণা করেন।[১৬৯]

---

১৬৮. অধ্যাপক কে আলী, *মুসলীম বাংলার ইতিহাস* (ঢাকা : আলী পাবলিকেশন্স, ১৯৯০ খৃ.), পৃ. ৪

১৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলায় ইসলামের আগমন

বাংলায় ইসলামী সংস্কৃতির উন্নয়ন ধারা বাংলায় ইসলাম আগমন থেকেই শুরু হয়েছে। কেননা ইসলাম সূচনার পর থেকে যেখানেই ইসলাম প্রচার হয়েছে সেখানেই ইসলামী সংস্কৃতির উন্নয়নের ধারা প্রবাহিত হয়েছে। ইসলাম আল্লাহর নিকট একমাত্র জীবন ব্যবস্থা।[১৭০] স্থান-কাল নির্বিশেষে সমগ্র মানব জাতির জন্য আল্লাহ প্রদত্ত বিশ্বজনীন জীবনব্যবস্থা হলো ইসলাম। হযরত মুহাম্মদ (সা.) ইসলামের দাওয়াতকে নবুওয়্যাতের সূচনালগ্ন থেকে ক্রমান্বয়ে সারা বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে সচেষ্ট ছিলেন। সে দাওয়াত ছিল সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের দাওয়াত। যার লক্ষ্য ছিল জীবন, জগৎ ও সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস, কুসংস্কার ও অজ্ঞতা হতে মানব জাতিকে মুক্ত করে তাদেরকে সঠিক আকীদা-বিশ্বাস, জীবন চলার সহজ-সরল প্রশস্ত পথ ও পদ্ধতির দিকে হিদায়াত দান করা।[১৭১] ইসলাম প্রচারশীল ধর্ম। সুতরাং মিশনারী চেতনা এ অভ্যন্তরীণ কাঠামোর মধ্যেই বিদ্যমান। দীন ইসলামের অভ্যুদয়, উত্থান, বিকাশ, প্রচার এবং প্রতিষ্ঠা হিজরী প্রথম শতাব্দীতেই বিরাট সাফল্য লাভ করেছিল। মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় সমগ্র 'জাজিরাতুল আরব' জুড়ে ইসলাম ব্যাপ্তি লাভ করে এবং খুলাফায়ে রাশিদীন ও তৎপরবর্তী উমাইয়া বংশীয় খলীফা প্রথম ওয়ালীদের খিলাফতকালে ইসলামী রাষ্ট্র উত্তরে ইউরোপের ফ্রান্স, স্পেন সীমান্তের পিরোনীজ পর্বতমালা হতে দক্ষিণে সমগ্র উত্তর আফ্রিকা, সমগ্র দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া, মধ্য-এশিয়া এবং একই সময়ে ভারতের পশ্চিমাঞ্চল পর্যন্ত এক বিশাল ভূখণ্ড জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে।[১৭২]

তৎকালীন ভারত উপমহাদেশ বহিঃজগত থেকে যেসব মুসলমান আগমন করেছিলেন, তাদেরকে দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। এক শ্রেণির মুসলমান ব্যবসা-বাণিজ্য বেশে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আগমন করে ইসলামের সুমহান বাণী প্রচার করেন। কতিপয় অলী-দরবেশ ফকীর শধুমাত্র ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগের জন্যে আগমন করেন এবং এ মহান কাজে সারা জীবন অতিবাহিত করে, এখানেই দেহত্যাগ করেন।

আর এক শ্রেণির মুসলমান এসেছিলেন বিজয়ীর বেশে দেশজয়ের অভিযানে। তাদের বিজয়ের ফলে এ দেশের মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ হয়। বলা বাহুল্য, ৭১২ খ্রিস্টাব্দে ভারতের সিন্ধু প্রদেশে সর্বপ্রথম মুহাম্মদ বিন কাসিম আগমন করেন বিজয়ীর বেশে এবং এটা ছিল ইসলামের বিরাট রাজনৈতিক বিজয়। তাঁর বিজয় সিন্ধুপ্রদেশ পর্যন্ত সীমিত থাকেনি; বরং তা বিস্তার লাভ করে পাঞ্জাবের মুলতান পর্যন্ত।

---

১৭০. আল-কুরআন, ৩:১৯

১৭১. ইবন জারীর আত-তাবারী, *তরীখুর রাসূল ওয়াল মুলূক* (মিসর : দারুল মা'রিফ, ১৩৫৭ হি.), ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫২০

১৭২. সহিদুর রহমান, *অগ্রপথিক*, রংপুরে ইসলাম প্রচার (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল ১৯৯৭ খৃ.), পৃ. ৮২

অপরদিকে বাংলায় মুসলমানদের আগমন দূর অতীতের কোন এক শুভক্ষণে হয়ে থাকলেও তাদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ হয়েছিল[১৭৩] হিজরী ৬০০ সালে অর্থাৎ ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে।[১৭৪]

খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দী যে কোন দৃষ্টিকোণ থেকেই মানব ইতিহাসে এক মহাক্রান্তিকাল হিসেবে বিবেচ্য। মানব সভ্যতাসমূহের বিবর্তনের আলোকে অথবা নবুওয়্যাতের ইতিহাসের আলোকে যে কোন দৃষ্টিভঙ্গিতেই সেদিনের বিশ্ব পরিবেশ বা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হোক না কেন, মানব জাতির জন্য সেদিন নেমে এসেছিল এক ঘোর দুর্দিন। তাওহীদবাদের যে সুবিশাল আলোকচ্ছটা বিশ্বমানবকে যুগে যুগে দেশে শান্তির পথ দেখিয়েছিল, সেদিন সব আলো যেন নির্বাপিত হতে বসেছিল।[১৭৫] মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সমস্ত ধর্মগ্রন্থ ও সকল কিতাবকেই মানুষ সেদিন খেয়াল খুশিমতো বিকৃত ও পরিবর্তিত করে বসেছিল। এক স্রষ্টার বিশ্বাসের পরিবর্তে মানুষ নিজেদের খেয়াল খুশিমতো বানিয়ে নিয়েছিল অসংখ্য দেব-দেবী।[১৭৬] পৃথিবীর অতীত ইতিহাসে যে সব দেশ বা রাষ্ট্র বিভিন্ন ধর্ম অনুশীলন ও সভ্যতার গৌরবময় উত্তরাধিকার বহনের দাবিদার ছিল সে গ্রীস কিংবা রোম, সিরিয়া, পারস্য, মিসর কিংবা মেসোপটেমিয়া, চীন কিংবা ভারতবর্ষ হোক কোথাও এ করুণ চিত্রের ব্যতিক্রম ছিল না। প্রথম নবী হযরত আদম (আ.)-এর তাওহীদবাদের অনির্বাণ শিখাকে ভিত্তি করে যুগে যুগে যেসব প্রেরিত মহাপুরুষ এ ধরাধাম সভ্যতার আলোকবর্তিকা বহন করেছিলেন, সে হযরত নূহ (আ.), হযরত ইবরাহীম (আ.), হযরত মূসা (আ.), হযরত ঈসা (আ.) তাঁদের অনুসারীরা সবাই ভুলে বসেছিল এসব মহাপুরুষদের প্রচারিত আদর্শ।[১৭৭] শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আবির্ভাবের প্রাক্কালে সারা বিশ্বের এ সাধারণ অবস্থা তার ব্যতিক্রম ছিল না এমনকি দক্ষিণ এশীয় উপমহাদেশ তথা ভারতবর্ষও এ করুণ অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পায়নি।[১৭৮] এমনি এক প্রেক্ষাপটে আরবের বুকে জন্মগ্রহণ করেন বিশ্ব মানবতার মুক্তির শ্রেষ্ঠ নিশানবর্দার বিশ্বজগতের জন্য আল্লাহর শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সমসাময়িক কালে ভারতবর্ষের অবস্থা ছিল অতি মর্মান্তিক। হিন্দু পুনর্জাগরণবাদীদের আধুনিক শক্তির দাপটে জৈনধর্ম বিলুপ্ত প্রায়, বৌদ্ধ ধর্মের অবস্থাও প্রায় তথৈবচ।[১৭৯] হিন্দু পুনর্জাগরণের বিদ্বেষ ও বৌদ্ধ নিধন অভিযানে ফলে সমগ্র জনজীবনে নেমে এসেছিল চরম অভিশাপ। নিম্নবর্ণের (শুদ্র) হিন্দু ও বৌদ্ধদের উপর সংঘবদ্ধ ব্রাহ্মণ্যবাদীদের এ বর্বর নিপীড়নের

---

১৭৩. তৎকালীন ভারত সম্রাট কুতুবদ্দীন আইবেকের সময়ে মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী বলতে গেলে আলৌকিকভাবে বাংলায় তার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

১৭৪. আব্বাস আলী খান, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস* (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, জুন ২০০২ খৃ.), পৃ. ১৩

১৭৫. মোহাম্মদ আব্দুল গফুর, *অগ্রপথিক, সীরাত সংখ্যা*, মহানবী (সা.)-এর যুগে উপমহাদেশ (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, অক্টোবর, ১৯৮৮ খৃ.), পৃ. ৪৯

১৭৬. প্রাগুক্ত

১৭৭. প্রাগুক্ত

১৭৮. প্রাগুক্ত

১৭৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

পটভূমিতেই ভারতবর্ষের সাথে পরিচয় শুরু হয় সাম্য-ভ্রাতৃত্ব ইনসাফের মহান আদর্শ ইসলামের। উল্লেখ্য যে, প্রাক ইসলামী যুগ থেকেই আরব বণিকগণ বাণিজ্যের জন্য লোহিত সাগর, আরব সাগর এবং ভারত মহাসাগরের তীরবর্তী বন্দরগুলোতে আসা-যাওয়া করতেন। আরবদেশের বণিকেরা বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় বন্দরগুলোতে এসে চন্দন কাঠ, হাতির দাঁত, মসল্ল, সূতি কাপড় ক্রয় করতেন এবং জাহাজ বোঝাই করে নিজেদের দেশে নিয়ে যেতেন।[১৮০]

ভারতের বিশিষ্ট ইসলামী গবেষক সাইয়্যিদ সুলায়মান নদভী (র.) তাঁর বিরল গবেষণা গ্রন্থ 'আরব ও হিন্দকে তা'আপ-কাত'-এ লেখেন যে, মিসর থেকে সুদূর চীন পর্যন্ত প্রলম্বিত দীর্ঘ নৌপথে আরবগণ যাতায়াত করতেন। মালাবার উপকূল বেয়ে তাঁরা চীনের পথে বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করতেন।[১৮১]

ঐতিহাসিক এলফিনস্টোন বলেন, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর আমল থেকেই ভারতের সাথে আরবের চমৎকার বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল।[১৮২] এ সম্পর্কে খালিক আহমদ নিযামী বলেন–

India's relation with the Arab world go back to histoary past long before the rise of Islam, there was brisk commercial contact between india and Arabia and the Arab traders carried Indian goods to the European markers by the way of Egypt and Syria. Elphinston has rightly observed that from the days of joseph to the days of Marco polo and Vasco de Gama The Arabs were the captains of Indian commerce. Ther were large number of Arab colunies on the western coast of India and many Indian settlements in the Arab countries. Ubulla, for instance, was known as Arz-ull-Hind on account of the large number of Indians who inhibited that region. When Islam spread and the Arabs got converted to Islam, these colonies continued to flourish as before. The Indian rajas appointed Muslim judge, known as hunurman, to decide their cases and provided all facilities to them to organize their community life. Commercial contact let to cultural relations and while large number of Arab navigational and other terms were adopted by the Indians. Indian customs, institutions and practices found their way to Arabia, Philologists have traced three sanskrit words misk (Musk) zanjbil (ginger) and kafir (comphor) in the Quran. [১৮৩]

চীনদেশে ইসলামের আগমন সম্পর্কে যে সব তথ্যসূত্র চীনা ভাষায় রয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে, খ্রিষ্টীয় ৬২৬ সনের কাছাকাছি কোন একটা সময়ের মধ্যে চীন উপকূলে ইসলাম প্রচারকগণ

---

১৮০. এম. নাজির আহমদ, *মাসিক পৃথিবী*, *বাংলাদেশে ইসলামের আগমন* (ঢাকা : জানুয়ারি, ১৯৯৭ খৃ.), পৃ. ৩০

১৮১. মুহিউদ্দিন খান, *মাসিক মদীনা*, *বাংলাদেশে ইসলাম কয়েকটি তথ্যসূত্র* (ঢাকা : জানুয়ারি, ১৯৯২ খৃ.), পৃ. ৪১

১৮২. নাসির হেলাল, *যশোর জেলার ইসলাম প্রচার ও প্রসার* (যশোর : সীমান্ত প্রকাশনী, নভেম্বর ১৯৯২ খৃ.), পৃ. ৩৭

১৮৩. কে.এ. নিযামী, ড. মুহাম্মদ যাকী সম্পাদিত–'এ্যারাব একাউন্টস অব ইন্ডিয়া' গ্রন্থের ভূমিকা।

অবতরণ করেন। দলের নেতা ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মাতুল আবু ওয়াক্কাস। তাঁর সাথে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আরও তিনজন সাহাবী ছিলেন। দলনেতা হযরত আবু ওয়াক্কাস (রা.) ক্যান্টন বন্দরে অবস্থান করেন। তাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোয়াংটা মসজিদটি এখনও সমুদ্র তীরে সুউচ্চ মিনার নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মসজিদের অদূরেই তাঁর কবর গত প্রায় চৌদ্দশ বছর ধরে চীনা মুসলমানদের পবিত্র ও প্রিয় যিয়ারতগাহ রূপে পরিচিত হয়ে আসছে।[১৮৪] চীনা মুসলমানদের বই-পুস্তকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী হযরত আবু ওয়াক্কাসের জামায়াত ৬২৬ খ্রিস্টাব্দে মুতাবিক হিজরী তৃতীয় সনে চীনে পৌঁছে ছিলেন। এতে বুঝা যায় যে, তারা হাবশা থেকে বের হওয়ার পর অন্যূন নয় বছর পথিমধ্যে বিভিন্ন স্থানে অতিবাহিত করেছেন। আর এ নয় বছর সময়সীমার মধ্যেই ইসলামের বাণী ভারত এবং বাংলাদেশসহ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন উপকূলীয় অঞ্চলে পৌঁছেছে। [১৮৫] ভারতবর্ষেও ইসলামের বাণী এসে পৌঁছে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনকালেই। মুসলিম বণিকদের সাহায্যে সপ্তম শতকের প্রথম দিকেই ভারতের পশ্চিম উপকূলে মালাবার রাজ্যে (বর্তমান কেরালা) ইসলাম প্রচার শুরু হয়। সেখানকার হিন্দু রাজা চেরুমাল, পেরুমাল ইচ্ছাপূর্বক সিংহাসন ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করার অভিলাসে মক্কায় গমন করেন। শায়খ জয়নুদ্দীন তাঁর 'তুহফাতুল মুজাহিদীন ফিবায়ে আবহওয়ালিল বারতাকালীন' গ্রন্থে এ রাজা শেষ নবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণের কথা বর্ণনা করেছেন। এ সময় মালাবারের বহু সংখ্যক হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করে।[১৮৬] বাংলার সাথেও আরবদের সমুদ্র পথে যোগাযোগ ছিল অতি প্রাচীনকাল থেকে। আরব বণিকদের জাহাজ ভারতের পশ্চিম উপকূল পার হয়ে চীনদেশে যাবার পথে বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করতো। কাজেই বাংলার উপকূলে তাদের আনাগোনা হতো। এ সময় (সপ্তম ও অষ্টম শতক) বঙ্গোপসাগরে জাহাজ চলাচল ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল। বাংলার উপকূলে তাম্রলিপি (বর্তমান তমলুক) ও সৎসঙ্গ (বর্তমান চট্টগ্রাম) ছিল প্রধান বন্দর।[১৮৭] এ সময়েই ইসলামের সত্য বাণী বাংলায় প্রবেশ করে। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট উপমহাদেশের জনৈক শাসক উপহার সামগ্রী প্রেরণ করেন বলে একটি হাদীস সূত্রে জানা যায়।

Sarbatak king of kuuj (India) sent on eotth wore full of ginge to baz. Prophet (sm.) as presents according to a narration by Abu Sayd Khudri (r.). It is also reported that the Hazrat Propphet (sm.) sent Hiudityfii, Usma and Sulbyb no the king inviting him to accept Islam. He embraced Islam, Sarbatak also said, I saw the Prophet force, first in Macca, then Medina he was very handsome faced and middle sized man.[১৮৮]

---

১৮৪. মুহিউদ্দিন খান, *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, বাংলাদেশে ইসলাম কয়েকটি তথ্যসূত্র *(এপ্রিল-জুন ১৯৯৮)*, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন), পৃ. ৩৪৭-৪৮

১৮৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৮

১৮৬. আব্দুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম* (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮০ খৃ.), পৃ. ২০

১৮৭. নাসির হেলাল, *যশোর জেলার ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

১৮৮. মোহাম্মদ আব্দুল গফুর, *অগ্রপথিক, সীরাত সংখ্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

এ হাদীসটি কতখানি নির্ভরযোগ্য তা সঠিকভাবে বলা না গেলেও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগেই সমুদ্র পথে আগত আরব বণিকদের মাধ্যমে ইসলামের বাণী যে বাংলায় প্রবেশ করে এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই।"[১৮৯] এ ব্যাপারে আরও জানা যায় যে, ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী যে সময় বঙ্গ বিজয় (১২০১ খৃ.) করেন তার অনেককাল আগে অর্থাৎ অষ্টম শতাব্দীর গোড়াতে আরব বণিক ও ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগের সমুদ্রকূলবর্তী অঞ্চলে ইসলামের বাণী বহন করে আসেন। খ্রিষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দী থেকে চট্টগ্রাম বন্দর আরব ব্যবসায়ী ও বণিকদের উপনিবেশে পরিণত হয়। দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে চট্টগ্রাম ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে আরবীয় বণিক ও ব্যবসায়ীদের প্রভাব প্রতিপত্তির ফলে যখন স্থানীয় লোকজন ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয় এবং এ ধর্ম এদেশের বহু অঞ্চলে সম্প্রসারিত হয়, তখন আরব ও মধ্য এশিয়ার বহু পীর-দরবেশ ও সূফী-সাধক ইসলামের মহান শিক্ষা প্রচার-প্রসার ও দাওয়াতী কার্যক্রম প্রচারকল্পে স্বদেশ পরিত্যগ করে পূর্ববঙ্গের (বাংলাদেশের) নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন।[১৯০]

উল্লেখ্য যে, চাটগাঁয়ের সাথে আরবদের সম্পর্ক অতি প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে, এমনকি চাটগা নামটাও আসলে তাদেরই দেয়া। গঙ্গার-ব-দ্বীপে বা শেষ প্রান্তে এ স্থানটির অবস্থিতি বলে আরব বণিকরা এর নাম দেয় শাতি-উল-গম্ব (গঙ্গার শেষ প্রান্ত বা উপদ্বীপ)। তা থেকে কালক্রমে চাটগা এর রূপান্তর ঘটেছে।[১৯১] বিশিষ্ট ইসলামী শিক্ষা গবেষক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান কর্তৃক বাংলাদেশে ইসলামের আগমন সম্পর্কে লিখিত কয়েকটি তথ্যসূত্র অনুযায়ী বলা চলে যে–

ক) বাংলাদেশের ইসলাম স্থলপথে নয়, সমুদ্রপথে এসেছে।

খ) খোদ রাসূলে করীম (সা.)-এর জীবদ্দশায় এমনকি সম্ভবত হিজরতেরও আগে বাংলার উপকূল অঞ্চলে ইসলামের আলো বিস্তার লাভ করেছে।

গ) বাংলাদেশে সাহাবীগণের আগমন ঘটেছে এবং তাঁরা এ দেশে যথেষ্ট সংখ্যক অনুসারী বা তাবিঈ রেখে গেছেন।

ঘ) অসম্ভভ কিছু নয় যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দূরবর্তী এলাকা এমনকি চীনে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মুসলমানগণও অংশগ্রহণ করেছেন। কেননা হযরত আবু ওক্কায়াস (রা.) সুদীর্ঘ সফরের প্রতিটি বিরতিস্থান থেকেই পরবর্তী মনযিল পর্যন্ত যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় লোক-লস্কর এবং রসদাদি সংগ্রহ করার প্রয়োজন নিশ্চয়ই হয়েছিল।[১৯২]

অন্যদিকে স্থল পথে এ উপমহাদেশে ইসলামের আগমন হয় হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর শাসনামালে। এ ব্যাপারে জনৈক গবেষক বলেন, হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফত কালে ১৫ হিজরী সনের মধ্যভাগ থেকে সিন্ধু অভিযান শুরু হয়। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওফাতের ৩২ বছরের মধ্যে

---

১৮৯. মোহাম্মদ আব্দুল গফুর, *অগ্রপথিক, সীরাত সংখ্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

১৯০. নাসির হেলাল, *যশোর জেলার ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

১৯১. এম.এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮২ খৃ.), ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫

১৯২. মুহিউদ্দিন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৮

৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে আফগানিস্তানদের অধীনে আসে। এ সময়ই ৬৩৬ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় জলসীমায় প্রথম মুসলিম রণতরীর আগমন ঘটে বোম্বের থানা নামক স্থানে।[১৯৩] এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, রাসূলে করীম (সা.) আবর জাতির মধ্যে পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহের অবসান ঘটিয়ে যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাতে কোন ফাটল সৃষ্টি হয়নি। সাহাবায়ে কিরাম এক যোগে ইসলামের পৃষ্ঠপোষকতার জন্যে ঐক্যবদ্ধ ছিলেন। সারা বিশ্বে ইসলামের পয়গাম পৌঁছে দেয়াই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। সে মতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাতের পর বার বছরের মধ্যে তাঁরা একদিকে নীলনদের অপর পাড় এবং অন্যদিকে সিন্ধুনদের তীর পর্যন্ত পৌঁছে যান। এ উপমহাদেশের বিরুদ্ধে অভিযানসমূহে যে সকল সাহাবী অংশগ্রহণ করেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম আমাদের কাছে পৌঁছেছে। তাঁদের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নরূপ :

১. আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন ইতবান (রা.)

২. আসিম ইব্ন আমর তামিমী (রা.)

৩. সুহার ইবনুল আবদী (রা.)

৪. সুহায়ল ইবন আলী (রা.) এবং

৫. হাকাম ইবন আবিল আস-সাকাফী (রা.)।[১৯৪]

১. আব্দুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন ইতবান (রা.)

তিনি মদীনার আনসারদের একটি গোত্র বনুল হুবলার সাথে সংযুক্ত ছিলেন। তিনি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবী এবং আনসারদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন।[১৯৫] ২১ হিজরী/৬৪১ খ্রিষ্টাব্দে সাদ ইব্ন আবু ওয়াক্কাসের স্থলে কুফার গভর্নর নিযুক্ত হন এবং সে বছরের শেষ ভাগে বসরার গভর্নর নিযুক্ত হন।[১৯৬] তারপর তিনি ইরান উপমহাদেশের সীমান্ত অঞ্চলে একের পর এক যুদ্ধ জয়ের সূচনা করেন।[১৯৭]

২. আসিম ইব্ন আমর তামীমী (রা.)

তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবী এবং প্রাথমিক যুগের একজন খ্যাতিমান সৈনিক ছিলেন।[১৯৮] ইরাক বিজয়ে তিনি বিশ্ব বিশ্রুত জেনারেল হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদের সাথে শরীক ছিলেন এবং যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।[১৯৯] তিনিই প্রথম আরব জেনারেল, যিনি হিলমন্দের পশ্চিমাঞ্চল জয় করেন এবং সিন্ধু উপত্যকার বিজয়ে অংশগ্রহণ করেন।[২০০]

---

১৯৩. নাসির হেলাল, *যশোর জেলার ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

১৯৪. ডক্টর মোহাম্মদ এছহাক, *ইলমে হাদীসে ভারতীয় উপমহাদেশের অবদান* (ঢাকা : ই.ফা.বা., জুন ১৯৯৩ খৃ.), পৃ. ১৩

১৯৫. ইবন আবদিল বার, *ইস্তি'আব* (হায়দারাবাদ, দাক্ষিণত্য : ১২২৬ হি.), ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৪৫

১৯৬. ইব্ন আবদিল বার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪৫

১৯৭. প্রাগুক্ত

১৯৮. *ইস্তি'আব*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৮৪

১৯৯. প্রাগুক্ত

২০০. প্রাগুক্ত

৩. সুহার ইব্ন আবদী (রা.)

তাঁর সম্পর্ক ছিল আবদুল কায়স গোত্রের সাথে। ৮ হিজরী/৬৩১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি একটি প্রতিনিধি দলের সাথে হুজর থেকে মদীনায় আগমনকরত ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে তিনি বসরায় গমন করেন এবং সেখানেই বসবাস করতে থাকেন। তিনি পূর্বাঞ্চলের যুদ্ধসমূহে অংশ নেন। সিন্ধুনদের পূর্বাঞ্চলের যে বিবরণ তিনি প্রদান করেছেন, তা থেকে বুঝা যায় যে, এখানকার ভৌগোলিক অবস্থা সম্পর্কে তিনি খুবই ওয়াকিফহাল ছিলেন এবং অধিবাসীদের সাথেও গভীর যোগাযোগ রাখতেন। সুহার একজন 'নাসেবী' অর্থাৎ হযরত উসমান (রা.)-এর সমকক্ষ ছিলেন। সম্ভবত আমীরে মুআবিয়ার শাসনামলের শেষ ভাগে তিনি বসরায় ইন্তিকাল করেন।[২০১]

৪. সুহায়ল ইব্ন আদী (রা.)

তিনি আযদ গোত্রের লোক ছিলেন এবং বনুল আশহালের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি যে সাহাবী ছিলেন এ বিষয়ের কোন সরাসরি প্রমাণ পাওয়া যায় না।[২০২] তবে ১৭ হিজরী/৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি আল-জাযীরার বিরুদ্ধে এক সামরিক অভিযানের নেতা ছিলেন। এ থেকে অনুমান করা হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায় তাঁর সাহাবীদের তালিকাভুক্ত হওয়ার মত বয়স সুহায়লের ছিল; বিশেষত তাঁর সকল ভ্রাতা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অত্যন্ত অনুগত সাহাবী ছিলেন এবং উহুদের যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন।[২০৩] তাঁদের নাম সুহায়ল ইব্ন আদী, হারিস ইব্ন আলী, আবদুর রহমান ইব্ন আদী এবং সাবেক ইব্ন আদী।

৫. হাকাম ইব্ন আমর আস-সাকাফী (রা.)

তিনি বসরায় হিজরতকারীগণের অন্যতম ছিলেন।[২০৪] তিনি নিজে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং মুআবিয়া ইব্ন কুররা ইব্ন কুররা আল-মুযানী (মৃত্যু ১১৩ হিজরী) তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি সাকীফ গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। এ গোত্রের সকল বয়স্ক লোক ১১ হিজরীর পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে বিদায় হজ্জে উপস্থিত ছিল।[২০৫] সে মতে হাকাম যে সাহাবী এবং তাঁর বর্ণিত হাদীসমূহ যে মারফু', এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই। তদুপরি সাহাবীও তাঁর সাহাবী হওয়ার সাক্ষ্য দিয়েছেন। ৪৪ হিজরী /৬৬৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত হাকাম জীবিত ছিলেন।[২০৬]

হযরত উসমান (রা.) ২৩-৩৫ হিজরী/৬৪৩-৬৫৫ খ্রিস্টাব্দ)-এর খিলাফতকালে দু'জন সাহাবীর নাম পাওয়া যায়, যারা ইসলাম প্রচারের জন্য ভারতে এসেছিলেন, তারা হলেন : ১. হযরত

---

২০১. আসকালানী, *ইসাবা*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৭

২০২. *ইস্তি'আব*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৬৯

২০৩. ইবন আবদিল বার, *ইস্তি'আব* (হায়দারাবাদ: দাক্ষিণত্য, ১২২৬ হিজরী), ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৬৯

২০৪. ইবন আবদিল বার, *ইস্তি'আব*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬১

২০৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬১

২০৬. প্রাগুক্ত

আবদুর রহমান ইব্ন সামুরা হাবীর ইব্ন আবদে শামস (রা.), ২. উবায়দুল্লাহ ইব্ন মা'মার আত-তামিমী।[২০৭] তাঁদের আগমনের প্রেক্ষাপট প্রসঙ্গে বলা হয় যে, মুকরান থেকে সিন্ধুনদের পশ্চিম তীর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আরবগণ বিজয়ী হলে সেখানকার অধিবাসীরা খারাজ দিতে সম্মত হয় এবং আরবগণ স্বদেশে ফিরে যান। কিন্তু বর্বর, দুর্ধর্ষ, পার্বত্য উপজাতি মনে প্রাণে বশ্যতা স্বীকার করেনি। ফলে আরবগণের দেশে প্রত্যাবর্তন করতেই তারা বিদ্রোহের পথ বেছে নেয় এবং খারাজ বন্ধ করে দেয়।[২০৮]

উপরোক্ত দু'জন সাহাবীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নরূপ :

আবদুর রহমান ইব্ন সামুরা (রা.)

আবদুর রহমান ইব্ন সামুরা হাবীব ইব্ন আবদ শামস ইব্ন আবদ মানাফ ছিলেন পরবর্তী সাহাবী। তিনি কুরায়শ গোত্রের লোক ছিলেন। মক্কা বিজয়ের সময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর নাম রাখেন আবদুর রহমান। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁর নাম ছিল আবদুল কা'বা অথবা আবদ বিলাল। ৯ম হিজরী/৬৩০ খ্রিস্টাব্দে আবদুর রহমান তাবুক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে শরীক হন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি ইব্ন আব্বাস (রা.), সাঈদ ইব্ন মুসায়্যিব (রা.), ইব্ন সিরীন, আবদুর রহমান ইব্ন আলী লায়লা এবং হাসান বসরীর ওস্তাদ হওয়ারও গৌরব অর্জন করেন। তাঁর কাছ থেকে বর্ণিত হাদীসমূহের মধ্যে একটি বুখারী ও মুসলিম এবং দু'টি মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

৩১ হিজরী /৬৫০ খ্রিস্টাব্দে রাবী ইব্ন যিয়াদের স্থলে আবদুর রহমান সীস্তানের গভর্নর নিযুক্ত হন। তিনি অত্যন্ত সাহসী ও কর্মঠ জেনারেল ছিলেন। কার্যভার গ্রহণের পরই তিনি যরঞ্জ নামক স্থান থেকে পূর্বদিকে অগ্রসর হন এবং ভারতীয় উপমহাদেশের সীমান্ত পর্যন্ত সমগ্র এলাকা অধিকারভুক্ত করে নেন। হেলমন্দ নদীর নিম্নাঞ্চল দিয়ে অগ্রসর হয়ে রুদবারের নিকটে ভারতীয়দের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। এ স্থানটি বর্তমানে আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তানের সীমান্তে অবস্থিত। তিনি বিজয়ী বেশে বুসত পর্যন্ত পৌঁছে যান। বুসত থেকে তিন মনযিল দূরে একটি পাহাড়ে সূর্য দেবের মন্দির ছিল, যাকে আরবরা 'যুর' বলত। তার মূর্তি ছিল স্বর্ণ নির্মিত এবং চক্ষুর স্থলে দু'টি পদ্মরাগমণি সংযুক্ত ছিল। আল-যুর নাম খ্যাত এ পাহাড়টি তখন সিন্ধুর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইব্ন সামুরা মন্দিরে প্রবেশ করে মূর্তির একহাত কেটে ফেলেন এবং পদ্মরাগমণি দুটো বের করে নেন। অতঃপর এ স্বর্ণ ও পদ্মরাগমণি সে অঞ্চলের শাসনকর্তার হাতে ফেরত দিয়ে বললেন, "আমি কেবল প্রমাণ করতে চেয়েছিলাম যে, এ মূর্তি কোন ক্ষতি কিংবা উপকার করতে পারে না।" বলা বাহুল্য, শাসনকর্তা তখন নিকটে দাঁড়িয়ে অবাক বিস্ময়ে ব্যাপারটি অবলোকন করছিল। সিন্ধু এলাকায় সাফল্যের সাথে প্রবেশ করার পর আবদুর রহমান যরঞ্জ গমন করেন। ৫০ হিজরী /৬৭০ খ্রিস্টাব্দ তিনি বসরায় ইন্তিকাল করেন। বসরায় তাঁর নামে একটি সড়কের নাম রাখা হয়েছিল 'সিক্কা ইবন সামুরা'।[২০৯]

২০৭.নাসির হেলাল, *যশোর জেলার ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১-৪২

২০৮.ডক্টর মোহাম্মদ এছহাক, *ইলমে হাদীসে ভারতীয় উপমহাদেশের অবদান* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৯৩ খৃ.), পৃ. ১৪-১৫

২০৯.প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

উবায়দুল্লা ইব্ন মা'মার আত-তামীমী (রা.)

পার্বত্য বিদ্রোহী উপজাতিকে দমন করার জন্য পরবর্তী খলীফা হযরত উসমান (রা.) সাহাবী উবায়দুল্লাহ ইব্ন মা'মার আত-তামিমী (রা.)-কে প্রেরণ করেন। উবায়দুল্লাহ ছিলেন মদীনার বাসিন্দা এবং অত্যন্ত ধনাঢ্য ব্যক্তি। তিনি একজন হাদীস বর্ণনাকারীও বটে। তাঁর এ নিয়োগের সঠিক সন অজ্ঞাত। কিন্তু তাবারীর ঘটনাবলী থেকে জানা যায় যে, হযরত উসমান (রা.) ২৩ হিজরীতে খলীফা হওয়ার পর পরই তাঁকে মুকরান অভিযানে প্রেরণ করেছিলেন।[২১০] মুকরান পৌঁছে উবায়দুল্লাহ কেবল বিদ্রোহীদের শক্তিই পিষ্ট করে দেননি, বরং সিন্ধু নদ পর্যন্ত এলাকাও করতলগত করেছিলেন।[২১১] এভাবে আরবদের ক্ষমতা স্থায়ী হয়ে যায়। সে মতে ৩০ হিজরীতে যখন উবায়দুল্লাহকে কায়িস এ বদলী করা হয় তখন তাঁর স্থলে উমায়র ইব্ন উসমান নিযুক্ত হন।[২১২]

হযরত আলী (রা.)-এর আমলেও সাহাবীরা উপমহাদেশে ইসলাম প্রচার-প্রসার ও দাওয়াতী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছিলেন বলে জানা গেলেও কোন নাম উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

আমীরে মুআবিয়ার সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশ (৪১-৬০ হি./৬৬১-৬৭৩ খৃ.) উপমহাদেশে সর্বশেষ আগমনকারী সাহাবী ছিলেন সিনার ইব্ন সালমা মুহাব্বিক হুযালী। (৪১-৬০ হি./৬৬১-৬৭৩ খৃ.) তাঁর জন্মের পর স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর এ নাম রেখেছিলেন। তিনি প্রকৃতই একজন সাহাবী ছিলেন। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে শৈশবকালে দেখেছিলেন।[২১৩] ইব্ন হাজার তাঁকে কম বয়সী সাহাবী গণ্য করে 'ইসাবা' গ্রন্থে দ্বিতীয় শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[২১৪] সে মতে রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে তাঁর বর্ণিত হাদীসসমূহকে মুরসাল গণ্য করা হয়েছে। তাঁর কাছ থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, ইবন মাজা ও নাসাঈতে সংরক্ষিত আছে।[২১৫]

ইরাকের গভর্নর ৪৮ হি./ ৬৬৮ খ্রিস্টাব্দে সিনানকে উপমহাদেশীয় অভিযানের অধিনায়ক নিযুক্ত করেন। তিনি মুকরান জয় করেন। মুকরান শহরের ভিত্তি স্থাপন করে সেটাকে স্বীয় বাসস্থান হিসেবে নির্বাচিত করেন এবং রাজস্ব ব্যবস্থা কায়েম করেন।[২১৬] এরপর তিনি নিজেকে একজন সুযোগ্য জেনারেল ও পারদর্শী প্রশাসক বলে প্রমাণিত করেন। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে তাঁকে পদচ্যুত করা হয়। সিনানের স্থলে রশীদ ইব্ন আমর জুদায়নী গভর্নর নিযুক্ত হন। আয়াদ গোত্রের সাথে সম্পর্কশীল এ গভর্নর মেদীদের সাথে লড়াইয়ে নিহত হন। ৫০ হি./৬৭০ খ্রিস্টাব্দে সিনানকে পুনরায় ডেকে এনে সাবেক পদে বহাল করা হয়। প্রথমবারের মত এবারও তিনি অসাধারণ যোগ্যতা ও দক্ষতার পরিচয় দেন।

---

২১০. ইবন আবদিল বার, *ইস্তি'আব*, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০১৩

২১১. প্রাগুক্ত

২১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১৪

২১৩. প্রাগুক্ত

২১৪. আসকালানী, *ইসাবা*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

২১৫. প্রাগুক্ত, পৃ.৩২৩

২১৬. ডক্টর মোহাম্মদ এছহাক, *ইলমে হাদীসে ভারতীয় উপমহাদেশের অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

তিনি কায়কান ও বুধ জয় করেন এবং তথায় দু'বছর পর্যন্ত রাজ্য শাসন করেন। তিনি ৫৩ হি./ ৬৭৩ খ্রিস্টাব্দে কুসদারে শাহাদাত বরণ করেন।[২১৭] কুসদারের বর্তমান নাম খুযদার, এটা বেলুচিস্তানে অবস্থিত।

সিনানের মৃত্যুর তারিখ সম্পর্কে কিছুটা জটিলতা পরিলক্ষিত হয়। ইব্ন সাদের বর্ণনানুযায়ী সিনানের ইন্তিকাল হাজ্জাজের শাসনামালের (৮৩-৯৬হিজরী/৭০২-৭১৩ খ্রিস্টাব্দে) শেষ ভাগে হয়েছিল। রিজাল শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞগণ এ বর্ণনাই মেনে নিয়েছেন। কিন্তু এটা অনুমানের বাইরে, কেননা, ফুতুহুল বুলদান ও চাচ নামায় লিখিত আছে যে, সিনানের ইন্তিকাল ভারতীয় সীমান্তে তাঁর সামরিক অভিযানকালে হয়েছিল। এ ছাড়াও সিনানের পদে উবায়দুল্লাহ ইব্ন যিয়াদের পক্ষ থেকে মুনযির ইব্ন জারুদের নিয়োগের পূর্বেই সিনানের ইন্তিকাল হয়েছিল। অবস্থা দৃষ্টে জানা যায় যে, পূর্ব প্রদেশসমূহের গভর্নররূপে উবায়দুল্লাহ নিয়োগের পর ভারত অভিযানের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রথম অফিসার মুনযির ছিলেন। উবায়দুল্লাহ ৫৭-৬৭ হিজরী/ ৬৭৬-৬৮৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত গভর্নর ছিলেন। তাই মুনযিরের নিয়োগ নিশ্চিতই ৫৭ হিজরীতে এবং সিনানের ইন্তিকাল ৫৭ হিজরীর পূর্বে হয়ে থাকবে।[২১৮]

বাস্তব ঘটনা এ যে, দ্বিতীয়বার সিনানের নিয়োগ ৫০ হিজরীতে হয়েছিল এবং তিনি সীমান্ত অঞ্চলসমূহে দু'বছর পর্যন্ত রাজত্ব পরিচালনা করেন। তাই তাঁর ইন্তিকাল নিশ্চিতই ৫৩ হিজরীতে হয়ে থাকবে। যদি সিনানের ইন্তিকাল হাজ্জাজের শাসনামলের শেষভাগে হতো যেমন ইবন সা'দ লিখেছেন, তবে তাঁর ও মুহাদ্দিস কাতাদার (৬৮-১১৭ হি.) সাক্ষাৎ অবশ্যই হতো। কেননা, তাঁরা উভয়েই বসরায় বাস করতেন। কিন্ত সমালোচকদের মতে, কাতাদা সিনানের সাক্ষাৎ লাভ করেননি এবং তাঁর কাছ থেকে কোন হাদীসও শুনেননি। সে মতে এটা সঠিক মনে হয় যে, সিনান ভারতীয় সীমান্তে শহীদ হয়েছিলেন অর্থাৎ ৬১ হিজরীতে, কাতাদার জন্মের ৭ বছর পূর্বে।[২১৯]

মুহাল্লাব ইব্ন আবী সুফরা

মুহাল্লাব ইব্ন আবী সুফরা আযদী (৮-৮৩ হিজরী/৬২৯-৭০২ খ্রিস্টাব্দ) আমীরে মুআবিয়ার খিলাফতকালে ভারতে আগমন করেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন প্রবীণ তাবিঈ। ইস্তিআব, উসদুল গাবা, তাজরীদ, ইসাবা গ্রন্থসমূহে মুহাল্লাব ইব্ন আবী সুফরার নাম বিদ্যমান আছে বিধায় তাঁকে সাহাবী মনে করা হয়। কিন্তু রিজাল শাস্ত্রের সমালোচকগণ একমত যে, মুহাল্লাব একজন প্রবীণ তাবিঈ ছিলেন-সাহাবী নন।

তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন উমর, আবদুল্লাহ ইব্ন ইবনুল আস, সামুরা ইব্ন জুনদুব ও বারা ইব্ন আযিব প্রমুখ সাহাবী থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। অপরদিকে আবু ইসহাক সাবিঈ, মিসাক ইব্ন হারব ও উমর ইব্ন সাঈফ বাসরী মুহাল্লাবের বরাত দিয়ে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি ছিলেন একজন সিকা (নির্ভরযোগ্য) বর্ণনাকারী।[২২০]

---

২১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

২১৮. প্রাগুক্ত

২১৯. প্রাগুক্ত

২২০. প্রাগুক্ত

তিনি ৮ হিজরী/৬২৯ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং খুরাসানের জিলা মারভ আররুয়ের রাগুল নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন। মুহাল্লাব থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী ও মুসনাদ আহমাদ ইব্ন হাম্বলে লিপিবদ্ধ আছে।[২২১]

মুহাল্লাব আবদুর রহমান ইব্ন সামুরার একজন অধীনস্থ জেনারেল হিসেবে ৪৩ হি./৬৬৩ খ্রীস্টাব্দে সিজিস্তান আগমন করেন। মূল সেনাবাহিনী থেকে আলাদা হয়ে তিনি একদল সৈন্য নিয়ে ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। এ দলের সৈন্যরা ছিল তারই নিজ গোত্র আযদের লোক। তিনি ৪৪ হি./৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে কাবুল এলাকা অতিক্রম করে লাহোর পর্যন্ত পৌছেন এবং বানু ও লাহোরের মধ্যবর্তী এলাকায় হানা দেন। ব্রিগস "তারিখ-ই-ফেরেশতা" অনুবাদে লিখেন, মুহাল্লাব মুলতান পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলেন। কিন্তু ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্ণৌ এ মুদ্রিত গ্রন্থে এ কথা লিখিত নেই। সম্ভবত অনুবাদক আরবী বাক্যটির সঠিক অর্থ বুঝতে সক্ষম হননি।

অতঃপর মুহাল্লাব বান্না ও আল-আহওয়ারে পৌঁছেন, যা কাবুল ও মূলতানের মধ্যস্থলে অবস্থিত। এতে সন্দেহ নেই যে, বান্না হচ্ছে বর্তমান বান্না এবং আল-আহওয়ার হচ্ছে লাহোর। মুহাল্লাবের এ আক্রমণের বিস্তারিত বিবরণ জানা যায়নি।[২২২]

ফেরেশতা একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা লিখেছেন, যদ্বারা রিজাল শাস্ত্রে একটি জরুরী বিষয়ের উপর আলোকপাত হয়। ঘটনা এ যে, মুহাল্লাব তাঁর সাথে বার হাজার বন্দী নিয়ে যান এবং তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মুসলমান হয়ে যায়। খাতীব বাগদাদী বর্ণনা করেন খালাফ ইব্ন সালির সিন্দী (মৃত্যু ২৩১ হি.) মুহাল্লাব পরিবারের 'মাওলা' (মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম) এবং একজন বিশিষ্ট ভারতীয় বংশোদ্ভূত হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন। ফেরেশতার উল্লেখিত বর্ণনার প্রেক্ষিতে যথার্থই অনুমান করা যায় যে, খালাফ ইব্ন সালিম সিন্ধী এ যুদ্ধ বন্দীদেরই কারও বংশধর ছিলেন। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, একাধিক সাহাবী ভারতে আগমন করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা এদেশে হাদীস প্রচার করতে পারেনি। তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবী ছিলেন বিধায় নিশ্চিতই হাদীসের জ্ঞান রাখতেন। কিন্তু হাদীস প্রচার করতে সক্ষম না হওয়ার কারণ এ যে, হয় তাঁরা এখানে খুবই স্বল্প সময় অবস্থান করেছিলেন, কিংবা হাদীস শিখানো যায়–এরূপ কোন মুসলমাান স্থায়ী বাসিন্দা তাঁরা পাননি। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ জানা নেই, তবে একথা অবশ্যই বলা যায় যে, সেকালে পরিস্থিতি এমন ছিল, যার মধ্যে হাদীস প্রচারের কাজ পূর্ণ মনোযোগ সহকারে আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব ছিল না। এ কাজের সূচনা তখনই করা হয় যখন হিজরী প্রথম শতাব্দীর শেষ দশকে সিন্ধুতে মুসলিম রাষ্ট্র কায়েম হয়।[২২৩]

যা হোক স্থল ও পানি উভয় পথেই ইসলাম প্রচারকগণ বাংলায় ইসলামের সুমহান বাণী প্রচার করতে আগমণ করেন। তবে স্থল পথে না হয়ে জল পথেই প্রথমে আগমন ঘটে। বাংলাদেশে ইসলাম

---

২২১. প্রাগুক্ত

২২২. প্রাগুক্ত

২২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

প্রচারের ক্ষেত্রে যারা সোনালী অধ্যায়ের সূচনা করেন ও ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন তারা হলেন, বায়েজিদ বোস্তামী (চট্টগ্রাম মৃ. ৮৭৪ খৃ.), শাহ সুলতান বলখী মাহীসওয়ার (ঢাকা ও বগুড়া ১০৪৭ খৃ.), শাহ মুহাম্মদ সুলতান কমরউদ্দীন রুমী (নেত্রকোণা ১০৫৩ খৃ.), বাবা আদম শহীদ (বগুড়া ও বিক্রমপুর ১১৭৯ খৃ.), শাহ মাখদুম রুপোস (রাজশাহী ১১৮৪ খৃ.), শাহ নিয়ামতুল্লাহ বুতশিকন (ঢাকা), মখদুম শাহ শাহদৌলা শহীদ (পাবনা ১২৪০ খৃ.), ফরীদুদ্দীন শক্করগঞ্জ (চট্টগ্রাম ও ফরিদপুর ১২৬৯ খৃ.), হযরত মখদুম শাহ মাহমুদ গজনভী (মোঙ্গল কোর্ট হযরত জালাল উদ্দীন তাবরিযী (লাখনৌতি ও পাণ্ডুয়া ১২১৬ খৃ.), হযরত মাহুমদু শাহ দৌলা শহীদ (শাহজাদপুর ১২৪০-৭০ খৃ.), শাহ তুরফান শহীদ (বগুড়া), মাওলানা তকীউদ্দীন আরাবী (রাজশাহী ১২৫০ সালের মধ্যে), শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (সোনারগাঁও ১২৭৮ খৃ.), শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহিয়া মানেরী (সোনারগাঁও ১২৭৮ খৃ.), শাহ সূফী শহীদ (হুগলী ১২৯০ খৃ.), জাফর খাঁ গাযী (উত্তর ও দক্ষিণ পশ্চিম বংগ ১২৯৮ খৃ.), সৈয়দ নাসির উদ্দীন শাহ নেকমর্দান (দিনাজপুর ১৩০২ খৃ.), শাহজালাল (পূর্ব বংগ ও আসাম (১৩০৩ খৃ.), সৈয়দ আহমদ কল্লাহ শহীদ (কুমিল্লা ও নোয়াখালী ১৩০৩ খৃ.), সৈয়দ আহমদ শাহ তানুরী ওরফে মীরান শাহ (ফেনী ১৩০৩ খৃ.), মাওলানা আতা (দিনাজপুর ১৩০৫-১৩৫০ খৃ.), মখদুম শাহ জালাল উদ্দীন জাহাগাশত বুখারী (রংপুর ১৩০৭ খৃ.), সাইয়িদ আব্বাস আলী মক্কী ও রওশন আর (চব্বিশ পরগনা ও খুলনা ১৩২৪ খৃ.), শায়খ আখি সিরাজউদ্দীন (গৌড় ও পাণ্ডুয়া ১৩২৫ খৃ.), শায়খ আলাউদ হক (পাণ্ডুয়া ১৩২৫ খৃ.), সাইয়িদ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী, শায়খ হোসাইন যোক্করপোশ ও শায়খ বদরুল ইসলাম শহীদ (পাণ্ডুয়া ১৩২৫ খৃ.), শায়খ শহা মোল্লা মিশকিন, শাহ নূর আশরাফ কাযুলী, শাহ বান্দারী শাহ ও শাহ মুবারক আলী (চট্টগ্রাম ১৩৪০ খৃ.), সাইয়িদ রিয়া ইয়ামানী (উত্তরবঙ্গ ১৩৪২-১৩৫৮ খৃ.), রাসতি শাহ ও শাহ মুহাম্মদ বাদগাদী (কুমিল্লা ও নোয়াখালী ১৩৫১-১৩৮৮ খৃ.), শায়খ নূর কুতুব-উল-আলম, শায়খ আনোয়ার শহীদ, শায়খ জাহিদ (উত্তর ও পূর্ব বংগ, ১৩৫০-১৪৪৭ খৃ.), সাইয়িদুল আরেফীন (পটুয়াখালী ১৩৫০-১৪০০ সালের মধ্যে), মাহ লংগর (ঢাকা ১৪০০ সালের আগে), শায়খ যয়নুদ্দীন বাগদাদী ও চিহিল গাজী (রংপুর দিনাজপুর চৌদ্দ শতকের মাঝা-মাঝি), খান জাহান আলী (যশোর, খুলনা, বরিশাল, ১৪৩৭-১৪৫৮ খৃ.), বদরুদ্দীন বদরে আলম শাহীদ ও শাহ মযলিশ (১৪৪০ খৃ.), শায়খ হুসামউদ্দীন মানিকপুরী (১৪৭৭ খৃ.), হাজী বাবা সালেহ (নারায়ণগঞ্জ পনের শতকের শেষ ভাগ), শাহ সাল্লাহ (সোনারগাঁও ১৪৮২-১৫৬০ খৃ.), শাহ আলী বাগদাদী (ফরিদপুর ও ঢাকা ১৪৯৮ খৃ.), একদিল শাহ (চব্বিশ পরগনা ১৪৯৩-১৫১৯ খৃ.), শাহ মুয়াজ্জম হোসাইন দানিশমান্দ (রাজশাহী ১৫১৯-১৫৪৫ খৃ.), শাহ জামাল (জামালপুর ১৫৫৬-১৬০৬/১৫৪২-১৬০৫ খ্রি.), শাহ কামাল (জামালপুর আগমন ১৫০৩ খৃ.), হাজী বাহরাম সাক্কা (পশ্চিমবঙ্গ), খাজা শরফুদ্দীন চিশতী (ঢাকা ১৫৫৬-১৬০৬ খ্রি.) প্রমুখ।[২২৪]

---

২২৪. নাসির হেলাল, *যশোর জেলার ইসলাম প্রচার ও প্রসার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪-৪৫

ইসলামের এ বিপ্লবী প্রচারের কারণেই একথা সর্বজনবিদিত যে, মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্দুরাজ দাহিরের বিরুদ্ধে[২২৫] যুদ্ধ পরিচালনা করে সিন্ধু প্রদেশে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সিন্ধু প্রদেশ পর্যন্ত সামরিক অভিযান পরিচালনার কাজ বহুপূর্ব থেকেই[২২৬] শুরু হয়।

পঞ্চদশ হিজরী উমর (রা.)-এর খেলাফত আমলে উসমান ইবনে আবুল আবী সাকাফীকে বাহরাইন ও ওমানে গভর্নর নিযুক্ত করলে তিনি তার ভ্রাতা মুগীরাকে প্রেরণ করলে, মুগীরা সিন্ধু জলদস্যু ও তাদের সহায়ক শত্রুকে পরাজিত করেন। ৩৯ হিজরীতে আলী (রা.) খেলাফতের সময় হারীস ইবনে মুবরা আবদী সিন্ধু সীমান্তে আভিযান করে জয়ী হন।[২২৭] মুয়াবিয়া (রা)-এর সময় মহাল্লাব ইবনে আবু সুফরা সিন্ধু সীমান্ত আক্রমণ করে মুলতান ও কাবুল পর্যন্ত অগ্রসর হন।

খলীফা ওয়ালীদের শাসনামলে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ইরাকের গভর্নর নিযুক্ত হলে তিনি সিন্ধু অভিযানের উদ্দেশ্যে মুহাম্মদ ইবনে হারুন নসিরী উবায়দুল্লাহ ইবনে নবহান এবং বুদায়েল ইবনে তোহফা বজলীকে পর পর প্রেরণ করেন। অবশেষে ৯৩ হিজরীতে মুহাম্মদ বিন কাসিম জল ও স্থল উভয়পথে অভিযান পরিচালনা করে সিন্ধু জয়[২২৮] করেন।[২২৯]

মালিক ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার কর্তৃক বাংলা বিজয়ের ফলে এ দেশে মুসলমানদের সর্বপ্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ হয়। এ সময় থেকে ক্রমাগত অব্যাহত গতিতে ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে, আফগানিস্তান, ইরান, আরব ও তুরস্ক থেকে অসংখ্য মুসলমান বাংলায় আগমন করতে থাকেন। অধিকাংশ এসেছিলেন সৈনিক হিসেবে অবশিষ্টাংশ ব্যবসা-বাণিজ্য, ইসলাম প্রচার ও আশ্রয় গ্রহণের উদ্দেশ্যে। এভাবে বাংলায় মুসলমানদের সংখ্যা হয়ে পড়েছিল ক্রমবর্ধমান। এ আগমনের গতিধারা অব্যাহতভাবে চলতে থাকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝা-মাঝি পর্যন্ত। মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজীর বাংলা বিজয়ের পর থেকে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর প্রান্তরে মুসলিম রাজ্যের পতন পর্যন্ত পাঁচশত বছরে[২৩০] ১০১ বা ততোধিক শাসক বাংলার শাসন পরিচালনা করেন। এ মুসলিম শাসগকগণের উপর ভর করেই বাংলায় ইসলামী সংস্কৃতির উন্নয়ন ধারা অব্যাহতভাবে আমাদের কাজে এসেছে।

---

২২৫. সিন্ধু রাজ্যের সহায়তায় জলদুস্য কর্তৃক মুসলিম বণিকগণ বারবার লুণ্ঠিত হওয়ার কারণে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়। যুদ্ধে তাদেরকে পরাজিত করে লুণ্ঠিত দ্রবাদি পুনরুদ্ধার ও বন্দী বণিকদের মুক্ত করার পর মুসলমানগণ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

২২৬. হিজরী প্রথম শতকের মাঝামাঝি সময়ে সিন্ধু অভিযানের সূচনা হয়। মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের পূর্বে কয়েকবার সিন্ধু প্রদেশের বিরুদ্ধে মুসলমানদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কিন্তু মুহাম্মদ বিন কাসিমের পূর্বে মুসলমানগণ এখানে কোন স্থায়ী প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেননি।

২২৭. আব্বাস আলী খান, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

২২৮. মুহাম্মদ বিন কাসিম কর্তৃক চূড়ান্তভাবে সিন্ধু প্রদেশ বিজিত হবার পূর্বে তদানীন্তন ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে ইসলাম প্রচার ও জারী করা হয়েছিল তার প্রমাণ এ যে, রাজা দাহির যুদ্ধে নিহত হওয়ার সময় সিন্ধু প্রদেশ মুসলমানদের করতলগত হওয়া।

২২৯. আব্বাস আলী খান, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, ২০০২, পৃ. ২১

২৩০. তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক এমন ছিলেন যারা আপন বাহুবলে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করে দিল্লীর সম্রাটের অনুমোদন লাভ করেন। কিছুসংখ্যক শাসক ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাধীন। আর অবশিষ্টাংশ দিল্লীর দরবার থেকে নিয়োগ পত্র লাভ করে গভর্নর অথবা নাজিম হিসাবে বাংলা শাসন করেন।

চতুর্থ অধ্যায়

হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর আগমনের পূর্বে সিলেটের অবস্থা

বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান ফখর উদ্দীন মোবারক শাহের আমলে মরক্কোর বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা বাংলাদেশে আসেন। ইবনে বতুতা উত্তর আফ্রিকা ও মধ্য এশিয়ার মুসলিম দেশসমূহ সফর করে দিল্লীতে এসেছিলেন এবং দিল্লী থেকে তিনি বাংলাদেশে আসেন ১৩৪৫-৪৬ খ্রিস্টাব্দে। বাংলাদেশে আসার তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল সিলেটে গিয়ে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করা। হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ শেষে তিনি পুরো বাংলাদেশ ঘুরে বাংলাদেশের বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে তাঁর ভ্রমণ বর্ণনায় যে তথ্য তুলে ধরেছেন তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে তৎকালীন সময়ে সিলেটের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অবস্থা সম্পর্কে তাঁর ভ্রমণ বিবরণীতে যে তথ্য পাওয়া যায় তা খুবই মূল্যবান।

হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর আগমনের পূর্বে সিলেটের বিভিন্ন অবস্থা আলোচনায় পূর্বে ইবনে বতুতার বাংলাদেশে আগমন প্রসঙ্গে আলোচনা করা প্রয়োজন ।

ইবনে বতুতা মরক্কো থেকে উত্তর আফ্রিকা ও মধ্য এশিয়ার মুসলিম দেশসমূহ সফর করে বাংলাদেশে আসেন। বাংলাদেশে এসে তিনি সিলেটে গিয়ে হযরত শাহজালার (রহ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। সিলেটে কিছুদিন অবস্থানের পর তিনি নদীপথে সোনারগাঁও আসেন এবং সেখান থেকে জাহাজযোগে জাভার পথে যাত্রা করেন। ইবনে বতুতা জাহাজযোগে এসে প্রথমে যেখানে পদার্পণ করেছিলেন, তার নাম 'সাদকাওয়ান' বলে উল্লেখ করেছেন। ইবনে বতুতার 'সাদকাওয়ান' সনাক্ত নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়। কারো মতে, সাদকাওয়ান ও হুগলি জেলার সাতগাঁও একই জায়গা। আবার কেউ কেউ সাদকাওয়ান ও চট্টগ্রাম (ছোটগাঁও) অভিন্ন বলে মনে করেন। 'সাদকাওয়ান' প্রসঙ্গে ইবনে বতুতা যে বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকে বর্তমানে শেষোক্ত মতটিই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।[২৩১]

ইবনে বতুতা উত্তর আফ্রিকা ও মধ্য এশিয়ার বসরা, সিরাজ, ইস্পাহান, বোখারা, বলখ, সমরকন্দ, হেরাত ইত্যাদি বিখ্যাত শহরসমূহ ভ্রমণ করে ভারতে আসেন এবং দিল্লী ও অন্যান্য ভারতীয় শহর পরিদর্শনের পর তিনি বাংলাদেশে আসেন। সুতরাং ধ্বনির দিক দিয়ে বিবেচনা করলে সাতগাঁও ও চাটগাঁও উভয় শহরের নামের সাথেই 'সাদকাওয়ান'-এর মিল আছে। আর তাঁর বর্ণনার অন্যান্য আনুষঙ্গিক তথ্য বিচারে এ সিদ্ধান্তটিই যথাযথ।

---

২৩১. N.K Bhuttasali, *Coins and Chronology of the early Indeoendent Sultan of Bangel,* pp. 145-149; ইবনে বতুতার বর্ণনায় সাদকাওয়ান একটি সমুদ্র উপকূলবর্তী বিরাট শহর। সমুদ্র মিলিত হওয়ার আগেই এই শহরের নিকট গঙ্গা, যেখানে হিন্দুরা তীর্থে যায় এবং যমুনা নদী মিলিত হয়েছে।

সাদকাওয়ান হয়ে ইবনে বতুতা কামরূপের দিকে রওনা হলেন যা ছিল এক মাসের পথ। আর এটা বহু বিস্তৃত পাহাড়িয়া দেশ এবং এতে চীন ও যে তিব্বতে কস্তুরী হরিণ পাওয়া যায় তার সংলগ্ন। এ দেশের অধিবাসীরা আকৃতিতে তুর্কীদের ন্যায়। এদের ন্যায় কর্মঠ কদাচিৎ অন্যস্থানে দেখা যায়। সেখানকার একজন চাকর অন্যস্থানের কয়েকজন চাকরের কাজ করে। ইবনে বতুতার এ দেশে যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল বিখ্যাত আউলিয়া শায়খ জালাল উদ্দীনের সাথে সাক্ষাৎ করা। শায়খ নিজ সময়ের কুতুব (পীর শ্রেষ্ঠ) ছিলেন। তাঁর অলৌকিক কার্য প্রসিদ্ধ। তার বয়সও অনেক হয়েছিল। তিনি বলেন যে, তিনি খলীফা মুতাসিম বিল্লাহকে বাগদাদে দেখেছিলেন এবং যে সময় খলীফা নিহত হলেন সে সময়ে তিনি সেখানে ছিলেন, তিনি ১৫০ বছর পূর্ণ করে মারা যান। তিনি চল্লিশ বছর হতে বরাবর রোযা রাখতেন। দশদিন অন্তর তিনি একবার ইফতার করতেন। তাঁর শরীর রোগা ছিল। তাঁর হাতে সে দেশের অধিকাংশ লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।[২৩২]

শায়খ জালাল উদ্দীনের নিকট হতে বিদায় নিয়ে ইবনে বতুতা ইবলক শহরের দিকে যান। এটি একটি বড় শহর। এর মধ্যে রয়েছে একটি নদী। যা কামরূপ পাহাড় হতে বের হয়েছে। একে নীল (আজরাক) নদী বলে। এ নদী দিয়ে বাঙ্গালা এবং লাখনৌতে যাওয়া যায়। ইবনে বতুতা এ দেশে ১৫ দিন পর্যন্ত সফর করেছিলেন। এ দেশে গ্রাম এবং বাগান এত বেশি যে, বোধ হচ্ছে যে, বাজার দিয়ে যাচ্ছে। অসংখ্য জাহাজ এ দেশে যাতায়াত করে থাকে।

তখনকার বাদশাহ সুলতান ফখর উদ্দীনের হুকুম এ ছিল যে, এ দেশে ফকীরদের নিকট হতে কোন মাশুল আদায় করা যাবে না। ফকীর কোন শহরে উপস্থিত হলে বাদশাহের তরফ হতে তাকে আধ দীনার দেওয়া হতো। ১৫ দিন পর ইবনে বতুতা সোনারগাঁও গিয়ে উপস্থিত হলেন। এ শহরের অধিবাসীগণ শায়খকে ধরে বাদশাহর হাতে দিয়েছিল।[২৩৩]

ইবনে বতুতা বাংলাদেশে এসে বিভিন্ন এলাকা ঘুরে বাংলাদেশের বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছিলেন তারই আলোকে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর আগমনের পূর্বে বাংলার/সিলেটের বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে। তার পূর্বে সিলেটের ভৌগোলিক অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে।

সিলেটের নামতত্ত্ব

প্রত্যেক জায়গার নামের ইতিহাস সংগ্রহ করলে ঐ স্থানের অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্বের ও প্রাচীন তথ্যের খবর পাওয়া যায়।

প্রখ্যাত চীনা পণ্ডিত ও পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ ৬৪০ সালে সমতট হতে জলপথে সিলেট আসেন। তিনি সিলেটকে 'শীলা চটোল' বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে এটা সমুদ্র তীরবর্তী স্থান এবং কামরূপ রাজা ভাস্কর বর্মার রাজ্যভুক্ত ছিল।[২৩৪]

---

২৩২. শহীদুল্লাহ সংবর্ধনা গ্রন্থ (বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পত্রিকা, ১ম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৩২৯, ৫ম বর্ষ, ২য় সংস্ক.), পৃ. ৪৭৬

২৩৩. প্রাগুক্ত

২৩৪. গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অব.) ফজলুর রহমান, *সিলেটের মাটি সিলেটের মানুষ* (এপ্রিল ১৯৯১ খৃ.), পৃ. ৩৬

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আলবেরুনী একাদশ শতকের প্রথম ভাগে ভারত পরিভ্রমণ করেন। ভারতবর্ষের রীতি-নীতি ও আচার-আচরণ সম্বন্ধে তিনি একখানি তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ লিখে নাম দেন 'কিতাবুল হিন্দ'। গ্রন্থটি লেখা হয় ১০৩০ খ্রিস্টাব্দে। উক্ত গ্রন্থে সিলেটের উল্লেখ আছে। তার মতে কামরূপ, তিলাওয়াত সিলাহাত[২৩৫] প্রভৃতি জনপদ ভারতের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত। এখানে 'সিলাহত' দ্বারা সিলেট বুঝানো হয়েছে। মুসলিম আমলে এ জেলা 'সিলহেট' কারো কারো মতে, 'জালালাবাদ' নামে পরিচিত ছিল। ইংরেজ আমলের প্রথম দিকের কাগজ-পত্রে Silhet বলে উল্লেখ আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কাছাড় ইংরেজ অধিকারে আসার পর কাছাড় জেলার সদর স্টেশন Silchar থেকে পার্থক্য দেখবার জন্য এ জেলাকে Sylhet বলে উল্লেখ করা হযেছে।[২৩৬]

সম্রাট আকবরের সময় সিলেট সরকারের আটটি মহালের উল্লেখ পাওয়া যায়। সিলেট নামকরণের বিভিন্ন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যাখ্যাটি খুবই জনপ্রিয়।

হযরত শাহজালাল (রহ.) ও ৩৬০ আউলিয়া কর্তৃক সিলেট বিজয়ের পর কোন জনশ্রুতি অনুসারে সিলেট বিজয়ের প্রাক্কালে রাজা গৌড় গোবিন্দের ঐন্দজালিক পাথর বা 'শিল' কে 'হট' বা হটে যা (পাথর সরে যাও) হযরত শাহজালালের এ আদেশে পাথরগুলো অপসারিত হলো। কোন কোন জনশ্রুতি অনুসারে পাথরগুলো রাজা গৌড় গোবিন্দের বাহিনীর উপর পতিত হয়। তখন থেকেই শহরের নাম হয় 'সিলহট'। বর্তমান সিলেট 'সিলহট' শব্দের মার্জিত ও পরিবর্তিত সংস্করণ।[২৩৭]

এভাবে সমগ্র সিলেট জেলায় হযরত শাহজালাল (রহ.) ও ৩৬০ আউলিয়ার প্রভাব পড়ে। দিন দিন মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং কালক্রমে মুসলিম অধ্যুষিত একটি এলাকায় পরিণত হয়। হযরত শাহজালাল কর্তৃক সিলেট বিজয়ের সুস্পষ্ট কারণে এটাকে জালালাবাদ নামে অভিহিত করা হয়। উল্লেখ্য, প্রশ্ন করা হয় যে, হযরত শাহজালাল (রহ.) তো আরব দেশ থেকে এসেছিলেন। তিনি 'সীল' এবং 'হট' ইত্যকার শব্দ কীভাবে ব্যবহার করলেন? জবাবে বলা যায়, হযরত শাহজালাল (রহ.) উড়ে এসে জুড়ে বসেন নাই। ইতিহাস সাক্ষি তিনি ও তাঁর সঙ্গি-সাথীরা হাজার হাজার মাইল স্থল পথ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করে স্থানে স্থানে ইসলাম প্রচারকরত বাংলাদেশে এসে পৌঁছেছেন। এক পর্যায়ে গৌড় গোবিন্দের অত্যাচারের কথা এবং এর বিরুদ্ধে সিকান্দর শাহের পরাজয়ের কথা জানতে পেরে দরবেশ নাসির উদ্দিন সিপাহসালার ও সিকান্দর শাহের অনুরোধে সিলেট অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইসলাম প্রচার কালে নিশ্চয়ই তিনি স্থানীয় ভাষাসমূহ আয়ত্ত করেছিলেন। ফার্সী ভাষার কথাই উঠে না যেহেতু সে সময় রাষ্ট্র ভাষা ফার্সী ছিল। সুতরাং এ প্রশ্নটি অমূলক বলে প্রতীয়মান হয়। সিলেটের প্রাচীন নাম শ্রী ক্ষেত্র হতে শ্রীহট্ট নামের উৎপত্তি।[২৩৮]

---

২৩৫. প্রাগুক্ত

২৩৬. সৈয়দ মুর্তজা আলী, *হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৩-২৭৪

২৩৭. *আল-ইসলাহ*, শাহজালাল সংখ্যা, পৃ. ২৬

২৩৮. প্রাগুক্ত

প্রাচীন গৌড়ের রাজধানীতে রাজা গুহক তাঁর প্রিয়তমা কন্যা শীলার স্মৃতি রক্ষার্থে একটি হাট স্থাপন করেন ও নাম রাখেন 'শীলা হাট' বা 'শীলাহট্ট'। এ শিলাহট্ট পরবর্তীতে সিলেট বা শ্রীহট্টে রূপান্তরিত হয়।

প্রাচীন কালে পার্বত্য অঞ্চলে শিলা বা পাথরের প্রাচুর্য ছিল এবং শিলা পাথরের উপর হাট বা বাজার বসতো। গৌড়ের রাজধানীর প্রধান 'হাট' বা 'হট্ট' এর সাথে শিলা যুক্ত হয়ে 'শীলাহট্ট' বা 'সিলহট্ট' শব্দের উদ্ভব হয়েছে। শিলার অদ্যাংশ 'শি' বা 'শিল' যুক্ত অন্য নামের স্থান আছে। যেমন শিলচর, শিলঘাট, শিলগুড়ি, শিলং ইত্যাদি।

ইবনে বতুতা যখন হযরত শাহজালাল (রহ.) সাথে মোলাকাত করতে আসেন, তখন তিনি সিলেটকে কামরূপের বনভূমি বলে উল্লেখ করেছেন। মোট কথা, সিলেট বা শ্রীহট্ট নাম খুব প্রাচীন বলে মনে হয় না। পশ্চিমভাগ (রাজনগর) তাম্রলিপিতে 'শ্রীহট্টমণ্ডল' কথার উল্লেখ আছে; ঐ তাম্রলিপি দশম শতকে উৎকীর্ণ হয়। তবে উক্ত শ্রীহট্টমণ্ডল গৌড়ের রাজধানী ছিল না। কিন্তু এতে প্রমাণ হয় যে, দশম শতকে শ্রীহট্ট শব্দ পরিচিত ছিল।[২৩৯]

'সিলেটের মাটি ও সিলেটের মানুষ' গ্রন্থে সিলেট নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে এভাবে বলা হয়েছে, হযরত শাহজালালের সিলেট (গৌড়) বিজয়ের সাথেও 'শিলহট' নামের সম্পর্ক আছে বলে অনেকের ধারণা। রাজা গৌড় গোবিন্দ রাজধানীর প্রবেশ পথ 'পাথর' বা 'শিল' দিয়ে বন্ধ করে রাখেন। দরবেশ হযরত শাহজালাল (রহ.) তখন আদেশ দেন 'শিলহট' অর্থাৎ পাথর সরে যাও তাঁর নির্দেশে শিল-হটে যায়। তখন থেকে গৌড়ের নাম হয় 'শিলহট'।

ভৌগোলিক বিবরণ ও প্রসঙ্গ কথা

শায়খুল মাশাইখ 'আফতাবে বাঙ্গালা' হযরত শাহজালাল ইয়ামনী (রহ.) সহ ৩৬০ ওলী আল্লাহর অধিকাংশ আউলিয়ায়ে কিরামের দেহ মোবারক ধারণ করেছে পুণ্যভূমি ঐতিহাসিক সিলেটের মাটি। এখানের মাটির স্বাদ, বর্ণ ও গন্ধের সাথে মুষ্টি প্রদত্ত আরবের মাটির মিল খুঁজে পেয়ে আস্তানা স্থাপন করেছিলের মহান দরবেশ হযরত শাহজালাল (রহ.)। এ কারণে সিলেটকে বাংলার আধ্যাত্মিক রাজধানী হিসেবে মর্যাদা প্রদান করা হয়।

একথা ঐতিহাসিক সত্য যে, হযরত শাহজালাল (রহ.) ছিলেন তামাম দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ওলীদের অন্যতম। তিনিই বাংলা ও আসাম অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে আগত আউলিয়া বাহিনীর পথিকৃৎ বা পূর্বসূরি। এ কারণে হযরত শাহজালাল (রহ.)-কে এদেশের আউলিয়াকুল শিরোমণী ও সুলতানুল আউলিয়া বা ওলীকুল সম্রাট হিসেবে মর্যাদা প্রদান করা হয়। তাঁরই নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল একদল মর্দে মু'মিন জিন্দা দিল মুজাহিদ বাহিনী। যারা জিন্দেগীভর অফুরন্ত ত্যাগ ও মেহনতের মাধ্যমে বাংলা ও আসামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলামের শাশ্বত বাণী ও তৌহিদের সুমহান পয়গাম পৌঁছে দেয়ার ফলে বাংলাদেশ একটি সংখ্যাগরিষ্ট মুসলিম রাষ্ট্র। তাছাড়া দুনিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসেবেও

---

২৩৯. *সিলেটের মাটি সিলেটের মানুষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

ইসলামী দুনিয়ায় রয়েছে বাংলাদেশের বিশেষ অবস্থান। এদেশে ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় রয়েছে হযরত শাহজালাল (রহ.) ও তাঁর সঙ্গীয় ওলী-দরবেশদের অশেষ অবদান।

সিলেটের ভৌগোলিক পরিচিতি

সিলেট জেলা (সিলেট বিভাগ) আয়তন ৩,৪৯০.৪০ বর্গ কি.মি.। উত্তরে ভারতের খাসিয়া-জৈন্তিয়া পাহাড়, দক্ষিণে মৌলভীবাজার জেলা, পূর্বে ভারতের কাছাড় ও করিমগঞ্জ জেলা, পশ্চিমে সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ জেলা। বার্ষিক গড় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৩.২° সে., সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৩.৬° সে., বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাত ৩৩৩৪ মি.মি। সিলেটের প্রধান ও দীর্ঘতম নদী সুরমা (৩৫০ কি.মি.), অপর বৃহৎ নদী হলো কুশিয়ারা। এ জেলায় ছোট বড় মিলিয়ে মোট ৮২ টি হাওর ও বিল রয়েছে। এগুলোর মধ্যে সিংগুয়া বিল (১২.৬৫ বর্গ কি.মি.), চাতলা বিল (১১.৮৬ কি.মি.) উল্লেখযোগ্য। সিলেটে সর্বমোট রিজার্ভ ফরেস্ট ২৩৬.৪২ বর্গ কি. মি.। জেলার উত্তরপূর্ব কোণে খাসিয়া ও জৈন্তিয়া পাহাড়ের অংশ বিশেষ বিদ্যমান। সিলেটে বেশ কিছু ছোট ছোট পাহাড় ও টিলা রয়েছে। যার মধ্যে জৈন্তিয়া টিলা (৫৪ মিটার), শারিটিলা (৯২ মিটার), লালোখাল টিলা (১৩৫ মিটার), ঢাকা দক্ষিণের টিলা (৭৭.৭মিটার) উল্লেখযোগ্য।

জনসংখ্যা : ২৫,৬৯৭৮৩ জন, পুরুষ ৫০.৭৫% মহিলা ৪৯.২৫%; মুসলমান ৯১.৯৬%, হিন্দু ৭.৮০%, খ্রিস্টান ০.০৯%, বৌদ্ধ ও অন্যান্য ০.১৫%। খাসি (খাসিয়া) মনিপুরী ও পাত্র সম্প্রদায়ের উপজাতির বসবাস রয়েছে।[২৪০]

ভূতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণের মতে বাংলাদেশকে কয়েকভাগে ভাগ করা যায়। তাঁরা বলেন, সুবিশাল শহর দক্ষিণবঙ্গকে উত্তরবঙ্গ থেকে বিভক্ত করেছে এবং দক্ষিণবঙ্গের বন্যা কবলিত অঞ্চলকে উত্তরবঙ্গের শুষ্ক ভূমি থেকে পৃথক করেছে। উত্তরাঞ্চল ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা দ্বারা তিন ভাগে বিভক্ত হয়েছে। সর্ব পশ্চিমে রয়েছে বরেন্দ্র মালভূমি, শক্ত ও লাল মাটি দ্বারা গঠিত। সত্য কথা বলতে গেলে একে গঙ্গার খাদের উপত্যকার এক বিস্তৃতি বলা যায়। দ্বিতীয় ভূখণ্ড হচ্ছে, উত্তর দিকে অবস্থিত ঢাকা ভূ-ভাগ। তার শক্ত অংশ মধুপুরের লাল মাটি দ্বারা গঠিত। একে বরেন্দ্র ভূমির এক বিস্তৃতি বলা যায়। তবে পশ্চিম ভূভাগ থেকে এ খণ্ড ব্রহ্মপুত্র দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়েছে। এ স্থলে ব্রহ্মপুত্র যমুনা নামে অবিহিত। পূর্বাংশকে সুরমা উপত্যকা বলা যায়। উত্তর ও দক্ষিণ ভূ-খণ্ডের অন্তরবর্তী গম্বুজের মত পলিমাটির এক দেশ।

একে গম্বুজ বিশিষ্ট বলার অর্থ হচ্ছে এ যে, এ ভূ-খণ্ডের পূর্ব-দক্ষিণ অঞ্চল উঁচু টিলা দ্বারা গঠিত এবং উত্তর পশ্চিমাংশ নিম্নভূমি। সিলেট এ সুরমা উপত্যকায় অবস্থিত। তার উচ্চাংশে রয়েছে লাল মাটি ও টিলা, অপরদিকে নিম্নাংশে রয়েছে জলাশয় পূর্ণ ভাটি অঞ্চল।

জনশ্রুতি রয়েছে, বৃহত্তম সিলেটের পশ্চিমাংশে অর্থাৎ সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ জেলার উত্তর পশ্চিমাংশে এক জলাশয় ছিল, তার নাম ছিল কালীদাহ।

সিলেটের এ দুই অঞ্চলের মধ্যে মৃত্তিকার ও উচ্চতার ব্যবধান থাকায় তাদের মধ্যে জলবায়ুরও পার্থক্য রয়েছে। উচ্চভূমি স্বাভাবিকভাবে শুষ্ক হয় বলে সিলেটের উচ্চভূমি নিম্নভূমির তুলনায় অধিকতর

---

২৪০. *বাংলাপিডিয়া*, প্রাগুক্ত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১৯৩-১৯৪

শুষ্ক। অপরদিকে ভাটি অঞ্চলের ভূমি কৃষ্ণ বর্ণ। বর্ষা সমাগমে এ অঞ্চল সাগরের আকার ধারণ করে। এজন্য বর্ষাকালে এ অঞ্চল অত্যন্ত স্যাতস্যাতে হয়ে যায়। বৃষ্টিপাতের পরিমাণও সিলেটের সকল অঞ্চলে সমান নয়। খাসিয়া পাহাড়ে অবস্থিত চেরাপুঞ্জিতে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয় বলে চেরাপুঞ্জির নিকটবর্তী সিলেটের সকল অঞ্চলে অধিক বৃষ্টিপাত। এজন্য সিলেট সদর ও সুনামগঞ্জ জেলার উত্তরাংশে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়। এ অঞ্চল থেকে দূরবর্তী অঞ্চলসমূহে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ তত প্রবল নয়। তবুও গড়পড়তা বৃষ্টিপাতের পরিসংখ্যান নিলে দেখা যাবে, সিলেটে বাংলাদেশের অন্যান্য স্থান থেকে অধিকতর বৃষ্টিপাত হয়। তেমনি বর্ষাকালে কোন কোন স্থান প্লাবিত হয় বলে তাতে পাতিয়া, বেত, হিজল, বরুন প্রভৃতি উৎপন্ন সম্ভব হয়।[২৪১]

সিলেট বিভাগ তিনদিক থেকে ভারত দ্বারা পরিবেষ্টিত। উত্তরে মেঘালয়, পূর্বে আসামের কাছাড় জেলা এবং দক্ষিণে ত্রিপুরা রাজ্য। ঐতিহাসিকদের ধারণা, সিলেট বিভাগের নিম্নাঞ্চল ও সমতল ভূমি এক সময় সাগরের অংশ ছিল।

তখনকার সুবিশাল হাওর, বিল-ঝিল এবং নৌ ঘাটির অস্তিত্ব এ সাক্ষ্য বহন করে। হাওরের উৎপত্তি সায়ার বা সাগর থেকে। সিলেট বিভাগের প্রশাসনিক ইতিহাসে দেখা যায়, সিলেট কখনো বাংলা আবার কখনো আসামের অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাজনৈতিক কারণে বিভিন্ন সময় সিলেট বিভাগের সীমানা পরিবর্তিত হয়েছে। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে সিলেট একজন চীফ কমিশনারের অধীনে আসামের সাথে সংযুক্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত ঢাকা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে সিলেট নতুন সৃষ্ট পূর্ববঙ্গ প্রদেশের প্রশাসনের অধীনে আসে। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে নূতন প্রদেশ বাতিল হলে সিলেট তার পুরাতন প্রশাসনিক অবস্থায় আসামে ফিরে যায়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে গণভোটের মাধ্যমে সিলেট পূর্ব পাকিস্তানের আওতাধীন হয়। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের জরিপ অনুযায়ী সিলেটের আয়তন ছিল ৫,৩৮৭ বর্গমাইল।

১৯৪৭ এর গণভোটের পূর্বে বর্তমান সিলেট বিভাগের মূল সীমানা ছিল ৫,৪৪০ বর্গ মাইল, এখন আসামের অধীনে ন্যস্ত সাড়ে তিনটি থানা ব্যতীত সিলেটের বর্তমান সীমানা ৪,৯১২ বর্গমাইল।

খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীতে বাংলায় চন্দ্র বংশের রাজত্বকালে রাজা শ্রীচন্দ্রের অধীনে শ্রীহট্ট মণ্ডল নামে একটি প্রশাসনিক বিভাগ হিসেবে গড়ে উঠেছিল। যা সামন্ত রাজাদের দ্বারা শাসিত হতো। এককালে সিলেট লাউড়, গৌড় এবং জৈন্তা, ইটা, তরফ রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ৬ষ্ঠ হতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে এখানে মানুষের বসবাস বাড়তে থাকলে তখন থেকে একটি সভ্যতা গড়ে উঠার প্রমাণ পাওয়া যায়।

১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে হযরত শাহজালাল ইয়ামেনী (রহ.)-র রূহানী নেতৃত্বে বিজয়ের পর সিলেট মুসলিম সুলতানদের অধীনে আসে। ১৬২২ খ্রিস্টাব্দে পাঠান গোত্র প্রধান আফগান বীর খাজা ওসমান লোহানীসহ সিলেটের অন্যান্য ভুঁইয়ারা মুগল সেনাপতির নিকট পরাজিত হলে সিলেট মুগলদের শাসনাধীন আসে। এসময় সিলেটের প্রশাসন ছিল মুগল গভর্নর কর্তৃক নিযুক্ত ফৌজদারের অধীনে।

---

২৪১. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *সিলেটে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভের পর সিলেটের বিস্তারিত ইতিহাস জানা সম্ভব হয়। ইংরেজ শাসনামলে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন এবং বিদ্রোহের জন্য সিলেট বিখ্যাত ছিল। উপমহাদেশে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম সংঘটিত হয় সৈয়দ মোহাম্মদ হাদী ও সৈয়দ মাহদীর নেতৃত্বে ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে। জনসাধারণের মাঝে তাঁরা হাদা মিয়া ও মাদা মিয়া নামে পরিচিত। ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে খাসিয়া বিদ্রোহ, ফকির সন্ন্যাসী আন্দোলন (১৭৬৩-১৮০০ খ্রিস্টাব্দ), কুকি বিদ্রোহ ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দ, উপমহাদেশের সিপাহী বিদ্রোহ বা স্বাধীণতা সংগ্রাম ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ এবং নানকার আন্দোলন ১৯২২-২৩ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত হয়।

সিলেট বিভাগের প্রাকৃতিক সম্পদ বিশেষত তেল, গ্যাস, কাঠ, বাঁশ, তেজপাতা, চা, কমলালেবু, চুনাপাথর, মাছ (পানি সম্পদ) বিভিন্ন পশু পাখির জন্যও সুপরিচিত। বাংলায় ইংরেজ কর্তৃত্ব শাসন প্রতিষ্ঠার পর এ বিভাগের প্রশাসন ক্রমে ইংরেজ কোম্পানি অধীনে চলে যায়। স্থানীয় বৈচিত্রের কারণে সিলেট বিভাগের ভূমি বন্দোবস্ত পদ্ধতি এমনকি চিরস্থায়ী জমিদারী পদ্ধতি বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে এ বিভাগের প্রকৃত ভূমির উপর ৩,১৬,৯১১/-টাকা রাজস্ব ধার্য করা হয়। যার ফলে বাংলার অন্যান্য জেলা হতে সিলেট ছিল ব্যতিক্রম।

১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দ বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী হতে সিলেটের বিচ্ছিন্নতা সিলেটকে রাজনীতি, প্রশাসন এবং শিক্ষাগত দিক থেকে আসামের উপর আধিপত্যকারী অবস্থানে এনে দেয়। তথাপি সিলেটের জনগণ বাংলা ভাষার প্রতি তাদের প্রকৃত মমত্ববোধের জন্য সরকারের বিরোধিতা করে। এ ছাড়া জনগণ অনুন্নত এলাকার সাথে সিলেটের মতো উন্নত এলাকার সংযুক্তি পছন্দও করেনি। এ অবস্থায় গভর্নর জেনারেল নর্থ ব্রক সিলেটে আসেন এবং সিলেটের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষার করার ব্যাপারে আশ্বাস দেন। এমনকি এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, সিলেটের শিক্ষা ও বিচার ব্যবস্থা যথাক্রমে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও হাইকোর্টের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। কিন্তু ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে পূর্ববঙ্গে (পূর্ব পাকিস্তানের) সাথে সংযুক্তি পর্যন্ত জনমনে উত্তেজনা ও ক্ষোভ অব্যাহত থাকে।

একটি শ্লোগানে এর প্রমাণ মিলে

আসামে আর থাকবো না গুলি খেয়ে মরবো না
আসাম সরকার জুলুম করে নামাযেতে গুলি করে।

উল্লেখিত বৈশিষ্ট্য ছাড়াও আরো কয়েকটি কারণে স্মরণাতীত কাল থেকে সিলেট বিভাগের গুরুত্ব তাৎপর্যময়। সিলেট শহরে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর দরগাহ কেবল বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অগণিত মুসলিম লোকজন দর্শন ও যিয়ারত করতে আসে না; বরং অন্যান্য দেশ ও ধর্মের লোকজন, এমনকি ইংরেজরাও দরগা যিয়ারত করতে আসতেন।

খ্রিস্টীয় চতুদর্শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইবনে বতুতার সিলেট আগমন এবং হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ সিলেটের-ই ইতিহাসের অংশ। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুসলমানদের বাংলা বিজয়ের পূর্বে বাংলায় কিছুসংখ্যক সূফীর আগমন ও বসতি স্থাপন সম্পর্কে কিছুটা মতভেদ থাকলেও

বাংলার সকল অংশে ইসলামের প্রসার এবং মুসলিম সমাজ সংগঠন ও সম্প্রসারণে সূফীদের অবদান আদৌ উপেক্ষীয় নয়। হযরত শাহজালাল (রহ.) এবং তাঁর প্রিয় তিনশত ষাটজন সঙ্গী বাংলা ও আসামে ইসলাম বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, এতে কোন সন্দেহ নেই। সিপাহসালার সৈয়দ নাসির উদ্দিন গোবিন্দকে পরাজিত করে সিলেট বিজয় এক বহুল প্রচলিত ইতিহাস।

সিলেট বিভাগে রয়েছে দেশের অধিকাংশ চা বাগান। চা রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সূচনা হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে (১৮৪৭-৫৪ খৃ.) প্রতিষ্ঠার কিছুকালের উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে ১৮৮০ দশক থেকে চা শিল্প স্থানীয় ও ব্রিটিশ আবাদ কারীদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিস্তৃতি লাভ করে। বর্তমানে বাংলাদেশের ১৫৬টি চা বাগানের মধ্যে ১৩৪টি সিলেট বিভাগে অবস্থিত। ত্রিশ হাজার শ্রমিকসহ প্রায় তিন লক্ষ লোক এ চা বাগানেরর উপর নির্ভরশীল। অধিকন্তু এ বিভাগটি দেশেরে মোট চা রপ্তানির ৯৬% যোগান দেয়।

সিলেট বিভাগের বাসিন্দাদের ইংল্যান্ড অভিবাসন শুরু হয় প্রায় দু'শ বছর আগে। প্রবাসী সিলেটীদের প্রেরিত অর্থে সিলেটের সমৃদ্ধি তথা বাংলাদেশের জাতীয় আয়েও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়। ব্রিটিশ কোম্পানির জাহাজে করে বহু লোক সিলেট থেকে বিদেশে যায়। জাহাজের অধিকাংশ নাবিকই ছিল সিলেটের। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বহু সিলেটি ব্রিটিশ নৌবাহিনতে যোগ দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সিলেটিদের জন্য নতুন সুযোগ আসে। সংগত কারণেই ব্রিটিশ সরকার তার শিল্প কারখানা পুনর্গঠনের জন্য কমনওয়েলথ দেশসমূহ থেকে শ্রমিক নিয়োগে উৎসাহিতদের ৯৮% ভাগ সিলেট বিভাগের অধিবাসী।[২৪২]

১৯৯৫ সালের ১ আগস্ট সিলেট দেশের ষষ্ঠ বিভাগ হিসেবে মর্যাদা পায় এবং মূলত বৃহত্তর সিলেট জেলার সীমানাই নূতন সিলেট বিভাগের আওতাভুক্ত করা হয়।[২৪৩]

২৪২.সৈয়দ মোস্তফা কামাল, *সিলেট বিভাগের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি* (সিলেট : রেনেসা পাবলিকেশন্স, ফেব্রুয়ারি ২০০০ খৃ., ১ম সংস্ক.), পৃ. ৬৯

২৪৩.*বাংলাপিডিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩

প্রথম পরিচ্ছেদ

সামাজিক অবস্থা

বাংলাদেশের মুসলমানদের প্রথম যুগের সমাজ বিস্তারের ধারা বিশ্লেষণ করলে অবশ্যই এ কথা দাবী করা যাবে না যে, এ সমাজ ছিল মহানবী (সা.)-এর প্রবর্তিত মদীনায় ইসলামী সমাজের একটি অংশ।

প্রথমত : এ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মদীনার ইসলামী সমাজের কয়েশ'শ বছর পর।

দ্বিতীয়ত : এ সমাজ যাঁরা প্রতিষ্ঠিত করেছিল তাঁরা সরাসরি মহানবী (সা.), সাহাবী ও তাবেয়ীগণের কাছ থেকে ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ করেননি। এজন্য বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থা তেমন উন্নত ছিল না। মুসলিম বিজয়ের প্রথম এক শত বছরের মধ্যে বাংলাদেশে সর্বত্র মুসলিম সমাজ গঠন করা সম্ভব হয়নি। কারণ প্রথম একশ বছরে মুসলমানরা উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের কিছু অংশ জয় করে পূর্ববঙ্গে জয়ে অগ্রসর হয়েছিল।[২৪৪] এখনও পর্যন্ত কেবলমাত্র লাখনৌ, পাণ্ডুয়া, দেবকোট ও দিনাজপুর, মহিসন্তোষ ছিল মুসলিম সমাজ সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল এবং সোনারগাঁয়ে আর একটি কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। মুসলিম বিজয়ের প্রথম শতকে অনেক অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

মুসলিমদের অধীনে বাংলার শাসনভার আসার পূর্বে ষষ্ঠ শতকে বাংলায় আর্থ-সংস্কৃতির প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আর্থ-সমাজনীতি অর্থাৎ বর্ণাশ্রমভিত্তিক সমাজব্যবস্থা তখন বাংলাদেশে পুরোদমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ সমাজ ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণরা সমাজের শীর্ষে স্থান লাভ করেছিল। দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বাংলার সমাজ ব্যবস্থার এ ছিল যথার্থ রূপ।

ড. নীহার রঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' গ্রন্থে এ ব্রাহ্মণবাদী সমাজ সংস্কৃতির ভাব কল্পনা নিম্নোক্তভাবে মূর্ত করে তুলেছেন–

"বিভিন্ন বর্ণ, বিভিন্ন ধর্মাদর্শের সহজ স্বাভাবিক বিবর্তিত নয়, ঔদার্যময়, বিন্যাস ময়, এক বর্ণ এক ধর্ম ও সমাজাদর্শের একাধিপত্যই যেন বর্মণ যুগের একমাত্র কামনা ও আদর্শ। যে বর্ণ ব্রাহ্মণ বর্ণ, সে ধর্ম ব্রাহ্মণ ধর্ম এবং সে সমাজাদর্শই পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য সমাজের আদর্শ। একালের স্মৃতি ব্যবহার মীমাংসা গ্রন্থে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্য আদর্শের জয়জয়কার সে আদর্শই হলো সমাজ ব্যবস্থার মাপকাঠি। রাষ্ট্রের শীর্ষে যাঁরা আসীন সে রাজারা এবং রাষ্ট্রের যারা প্রধানতম সমর্থক সে ব্রাহ্মণেরা দুইয়ে মিলে এ আদর্শ ও মাপকাঠি গড়ে তুললেন; পরস্পরের সহযোগিতায়, পোষকতায় ও সমর্থনে মূর্তিতে মন্দিরে রাজকীয় লিপিমালায়, স্মৃতি-ব্যবহার, ধর্মশাস্ত্রে সর্বদা সর্ব উপায়ে এ আদর্শ ও মাপকাঠি সকলে সোৎসাহে প্রচার করলেন।"

ব্রাহ্মণ সমাজ এভাবেই তৎকালীর বাংলার ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রভাব বিস্তার করেছিল। "সামন্ত সেনের পৌত্র বিজয় সেন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের প্রতি এমন কৃপা বর্ষণ করেছিলেন এবং সেই কৃপায়

---

২৪৪. আব্দুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন), পৃ. ১৯৯।

তারা এত ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছিলেন যে, সে ব্রাহ্মণদের পত্নীরা যাতে মুক্তা, মরকত, মণি, রূপা, রত্না এবং কাঞ্চনের সঙ্গে কার্পাসবীজ, শাকপাত্র, অলবুপুষ্প, দাড়িম্ববীজ এবং কুষ্ম গুল্মলতা পুষ্পের পার্থক্য চিনতে পারেন, সে জন্য একদল নাগরিক রমণীকে শিক্ষা দেয়ার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল।[২৪৫]

তদানীন্তন বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থার ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি সামাজিক কদাচারের জন্য অনেকাংশে দায়ী। যেমন, বিবাহের ব্যাপারে নিম্নবর্ণের লোক কোন ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিবাহ করতে পারতেন না। কিন্তু ব্রাহ্মণরা নিম্নবর্ণের যে কোন রমণীকে বিবাহ করতে পারতো। ব্রাহ্মণদের অনুকরণে সমাজের অন্যান্য বর্ণ ও জাতি নিজেদের মধ্যে একটি নিয়মের প্রাচীর গড়ে তুললো। এ নিয়মে সমাজে সুস্পষ্ট নৈতিক অধঃপতনের জন্ম দিল।

বাৎস্যায়ন[২৪৬] পরিষ্কারভাবে বলেছেন, "গৌড় বঙ্গের রাজান্তঃপুরে মহিলারা নিলর্জ্জভাবে ব্রাহ্মণ রাজকর্মচারী ও দাস-ভৃত্যদের সঙ্গে কামচর্চা, কামষড়যন্ত্র কামসম্ভোগ করতেন।" তিনি আরো বলেন, "কামচরিতার্থতার জন্য নগরে-গ্রামে বিত্তবানদের ঘরে দাসী রাখা হতো এবং এছাড়াও ছিল বারারামা ও দেবাদাসী।"

বাৎস্যায়ানের পরবর্তীকালেও বাংলাদেশের কোন শ্রেণির মধ্যে কামবাসনা চরিতার্থতার ব্যাপারে সংযমের আভাস মাত্র পাওয়া যায় না। অষ্টম শতক থেকে বাংলাদেশে ধর্মের নামে যৌন অনাচারও কম উৎসাহ পেয়ে আসেনি। উৎসবের নামে নারী-পুরুষ সামান্য গাছের পাতার পোশাক পরিধান করে যৌন বিষয়ক গান গেয়ে নৃত্য করত। সমাজের নৈতিক অধঃপতনের সঙ্গে নৃত্য-গীত বাদ্যের গভীর সম্পর্ক থাকে। বর্ম সেন যুগে এসবের ব্যাপক প্রচলন ছিল।

সমাজে নৈতিক অধঃপতনে মদের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। সেকালে মদের দোকানে মদ বিক্রি হতো, মদের দোকানের গায়ে চিহ্ন লাগানো থাকতো, যা দেখে খদ্দের সেখানে আসতো। সমাজে পতিতাবৃত্তিরও প্রচলন ছিল।[২৪৭] বাংলার সমাজ দ্রুত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। একদিকে সামাজিক গোঁড়ামি ও অধিকার বঞ্চিত ব্রাহ্মণদের মানুষের নিদারুণ হাহাকার, অন্যদিকে ঐশ্বর্যবিলাস ও কামবাসনার উচ্ছ্বাসময় আতিশয্য। একদিকে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেহগত বিলাস, চারিত্রিক লাম্পট্য, অমানুষিক ঘৃণা ও অবহেলা এবং অন্যদিকে সাহিত্য-কাব্য-কবিতার মধ্যেও যৌন কাম-বাসনার মদিরতা বাংলার সমাজকে অন্তঃসারশূন্য করে দিয়েছিল। চতুর্দিকে নিশ্চিদ্র সুগভীর অন্ধকার। একটুখানি আশা, এক টুকরা আলো তাদের জীবনে সবচেয়ে বড় কামনা ও মহামূল্যবান সম্পদে পরিণত হয়েছিল। তখনকার মানুষেরা সে আলোর সন্ধান পেয়েছিল হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর আগমনের পর।

তবে একথা বলা যায় যে, মুসলিম সমাজের সুষ্ঠু সংগঠন, বলিষ্ট চরিত্র ও উন্নত আদর্শের কারণে আশেপাশের সমাজের উপর প্রভাব পড়ে। যেমন, লক্ষ্য করা যায় বাংলায়/সিলেটে হযরত

---

২৪৫. অতীন্দ্র মজুমদার, চর্যাপদ, পৃ. ৩১

২৪৬. বাৎস্যায়ন-কামসূত্রম।

২৪৭. আব্দুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

শাহজালাল (রহ.)-এর আগমনের পর সেখানকার অবস্থায়। অনেক বিধর্মী ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিল বলে তখনকার সমাজে শান্তি বিরাজ করছিল।

হযরত শাহজালাল (রহ.) বাংলায় আগমনের পূর্বে অনেক আলিম ও সূফীগণের মাধ্যমেও অমুসলিমরা ইসলাম গ্রহণ করেছে। সে সমাজে ইসলামের বিধি-বিধান পরিপূর্ণ না থাকলেও কিছু কিছু বিধান মানার কারণে সমাজে বিশৃংখলা কিছুটা কম হয়।

সূফীগণই আদর্শ ইসলামী চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তাই দেখা যায়, কেবলমাত্র তাঁদের চরিত্র মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে বহু বিধর্মী ইসলাম গ্রহণ করেছিল। সূফীগণ ও শাসক সমাজের সহায়তায় বাংলায় যে মুসলমান সমাজ গড়ে উঠে ষোড়শ শতকে লিখিত কবি কঙ্কন মুকুন্দরামের চণ্ডী মঙ্গলে তার নিম্নোক্ত চিত্রটি পাওয়া যায় :

ফজর সময় উঠি বিছায়ে লোহিত পাটী
পাঁচ বেরি[২৪৮] করয়ে নামাজ
ছোলেমানী মালা করে জপে পীর পগম্বরে
পীরের মোকামে দেয় সাঁঝ ॥
দশ বিশ বেরাদরে বসিয়া বিচার করে
অনুদিত কেতাব কোরান
কেহবা বসিয়া হাটে পীরের শীরিনি বাটে
সাঁঝে বাজে দগড়[২৪৯] নিশান ॥
বড়ই দানিশ মন্দ[২৫০] না জানে কপট ছন্দ
প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ে।
দেখে খালি মাথা তার সনে নাহি কথা
সারিয়া চেলার মারে বাড়ি ॥
ধরয়ে কস্তোজ বেশ মাথাতে না রাখে কেশ
বুক আচ্ছাদিয়া রাখে দাড়ি।
না ছাড়ে আপন পথে দশ রেখা টুপি মাথে
ইজার পরয়ে দৃঢ় করি ॥
আপন টোপর[২৫১] নিয়া বসিলা গাঁয়ে মিয়া
ভুঞ্জিয়া[২৫২] কাপড়ে মোছে হাত ॥

এখানে তদানীন্তন মুসলিম সমাজের সুন্দর একটি চিত্র ফুটে উঠেছে।

---

২৪৮. পাঁচ বার।
২৪৯. দামামা।
২৫০. দানিশমন্দ ফার্সী শব্দ, এর অর্থ জ্ঞানী, পণ্ডিত।
২৫১. তুর্কী টুপি, বিংশ শতকের প্রথমার্ধেও এর প্রচলন ছিল।
২৫২. আহার করে ।

প্রথমত, কবির চণ্ডিমঙ্গলে মুসলমানরা নামাজের পাবন্দ করতো। দ্বিতীয়ত, তারা তাসবীহ তিলাওয়াত ও যিকির-আযকার করত। তৃতীয়ত, দশ বিশজন মিলে কুরআন নিয়ে আলোচনা করত।

এ চিত্রটি দেখে মহানবী (সা.)-এর সে হাদীসটির কথা মনে পড়ে যায়– একদিন মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে দেখলেন সাহাবাগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে কেউ তাসবীহ পাঠ ও যিকির-আযকারে মশগুল হয়েছেন, আবার কোথাও কয়েকজন দলবদ্ধ হয়ে মাসআলা-মাসায়েল আলোচনা ও ইল্‌ম চর্চা করছেন। তিনি চারদিকে নজর করার পর এ বলে ইল্‌ম চর্চার মাহফিলে বসে গেলেন যে, اِنِّيْ بُعِثْتُ مُعَلِّمًا "আমাকে শিক্ষক বানিয়ে পাঠানো হয়েছে।" এখানে একেবারেই নবী করীম (সা.) ও সাহাবাগণের যুগের সেই চিত্রই ফুটে উঠেছে।

চতুর্থত, মুসলমানদের মাঝে ব্যাপকভাবে রোযার প্রচলন ছিল।

পঞ্চমত, বাংলায় মুসলিম সংস্কৃতির একটা পৃথক চেহারা নিতে শুরু করেছিল। অমুসলিমদের থেকে নিজেদের আলাদা করার জন্য মুসলমানরা মাথায় টুপি পরতো, হিন্দু সন্ন্যাসীদের মতো মাথায় বড় বড় চুল রাখতো না; বরং মাথার চুল ছাঁটতো এবং দাড়ি রাখতো আর তারা ধুতি ছেড়ে ইজার বা ঢোলা পায়জামা পরতো। এভাবে মুসলমানরা নিজেদেরকে একটি সুন্দর ও সুশৃংখল সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে গড়ে তুলেছিল।

পরিশেষে বলা যায়, হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর আগমনের পূর্বে সিলেটের সমাজ ব্যবস্থা পরিপূর্ণ ভালো অবস্থানে ছিল, তা বলা ঠিক হবে না; বরং তখনকার মানুষ ইসলাম ধর্ম পরিপূর্ণভাবে মানতো না, তাই সমাজে কিছুটা অশান্তি সৃষ্টি হতো। হযরত শাহজালাল (রহ.) সিলেটে আসার পর অনেক অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেছে, ফলে সিলেটের সমাজ ব্যবস্থা আরো উন্নত হয়েছে যা আজও পরিলক্ষিত হচ্ছে। সিলেটকে বলা হয় 'পুণ্যভূমি', কারণ গবেষণা করে দেখা যায় যে, সিলেটের মানুষ বেশি ইসলাম ধর্ম অনুসরণ করে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাজনৈতিক অবস্থা

মধ্যযুগ থেকে প্রাচীনকালের বিভিন্ন রাজ্য যেখানে রাজতন্ত্র বহাল ছিল সেখানে একটির পর একটি রাজ্য দিল্লীর বাদশাহ ও বাংলার সুলতানদের অধিকারে আসতে থাকে। এ যুগে সিলেটে যুগান্তকারী ও আমূল পরিবর্তনকারী একটি ঘটনা ঘটে। গৌড়ে রাজা গোবিন্দকে পরাস্ত করে ইয়েমেনী আরব বুযুর্গ-পীর হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর নেতৃত্বে সিলেট বিজয় সম্পন্ন হয়।

এ প্রসঙ্গে ড. সতীশ চন্দ্র রায় (১৮৮৬-১৯৬০) যথার্থ বলেছেন, "এই সেই দেশ যেখানকার মাটিতে মহাপুরুষ হযরত মোহাম্মাদ (সা.)-এর জন্মভূমি আরবের পুণ্য মাটির সদৃশ্য দেখিয়া হযরত শাহজালাল (রহ.) আপনার সাধনার ক্ষেত্র নির্বাচন করিলেন।" এরপর থেকেই সিলেটে বাংলার সুলতান ও দিল্লীর বাদশাহদের সাথে আরব নেতৃত্ব চলে আসে। হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর নেতৃত্বে সিলেট বিজয় সম্পন্ন হবার পর একে একে সিকান্দর গাজী, হায়দার গাজী, ওয়াজির মুকাবিল, উলুখ খান, দসতুর মজলিশ, মালিক উদ্দিন, রুকুন খান, গোয়াস খান ও ফতেহ খান প্রমুখ সিলেটের শাসক মনোনীত হন এবং দক্ষতার সাথে শাসন কার্য পরিচালনা করেন।[২৫৩]

উল্লেখ্য যে, হযরত শাহজালাল (রহ.) জীবিতকাল পর্যন্ত এমনকি ওফাতের অনেক কাল পর্যন্ত দিল্লী বা বাংলার শাসকরা সিলেটের দিকে হাত বাড়ানো থেকে বিরত ছিলেন।

হযরত শাহজালাল (রহ.) বাংলায় আগমনের পূর্বে রাজনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল, তা জানার জন্য প্রয়োজন সিলেটের বিভিন্ন যুগ সম্পর্কে ধারণা নেওয়া। নিম্নে সিলেটের বিভিন্ন যুগ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

প্রাচীন যুগ

প্রাচীন কালে সিলেট জেলায় অষ্ট্রিক জাতীয় লোক বাস করত। তারা হাড় ও পাথর দিয়ে অস্ত্র-শস্ত্র নির্মাণ করত। তারা তামা ও লোহার ব্যবহার জানত। কৃষি কাজে তাদের বিশেষ দক্ষতা ছিল। তারাই এদেশে ধানের চাষ শুরু করে। তারা নারকেল, কলা, সুপারি, আদা, হলুদ, লাউ প্রভৃতির চাষ করত। হয়ত তারাই এদেশে তুলার চাষ প্রচলন করেছিলেন। তারা কড়ির সাহায্যে কেনাবেচা করত। আমরা এক গণ্ডা, দুই গণ্ডা, এক কুড়ি, দুই কুড়ি ইত্যাদি গণনার নিয়ম এদের থেকে পেয়েছি। আজকাল অষ্টিকদের ডেভিড বলা হয়। অষ্টিকদের পরে এদশে মঙ্গোলীয় জাতির লোক বাস করে। এদের গোল বা মাঝারি মাথা, বাঁকা চোখ, দেখতে ছোট খাটো ও গায়ের রং ময়লা। মঙ্গোলীয়া প্যারোযাইন শাখার লোকই এদেশে বেশি দেখা যায়। এদের বড় জাতের লোক প্রধানত আসামের কাছাড় জেলা ও ত্রিপুরা রাজ্যে বাস করে। এরা সিলেট জেলার পার্বত্য অঞ্চলেও বাস করত। এর পরে পঞ্চম কি ষষ্ঠ শতাব্দীতে

---

২৫৩. মালিক আনোয়ার, *সিলেট : ভাষা বৈচিত্র্য ও শব্দ সম্পদ* (ঢাকা : ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২০১৩ খৃ.), পৃ. ৩৯

আসেন আর্যরা। এদের দেহের গঠন বলিষ্ঠ। এরা গৌর বর্ণ, দীর্ঘ আকৃতি, এদের মাথা লম্বা, চোখ কটা, নাক লম্বা ও সরু।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে হযরত শাহজালাল (রহ.) ও তাঁর সঙ্গীরা এদেশে আগমন করে যা ছিল এদেশে ইসলাম প্রচারের স্বর্ণযুগ। ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে বিদ্রোহী পাঠানরা উড়িষ্যা ও পশ্চিম বঙ্গ থেকে মোগলদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে বঙ্গের নানা দুর্গম স্থানে আশ্রয় নেয়। এদের অনেকে সিলেটের পার্বত্য অঞ্চলে বাস করে। ত্রয়োদশ–পঞ্চদশ শতাব্দীর উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা রাঢ় থেকে পালিয়ে সিলেটে আসেন।

হিউয়েন সাঙ এর বিবরণীতে (৬২৯-৪৫ খ্রি.) আছে, সমতট থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে সাগরের তীরভূমি বরাবর এগিয়ে পাহাড় ও উপত্যকা ডিঙ্গিয়ে আমরা 'শিলি টেলেই' পৌঁছলাম। কেউ কেউ মনে করেন, এ সিলটেলই সিলেট; কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতদের মতে শিলিচটল বঙ্গদেশের শ্রীক্ষেত্র বা প্রাচীন প্রেম নগরী।[২৫৪]

সিলেটে প্রাপ্ত তাম্রশাসন

পঞ্চ খণ্ড পরগনার নিধনপুর গ্রামে ১৯২২ থেকে ১৯২৫ সালের মধ্যে ছয়খানা তাম্র শাসন পাওয়া যায়। এগুলোর দ্বারা কামরূপের সপ্তম শতাব্দীর মহারাজা ভাস্করবর্মা, তার প্রপিতামহ মহাভূতি বর্মা কর্তৃক দান করা ভূমি পুণরায় দান করেন। ঐ দানকৃত ভূমি চন্দ্রপুরী বিষয়ের (জেলার) অন্তর্গত ছিল। পদ্মনাথ ভট্টচার্য, কনকলাল বড়ুয়া প্রভৃতি ঐতিহাসিক অনুমান করেন যে, দানকৃত ভূমি উত্তর বঙ্গে ছিল। কিন্তু নলীনা কান্ত ভট্টশালী, যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ প্রমুখ পণ্ডিতরা দানকৃত ভূমি সিলেটের ছিল বলে মনে করেন। ১৯৬১ সালে রাজনগর থানার পশ্চিম ভাগ গ্রামে বিক্রমপুরের মহারাজা শ্রী চন্দ্রের দশম শতাব্দীর একটি তাম্র শাসন পাওয়া যায়। ঐ তাম্র শাসন থেকে জানা যায় নিধনপুর চন্দ্রপুরী বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১৯৬৩ সালে শ্রীমঙ্গল থানার কালীপুর গ্রামে আরেকখানি তাম্রশাসন পাওয়া যায়। ঐ তাম্রশাসন দ্বারা সামন্ত নৃপতি মরুগ নাথ মৌলভীবাজার সাব ডিভিশনে কতেক ভূমি দান করেন। এ তাম্রশাসন সপ্তম শতাব্দীর এ দানপত্রের লিপি কুমিল্লায় প্রাপ্ত সামন্ত নৃপতি লোকনাথের তাম্রশাসনের লিপির অনুরূপ। লোকনাথ ও মরুন্তনাল উভয়েই শ্রীনাথের বংশীয় ছিলেন।

১৮৭২ সালে ভাটেরা পরগনায় দুইখানা তাম্রশাসন পাওয়া যায়। ঐ তাম্রশাসনে নবনীবান, গুণগুন নারায়ণ ও গোবিন্দ কেশব দেব নামক রাজাদের উল্লেখ আছে। প্রত্নতাত্ত্বিকরা মনে করেন, এই তাম্রশাসনদ্বয় একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীর। এ সকল তাম্রশাসন থেকে জানা যায়, সপ্তম শতাব্দীতে সিলেট কামরূপের অধীনে ছিল। অতঃপর সিলেট ত্রিপুরার শ্রীনাথের বংশধরদের অধীনে আসে। দশম শতাব্দীতে সিলেট বিক্রমপুরের চন্দ্র বংশীয় রাজাদের অধীনে ছিল। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে এ জেলা

২৫৪.সৈয়দ মুর্তজা আলী, *হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস*, পৃ. ৭৭-৭৮, সূত্র : Fiftinth Auniversary of publication of Burma Research Society, p. 262.

স্থানীয় সামন্ত নৃপতিদের অধিকারে ছিল। সিলেট জেলার চন্দ্রবংশীয় নৃপতিদের আটটি মুদ্রা পাওয়া যায়। মুসলমানদের আগমনের পূর্বে সিলেট সমতট, হারিকেন, পার্টি খেয়া ইত্যাদি রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। পাল বংশীয় রাজাদের এ জেলা অধিকার করার কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না।[২৫৫]

তুর্কি আমল

হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর বিখ্যাত আরব পর্যটক সোলায়মান ছয়রফী পারস্য সাগর হতে বের হয়ে ভারত সাগরে গমন করে বঙ্গোপসাগর অতিক্রমকালে বাংলার বিখ্যাত বন্দর চট্টগ্রাম ও সিলেটের উল্লেখ বার বার করেছেন। সিলেট যে তৎকালে বিখ্যাত বন্দর ছিল প্রাচীন আরবী ইতিহাস হতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করলে তাদের অবস্থান কেন্দ্র হতো সিলেট, আরবদের ভাষায়–সিলাহত।[২৫৬]

সিলেট যে এককালে বন্দর ছিল তার স্মৃতি স্বরূপ বন্দর বাজার চালিবন্দর আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে যখন সিলেটের কালেক্টর রবার্ট লিনডসে ঢাকা থেকে নৌকাযোগে সিলেট আসেন তখন তাকে সিলেট জেলার পশ্চিমস্থ হাওরে সামুদ্রিক কম্পাসের সাহায্যে নৌকা চালনা করতে হয়েছিল। ১৩০৩ সালে হযরত শাহজালাল (রহ.) সিলেট জয় করেন।

সিলেট বিজয়ের পর হযরত শাহজালাল (রহ.) তাঁর সঙ্গী নুরুল হুদা আবুল কেরামত সাইদী হোসেনের উপর এ জেলার শাসনভার অর্পণ করেন। নরুল হুদা সিলেটে হায়দার গাজী নামে পরিচিত। নরুল হুদার অব্যবহিত পরবর্তী শাসনকর্তাদের নাম জানা যায় না। বাংলাদেশ ১৩৩৮ থেকে ১৫৩৮ সাল পর্যন্ত স্বাধীন ছিল। কাজেই বাংলাদেশের এ সময়ের শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে দিল্লী ও উত্তর ভারতের লিখিত ইতিহাসে কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। সিলেট মোগল শাসনে আসে ১৬১২ সালে। এর পূর্ববর্তী সময় সিলেটের ইতিহাসের অন্ধকার যুগ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থগারে রক্ষিত 'সারদা তিলক' নামক সংযুক্ত একখানা 'দাস বিক্রয়-পত্র' থেকে জানা যায় ১৪৪০ সালে বাংলার স্বাধীন সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ সাহেবের আমলে মুকাবিল খান সিলেটের উজীর ও সরে লস্কর ছিলেন। তিনি তখন সিলেটের শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁর কবর হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর দরগায় আছে।

সোনারগাঁওয়ে প্রাপ্ত ১৪৭৪ সালের এক শিলালিপি থেকে জানা যায়, নবাব মোবারক উদ-দৌলা মালিক উদ্দিন তখন ইকলিমে মুয়াজ্জামাবাদ ও লাউড়ের ওজীর ছিলেন। ইকলিম-ই মুয়াজ্জামাবাদ পূর্ব ময়মনসিংহ পশ্চিম সিলেটের ভাটী অঞ্চল নিয়ে বিস্তৃত ছিল। কাজেই দেখা যায়, মালিক উদ্দিন ঐ সময়ে সিলেট জেলার পশ্চিম অংশের শাসক ছিলেন। মৌলভীবাজার সাব ডিভিশনে

২৫৫.সৈয়দ মুর্তজা আলী, *হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস*, পৃ. ৮০; সূত্র : Numismatic Charonicl, Vol. XX, p. 229 (সিলেটে প্রাপ্ত তাম্রশাসন সকলের বিস্তারিত বিবরণ কমলা কান্ত চৌধুরীর অধুনা প্রকাশিত Coppert platers of Sylhet নামক মূল্যবান গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত হলো।

২৫৬.আকরাম খাঁ, *মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস*, ১৯৫৬ খৃ., পৃ. ৬৯

(বর্তমান জেলা) গয়গড় গ্রামের লিপি থেকে জানা যায় যে, ১৪৭৬ সালে মজলিছে আলম নামক মন্ত্রী ঐ মসজিদ নির্মাণ করেন। হয়ত তিনি তৎকালে সিলেটের শাসক ছিলেন।[২৫৭]

মুসলিম আমল

১৩০৩ সালে বাংলার সুলতান শামস উদ্দিন ফিরুজ শাহের (১৩০১-১৩২২) সময়ে সিলেট জেলা মুসলমানদের অধিকারে আসে। এর পরে ১৩৩৮ থেকে ১৫৩৮ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের সুলতানেরা স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন।

হযরত শাহজালাল (রহ.) ও ৩৬০ আউলিয়া কর্তৃক সিলেট বিজয়ের পর সিলেটের শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে এতটুকু উল্লেখ পাওয়া যায় যে, সিকান্দর গাজী সিলেটের সর্বপ্রথম মুসলিম শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে সিকান্দর শাহের উল্লেখ আছে। ১৩৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর যুগ বলে ইতিহাসে উল্লেখ পাওয়া যায়। সিলেটের প্রথম মুসলিম শাসনকর্তা সিকান্দর শাহই পরবর্তীকালে ১৩৫৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সিংহাসন লাভ করে সমগ্র বাংলাদেশ শাসন করেছিলেন। সিকান্দর শাহের পর নরুল হুদা গাজী সিলেটের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন।

মুসলিম শাসনের সময় বৃহত্তর সিলেটে আর্থ-সামাজিক ও জীবিকায়নের ক্ষেত্রে তথা ধর্মীয় আচার-আচরণ সামাজিক মূল্যবোধ ইত্যাদির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়। বিশেষ করে সিলেটের 'জনসৌধ' গঠনের পেছনে এ সময়ের অবদান অনস্বীকার্য।

আব্দুল হামিদ মানিক অনূদিত প্রবন্ধে গবেষক ইউসুফ চৌধুরী লিখিত *The Roots and Tales of the Bangladesh Settlers* বই থেকে বৃহত্তর সিলেটে জনসৌধ এবং সমাজ কাঠামো গঠনে ঐতিহাসিকভাবে সত্য একটি উদ্ধৃতি এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য–

"দিল্লী থেকে সিলেটে নিয়োজিত রাজকীয় সেনাবাহিনীর প্রায় সবাই ছিল অবিবাহিত। তাদের বেশিরভাগ ছিলেন আরব বংশোদ্ভূত। তারা ধর্মান্তরিত পরিবারগুলোর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে তুলেন এবং দুর্গম প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাস শুরু করেন। ভাটি অঞ্চলে প্রায় বিচ্ছিন্ন বাসিন্দা দরবেশদের কাছে এরা ছুটে যান। দরবেশরা নতুন প্রতিবেশি ও স্বধর্মীয় লোকদের নিয়ে একটি সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করেন। সিলেটের মধ্যবর্তী নিম্নভূমি এলাকার এভাবে মুসলিম সমাজের ভিত্তি স্থাপিত হয়। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। গড়ে উঠে গ্রাম, মহল্লা। নতুন জনপদসমূহের নামকরণ হয় আদি অধিবাসী দরবেশদের নামে। এমন গ্রামসমূহের মধ্যে শাহ দাউদ কোরেশীর নামে দাউদপুর, শাহ সুলেমান করণীর নামে করনশী, শাহ মাদারের নামে মাদারপুর, শাহ হিলাল উদ্দিনের নামে হিলালপুর, সদর উদ্দিনের নামে সদরাবাদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।"

পরবর্তী পর্যায়ে ১৩৩৮ সাল থেকে ১৫৫৮ সাল পর্যন্ত প্রায় দুইশত বছর সিলেট তথা অপরাপর অঞ্চল কখনো স্বাধীন অথবা দিল্লীর বাদশাহদের শাসনে ছিল। তারও আরো পরে কিছু কিছু খণ্ড রাজ্য

---

২৫৭. সৈয়দ মুর্তজা আলী, *হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩

বহাল ছিল। আবার মোগল ও ইংরেজ আমলে একীভূত হলো। বৃহত্তর সিলেট গঠিত হলো। আরো অবিশ্বাস্য ও হতভম্বের বিষয় হচ্ছে– যে পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব পাকিস্তান অঞ্চল ছিল অনার্য ও চাষা ভূষাদের অবহিলিত অঞ্চল সে অঞ্চলই ১৯৭১ সালে মর্যাদাবান জাতি হিসেবে পুনরায় স্বাধীন সার্বভৌম জাতিতে পরিণত হলো। অথচ তথাকথিত উন্নতির সমাজের দাবীদার পশ্চিমবঙ্গের ক্ষয়িষ্ণু বাঙালি জনগোষ্ঠী সে ভারতের সাথেই রয়ে গেল স্বাধীনতার প্রকৃত স্বাদ পেল না, মর্মই বুঝল না।

বৃহত্তর সিলেটে রাজন্যবর্গ ও শাসকবৃন্দ

(সুলতানী, আফগানী, আবিসিনীয়, মোগল-পাঠান, ইংরেজ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ : ১২০৩-১৯৭১ খ্রি.)

ড. নীহাররঞ্জণ রায় *'বাঙ্গালীর ইতিহাস'* (আদিপর্ব) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন "গৌড় নামে বাংলার সমস্ত জনপদকে ঐক্যবদ্ধ করার যে চেষ্টা শশাঙ্ক, পাল ও সেন রাজারা করেছিলেন, তাতে কাজ হলো না। যে বঙ্গ ছিল আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক থেকে ঘৃণীত ও অবজ্ঞাত, যা ছিল পাল ও সেনদের আমলে কম গৌরবের ও আদরের– সে বঙ্গ নামেই শেষ পর্যন্ত তথাকথিত পাঠান আমলে বাংলার সমস্ত জনপদ ঐক্যবদ্ধ হলো।"

ক. বাংলায় লাখনৌতি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন ইখতিয়ার উদ-দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী ১২০৩ সালে এবং ইওজ খিলজীর সময় ১২২৭ সালে খিলজী ডাইনেস্টির সমাপ্তি ঘটে।

খ. বাংলায় লাখনৌতি রাজ্যের বিস্তৃতি কাল (১২২৭-১২৩৮ সাল) দিল্লীর পূর্ণ আনুগত্যকাল নাসির উদ্দিন মাহমুদের সময় ১২২৭ সালে শুরু হয়ে আমীর খান ও তুগরীলের সময় ১২৭২ সাল এ ডাইনেস্টি শেষ হয়।

গ. স্বাধীনতা প্রয়াস কাল ১২৭২ সালে সুলতার মুগীস উদ-দীন তুগরীলের সময় থেকে শুরু হয়ে ১৩৩৮ সাল জোর প্রচেষ্টা চলে। অঞ্চলগুলো ছিল সোনারগাঁও, লাখনৌতি ও সাতগাঁও। ১৩৩৮-১৩৫২ সাল পর্যন্ত এসব অঞ্চল স্বাধীন জনপদ হিসেবে গড়ে ওঠে।

ঘ. একীভূত বাংলা সালতানাত ১৩৫২-১৫৩৮ সাল। যেটি ইলিয়াস শাহী বংশ বলে সমধিক পরিচিত। তাঁর সময় থেকে আরম্ভ করে সুলতান সাইফ উদ-দীন হামজা শাহ ১৪১২ সাল পর্যন্ত থাকে। ইলিয়াস শাহ সমগ্র বাংলার সুলতান ছিলেন।

ঙ. ব্রাহ্মণ পুনরুত্থানের প্রয়াস ঘটতে থাকে ১৪১২-১৪১৮ সাল পর্যন্ত। তবে ঐ সময় রাজা গণেশ তেমন সুবিধা করতে পারেন নি। তাই আবার সালতানাত আমল শুরু হয় ১৪১৮ থকে মুহাম্মদ শাহের সময়ে এবং শেষ হয় ১৪৩৬ সালে শামসু-উদ-দীন আহমদ শাহের সময়।

চ. পরবর্তী ইলয়াস শাহী আমল শুরু হয় সুলতান নাসির উদ-দীন মাহমুদ শাহের সময়ে ১৪৩৬ সালে এবং এ সালতানাত টিকে থাকে জালাল উদ-দীন ফতেহ শাহের সময় ১৪৮৭ সাল পর্যন্ত।

ছ. আবিসিনীয় শাসন আমল শুরু হয় ১৪৮৭ সালে সুলতান শাহজাদা বারবক শাহের মাধ্যমে এবং এ আমল শেষ হয় সুলতান মুজাফফর শাহের সময় ১৪৯৩ সনে।

জ. সুলতান আলা উদ-দীন হোসেন শাহ, হোসেন শাহী রাজত্বের পত্তন ঘটান ১৪৯৩ সালে এবং এ বংশের শাসন শেষ হয় সুলতান মাহমুদ শাহের সময় ১৫৩৮ সালে।

ঝ. ১৫৩৯ সালে বাংলায় আফগানী শাসন ন্যস্ত হয় জাহাঙ্গীর কুলি বেগের হাত দিয়ে আর আফগানদের শাসনের অবসান ঘটে ১৫৭৫ সালে দাউদ খান কররানীর সময়ে।

ঞ. এ সময়েই ১৫৭৬ সালে সুবে বাংলা মোগল সাম্রাজ্যো অধীনে চলে আসে। সুবাদার হোসেইন কুলীর হাতে শাসন ভার ন্যস্ত হয়। মোগল আমল দীর্ঘ সময় থাকার পর ১৭১৭ সালে সুবাদার দ্বিতীয় মীর জুমলার সময় এর পরিসমাপ্তি ঘটে।

ট. এ প্রসঙ্গে আরেকটি ঘটনা উল্লেখ করা প্রয়োজন। সেটি হচ্ছে, মোগলরা বাংলা তথা সমগ্র ভারত বর্ষে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং বহিরাগত শক্তি হিসেবে ইংরেজদের আর্বিভাব ঘটে। এ সময় মুর্শিদাবাদে ১৭১৭-১৭৬৫ সালে নিয়াবত (শাসন) আমল শুরু হয় নবাব সুবাদার মুর্শিদ কুলি খানের সময়ে। তারপর মুর্শিদাবাদে নাজিম আমলের সূচনা ১৭৬৫ সালে নবাব নাজিম নজম-উদ-দৌলাহর সময়ে এবং এর শেষ নবাব হচ্ছেন নবাব নাজিম মনসুর আলী খান ১৮৮৪ সালে। বৃহত্তর সিলেট অঞ্চল শাসন করেন কোনো সময় দিল্লীর সালতানাতের অথবা বাংলার স্বাধীন সুলতানদের মনোনীত প্রতিনিধি ও শাসক হিসেবে।

এ সুদীর্ঘ কালব্যাপী বিভিন্ন শাসনের সূচনা হয় ১২০৩ সালে দিল্লীর মসনদে আলা সুলতান মুহম্মদ সুরীর প্রতিনিধি কুতুব উদ-দীন আইবেকের সময়ে আর তার পরিসমাপ্তি ঘটে দিল্লীর দ্বিতীয় আকবরের পুত্র দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফরের সময় ১৮৫৭ সালে। এ সময় সুবে বাংলা তথা সারা ভারতবর্ষই চলে যায় ইংরেজদের দখলে।

পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলার বিভিন্ন শাসনকাল পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর আগমনের পূর্বে সিলেটের রাজনৈতিক অবস্থা তেমন সুশৃংখল ছিল না। কারণ, তখনকার শাসক শ্রেণি ছিল বিধর্মী। হযরত শাহজালাল (রহ.) বাংলায় আগমনের পর বাংলা মুসলিমদের হাতে আসতে থাকে। এরপর থেকেই বাংলা বা সিলেটের রাজনৈতিক অবস্থা কিছু সুশৃংখল লক্ষ্য করা য়ায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অর্থনৈতিক অবস্থা

হযরত শাহজালাল (রহ.) বাংলায় আগমনের পূর্বে সিলেটের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল খুবই উন্নত, যা ইবনে বতুতার নির্ভরযোগ্য বিবরণী থেকে তৎকালীন আর্থ-সামাজিক অবস্থার কথা জানা যায়। সৌভাগ্যের ব্যাপার যে, তিনি বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে চাক্ষুষ বর্ণনা দেন। তাঁর বিবরণ একদিকে যেমন নির্ভরশীল অপরদিকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বাংলার প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্য দেখে হতবাক হন। ফলে তাঁর বর্ণনায় বাংলাদেশের খাদ্যসামগ্রীর অল্পমূল্য ও অল্প ব্যয়ের জীবন যাপনের কথা উল্লেখ করেছেন। ইবনে বতুতা তাঁর বিবরণীতে উল্লেখ করেছেন যে, বাংলাদেশের মতো এত প্রচুর চাউল এবং সস্তা খাদ্যসামগ্রী তিনি আর কোথাও দেখেননি। ইবনে বতুতা বাংলাদেশের কিছু খাদ্যসামগ্রী ও অন্যান্য জিনিসের দাম উল্লেখ করেছেন।

বাংলাদেশ এক বহু বিস্তৃত দেশ। বাংলাদেশে চাউল প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এত সস্তা চাউল আর কোন দেশেই ছিল না; কিন্তু এ দেশ ভাল নয়, অন্ধকারময়। এজন্য খোরাসানের লোক একে 'দোযখপুর আজ নিয়ামত' (ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ নরক) বলে। সেখানে এক রূপার দিনারে[২৫৮] ২৫ রতল[২৫৯] চাউল পাওয়া যেত। এ রতল ২০ টি পশ্চিম দেশীয় রতলের সমান। ৮ দিরহামে এক রূপার দিনার হয়। এদের এবং আমাদের দিরহাম সমান। তিনি বলতেন যে, তার এক স্ত্রী এবং এক চাকর ছিল। তিনি তাদের তিনজনের এক বৎসরের খোরাক এককালে ৮ দিরহাম দিয়ে খরিদ করে রাখতেন। তিনি বলেন, সে সময়ে ৮ দিরহামে দিল্লীর ৮০ রতল পরিমাণ ধান পাওয়া যেত। কুটবার পর তা হতে ৫০ রতল চাউল হত। আর এটি ১০ কিনতার হল। সেখানে দুধওয়ালা মহিষ তিন রূপার দিনারে পাওয়া যেত। সে দামে গাভী হয় না। ভাল মোটা মুরগি ১ দিরহামে ৮টি পাওয়া যেত। পায়রার বাচ্চা এক দিরহমে ১৫ টি। মোটা ভেড়ার দাম ২ দিরহাম, চিনির রতল (দিল্লীর) ৪ দিরহাম, ঘি রতল ৪ দিরহাম, সরিষার তেলের রতল ২ দিরহাম, ৩০ গজ তুলার কাপড়ের দাম ২ দিরহাম এবং সুন্দরী বাঁদীর দাম ১ সোনার দিনার।

উল্লেখিত কিছু সামগ্রী ও অন্যান্য জিনিসের দাম বর্তমান কালের টাকা হিসেবে মূল্যমান যাচাই করা দুস্কর। এতদসত্ত্বেও প্রফেসর নিরোদভূষণ ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে টাকার সম পরিমাণ মূল্যের হিসেবে ইবনে বতুতার বর্ণিত দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য তালিকা নিরূপণ করেন।

দ্রব্য মূল্যের তালিকা : নিচের প্রদত্ত তালিকা থেকে চর্তুদশ শতাব্দীর বাংলায় খাদ্যদ্রব্যের মূল্য সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়।

২৫৮.রূপার দিনার বর্তমান টাকার সমান ছিল।

২৫৯.রতল দিল্লীর মণ। ঐতিহাসিক ফিরিশতার মতে এর ওযন ১২ সের। 'মসলিকুল আবসার'-এর গ্রন্থকারের মতে ১৫ সের।

দ্রব্য সামগ্রী	ওযন (আনুমানিক)	মূল্য
চাউল	৮$^{৩}/_{৪}$ (পৌনে নয় মণ)	৭ টাকা
ধান	২৮ মণ	৭ টাকা
ঘি	১৫ সের	৩.৫০ টাকা
তিল তেল	১৪ সের	১.৭৫ টাকা
চিনি	১৪ সের	৩.৫০ টাকা
তাজা মুরগী	৮টি	০.৯০টাকা
তাজা ভেড়া	১টি	১.৭৫ টাকা
দুগ্ধবতী গাভী	১টি	২১.০০টাকা
সূক্ষ্ম সুতি কাপড়	১৫টি	১৪.০০ টাকা

এ তালিকা ১৯৪৮ সালে প্রফেসর নিরোদভূষণ রায় প্রনয়ণ করেছেন।[২৬০] বাংলাদেশের স্বল্প মূল্যের দ্রবাদি সম্বন্ধে ইবনে বতুতা আরো বলেন যে, মুহাম্মদ আল মাশহাদী নামীয় একজন মরক্কোবাসী, যিনি কিছুদিন সপরিবারে বাংলাদেশে বসবাস করেন, বলেন যে, তিন সদস্য বিশিষ্ট তার সংসারের জন্য ৭ টাকায় সারা বছরের প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করতেন। খাদ্যদ্রব্যের স্বল্পমূল্য থাকা সত্ত্বেও বাংলার জনসাধারণ উচ্চ মূল্যের জন্য অভিযোগ করতেন।

ক্রীতদাস প্রথা

তৎকালীন বাংলা/সিলেটে বেতন দিয়ে চাকর রাখার প্রথা বিশেষ প্রচলিত ছিল না। তখন দেশে ক্রীতদাস প্রথা চালু ছিল। ইবনে বতুতার বিবরণী থেকে জানা যায় যে, চতুর্দশ শতাব্দীতে বাংলায় ক্রীতদাস প্রথা চালু ছিল। প্রমাণ স্বরূপ বলা যায় যে, মরক্কোর বিশ্ব বিখ্যাত পর্যটক বাংলাদেশের দাস-দাসী ক্রয়-বিক্রয় শুধু স্বচক্ষে দেখেননি; বরং তিনি নিজেও একজন দাসী ক্রয় করেন। তিনি বলেন যে, তার সামনে ৭ টাকায় একটি সুন্দরী দাসী বিক্রি হয়। ইবনে বতুতা নিজে ১০ টাকার বিনিময়ে আশুরা নামে এক সুন্দরী দাসী ক্রয় করেন। তার এক সঙ্গী ১৪ টাকায় একজন সুন্দর দাস বা লোক ক্রয় করেন। এ থেকে ধারণা করা যায় যে, নারী অপেক্ষা পুরুষ দাসের মূল্য অধিক ছিল।

ঐ সকল দাস-দাসী ক্রয়-বিক্রয় লিখিত দলীলের সাহায্যে সম্পাদিত হতো। ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে লিখিত এমন একখানি দলীলের নকল নিম্নে দেওয়া হলো : (এ থেকে তখনকার ভাষার নমুনাও পাওয়া যাবে)।

"ইয়াদিকীর্দ্দ শ্রীরাঘবেন্দ চক্রবর্তী সদাসয়েসু। লিখিতং শ্রীরত্ন বল্লভ শর্ম্মণ কস্য বিক্রয় পত্রমিদং। কার্জ্জ আগে (কাজ হেতু) আমি তুমার পাশ হনে (থেকে) মবলগত, তিন রূপাইয়া পাইলাম। পাইয়া আমার পৈত্রিক নফর (চাকর) শ্রীচান্দ্র সুন্দ্রর বেটী ৭ শ্রীমতি আদরু দাসিরে তোমার

২৬০. J.N. Sarker (ed), *Hitory of Bangel,* Voll, 11, pp. 101-102.

পাশ বিক্রয় পত্র করিয়া দিলাম। তোমার পৈত্রিক নফর শুনা সুন্দ্রর পুত্র শ্রীকটা সুদ্রর পাশ বিবাহ দেও। ইহার দিগে যে সন্তান আদি হৈব এহার দান বিক্রি অধিকার তুমার। এহাতে আমার সত্ত নাই। এতদর্থে বিক্রয় পত্র লেখিয়া দিলাম।

ইতি ১২১২ সাল বাঙ্গালা মাহে ১৯ কার্তিক।"[২৬১]

রণপৌত ও ব্যবসা-বাণিজ্য

ইবনে বতুতার বিবরণীতে উল্লেখ আছে যে, তিনি চট্টগ্রামে অবতরণ করে অসংখ্য জাহাজ দেখতে পান। তাঁর মতে, এগুলো ছিল সুলতান মুবারক শাহের রণতরী। অবশ্য যুদ্ধ জাহাজ ছাড়াও অনেক নৌকা নৌ ব্যবসা বাণিজ্যে নিয়োজিত ছিল। তিনি উল্লেখ করেন যে, নদী পথে তরীগুলো এক সাথে দলবদ্ধভাবে যাতায়াত করত। প্রতি নৌকায় একটি করে ডঙ্কা থাকত এবং নৌকাগুলো যখন একে অপরকে অতিক্রম করতো তখন ডঙ্কা ধ্বনি করা হত। সারিবদ্ধভাবে যাতায়াত এবং ডঙ্কা ধ্বনি থেকে অনুমান করা যায় যে, নদী পথ মোটেই নিরাপদ ছিল না। জলদস্যুদের আক্রমণের সম্ভাবনায় বাণিজ্য জাহাজগুলো আতঙ্কগ্রস্ত থাকত।[২৬২]

বাংলাদেশের নিত্যনৈমিত্তিক দ্রব্যাদির প্রাচুর্য্য ও স্বল্পমূল্য আর মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী ইবনে বতুতাকে আকৃষ্ট করলেও এ দেশের আবহাওয়া তাঁর পছন্দ হয়নি। শুষ্ক দেশের মানুষ ইবনে বতুতা বাংলাদেশের অতিবৃষ্টি ও তার সাথে আর্দ্রতা, বর্ষাকালের কর্দমাক্ত পথ-ঘাট এবং বন্যার প্লাবন পছন্দ করেননি। সে কারণেই খোরাসানের লোক এ দেশকে "দোযখপুর আজ নিয়ামত" (ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ নরক) বলে অভিহিত করেছেন বলে তিনি তাঁর সফরনামায় উল্লেখ করেন।[২৬৩]

মোগল আমলে দেশের রাজস্ব দাম নামক মুদ্রার সাহায্যে নিরূপিত হত। দাম তামার মুদ্রা ছিল ও ব্রিটিশ আমলের ডবল পয়সার মতো ছিল। বোধ হয় শের শাহের সময়ে দাম মুদ্রার প্রবর্তন হয়। আইন-ই আকবরীতে সিলেটের রাজস্ব ৫৯,০২,৬০৮ বা ১,৪৭,৫৬৫ টাকা বলে উল্লেখিত আছে। আট দামড়ীতে এক ও চল্লিশটা দামে শের শাহী এক টাকা হত।

নবাবী আমলে সিলেটে রাজস্ব আদায়ের জন্য কড়ি ব্যবহার ছিল। রৌপ্য বা তাম্র মুদ্রার বিশেষ প্রচলন ছিল না। রাজস্ব আদায় করে কড়ি সকল অনেকগুলো বড় রড় গুদামে রাখা হতো ও বছরে এক বৃহৎ তরীশ্রেণি সজ্জিত করে ঢাকায় পাঠানো হতো। এতে সরকারের অনেক টাকা ব্যয় হতো। সিলেটে স্বনামখ্যাত কালেক্টর রবার্ট লিন্ডসে এই প্রথা রহিত করেন। এর পরে কড়ি প্রকাশ্য নিলাম করে প্রাপ্ত মূল্য রৌপ্য মুদ্রায় পরিণত করে ঢাকায় পাঠানো হতো।[২৬৪]

পরিশেষে বলা যায় যে, হযরত শাহজালাল (রহ.) বাংলায় আগমনের পূর্বে এর অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত ছিল। যা আমরা মরক্কোর বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতার বিবরণীতে পেয়েছি।

---

২৬১. সৈয়দ মুর্তজা আলী, *হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১

২৬২. আব্বাস আলী খান, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩-১৮৫

২৬৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮

২৬৪. সৈয়দ মুর্তজা আলী, *হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১-১০২

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ধর্মীয় অবস্থা

হযরত শাহজালাল (রহ.) বাংলায়/সিলেটে আগমনের পূর্বে এখানকার ধর্মীয় অবস্থা ছিল খুবই জঘন্য। হাতে গোনা কয়েকজন মুসলমান ছাড়া অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষের সংখ্যা ছিল বেশি।

হযরত শাহজালাল (রহ.) যখন বাংলায়/সিলেটে আগমন করেন তখন গৌড় গৌবিন্দ ছিল তখনকার গৌড়ের শাসনকর্তা। তার মত নিষ্ঠুর, অত্যাচারী ও পরধর্ম বিদ্বেষী শাসক ইতিহাসে খুব কমই দেখা যায়।

গৌড় গৌবিন্দের অত্যাচার, নিষ্ঠুরতা ও পাপাচারের কথা ভাষায় বর্ণনা করা সাধ্যাতীত। তার নিষ্ঠুর অত্যচারে রাজ্যের প্রজাগণ একেবারে অস্থির হয়ে পড়ত। কত যে জনক-জননীর যুবতী, কিশোরী কন্যার শ্লীলতাহানী সে করেছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। এমনকি দেশের প্রজাগণ তার অত্যাচারে জর্জরিত হয়েও মুখ ফুটে কিছু বলতে সাহস পেত না।

সর্বাপেক্ষা বেশি আক্রোশ ছিল মুসলমানদের প্রতি। মুসলমানদের যেন আদৌ দেখতে পারতো না। তার অত্যাচারের ভয়ে মুসলমানগণ প্রকাশ্য ও স্বাধীনভাবে ধর্ম-কর্ম করতে পারতো না।

উল্লেখ্য যে, এ রাজা গৌড় গৌবিন্দই সিলেটের হিন্দু রাজত্বের ধ্বংসকারী তথা সর্বশেষ ব্যক্তি। সে সময় সিলেটে মুসলমানদের সংখ্যা খুবই কম ছিল। তখনকার সময়ে নগণ্য হাতে গোনা মুসলমানদের কোন স্বাধীনতা, নাগরিক অধিকার, এমনকি প্রাণের নিরাপত্তা পর্যন্ত ছিল না। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও বিধি-বিধান করতে তাদের পদে পদে বাধা-বিপত্তি ছিল। নামায আদায়ের জন্য আযান দেওয়ার সাধ্য ছিল না। কেউ প্রকাশ্যে নামায পড়লে বা নামাযে পঠিত কোন কিছু হিন্দুদের কানে গেলে সে মুসলিমকে রাজার নিকট ধরে নিয়ে যেত। তাছাড়া এসব কাজ তদন্ত করার জন্য রাজ সরকার হতে অসংখ্য গোয়েন্দা নিযুক্ত ছিল। এদের আতঙ্কে ধর্মভীরু মুসলমানকে যে কি সতর্কতার সাথে গোপনে ধর্মীয় নির্দেশ পালন করতে হতো, তা চিন্তাও করা যায় না। যদি ঘটনাক্রমে মুসলিম ব্যক্তি সামান্য আওয়াযে নামাযে একামত ও কিরাআত পাঠ করতো আর তা প্রকাশ হয়ে যেত তবে সে অপরাধে নামাযী ব্যক্তিকে বেত্রাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করা হতো।[২৬৫]

এমন অসহ্য জুলুম ও অন্যায় নিপীড়ন সহ্য করা ছাড়া তথাকার অসহায় মুসলমানদের এসব প্রতিকার করার কোন সাধ্য ছিল না। তারা এসব প্রতিকারার্থে একমাত্র পরম সহায় সর্বশক্তিমান আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করতো। মহান আল্লাহ প্রকৃত মুসলমানদের জন্য প্রধান সাহায্যকারী এবং সব বিপদ থেকে উদ্ধারকারী ও ত্রাণকর্তা। মুসলমানদেরকে তিনি জয়যুক্ত করবেন এ প্রতিশ্রুতিতে আল্লাহ নিশ্চয় আবদ্ধ, আর সম্ভবত সে প্রতিশ্রুতি পালনের লক্ষ্যেই তিনি তাঁর প্রিয় বান্দা হযরত

---

২৬৫. আলহাজ্জ মাওলানা সিরাজুল ইমলাম, *হযরত শাহজালাল (রহ.) ও শাহ পরান (রহ.)-এর জীবনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯-৭০

শাহজালাল (রহ.)-কে সুদূর আরব হতে সিলেটে নিয়ে এসেছিলেন। তখনকার সময়ে ধর্মীয় অবস্থা কত খারাপ ছিল তা একটি উদাহরণের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি। তা হলো :

রাজা গৌড় গৌবিন্দের রাজত্বকালে সিলেটে বুরহান উদ্দিন নামে এক ধার্মিক মুসলমান বাস করত। তিনি প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারী ছিলেন; কিন্তু তার কোন সন্তান ছিল না। সন্তানহীনতা জীবনে যে কত বড় অভাব ও অশান্তির কারণ তা সন্তানহীন লোকেরাই বুঝতে পারবে। আর এ অভাব মোচনের জন্য বুরহান উদ্দিন ও তাঁর স্ত্রী আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করতে থাকে। তারা দুজনই প্রায় বার্ধক্যের দ্বারে উপনীত হয়েছে, তবু তারা আশা ছাড়েনি। মহান আল্লাহও তাদের কাকুতি-মিনতি কবুল করেন। তারা একটি মানত করেন যে, যদি পুত্র সন্তান হয় তবে শোকরানাস্বরূপ একটি গরু কুরবানী করবে। যা হোক বুরহান উদ্দিনের সারা জীবনের কান্না-কাটি ও কাকুতি-মিনতির ফলে তার স্ত্রী গর্ভধারণ করল। বার্ধক্যের দ্বারে উপনীত হয়ে ভাবী সন্তানের আনন্দে আত্মহারা হলেন বুরহান উদ্দিন ও তাঁর স্ত্রী। তারা লাখ লাখ শোকরিয়া আদায় করলেন। ক্রমে সময় অতিক্রান্ত হয়ে নির্দিষ্ট সময়ে একটি সুন্দর পূর্ণ চন্দ্রের মত একটি পুত্র সন্তান জন্ম দিল তাঁর স্ত্রী। এ যেন বেহেশত হতে প্রেরিত বুরহান দম্পতির জন্য এক শ্রেষ্ঠ নিয়ামত। শিশু জন্মের চতুর্থ দিনে শেখ বুরহান উদ্দিন তাঁর মানত পূর্ণ করার দিন ঠিক করলেন। বুরহান উদ্দিন সর্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ ও হৃষ্ট-পুষ্ট একটি গরু এনে আল্লাহর নামে কুরবানী করলেন। আর গরু কুরবানী করা ছিল গৌড় গৌবিন্দের কাছে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় অপরাধ। বুরহান উদ্দিন কিছুটা সংগোপনে গরু কুরবানী করে এর মাংস গরীর-দুঃখী ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। যখন গরু কাটা হয়েছিল তখন নাকি একটি চিল এসে এক টুকরো মাংস নিয়ে উড়ে যায়। চিলটা মাংস খণ্ড নিয়ে যায় এবং গৌড়ের রাজা গৌবিন্দের রাজপ্রাসাদের আঙ্গিনায় ফেলে দেয়। নিকটে ও আশে পাশে যারা উপস্থিত ছিল তারা মাংস খণ্ডটির কাছে গিয়ে দেখেন যে, এটি গরুর মাংস। সাথে সাথে এ খবর রাজার নিকট চলে গেল। রাজা গৌবিন্দ এ খবর শুনামাত্র ক্রোধে একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে গেল এবং ক্রোধে বলে উঠল, কার এমন স্পর্ধা যে, আমার রাজ্যে গো-হত্যা করতে সাহস পেল? সে যে হোক তাকে খুঁজে বের করে তাকে এ পাপের শাস্তি দিতে হবে। রাজা আদেশ করা মাত্রই রাজকর্মচারীরা খুঁজাখুঁজি করে বুরহান উদ্দিনের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেল তাঁর বাড়িতে বিরাট আনন্দ ভোজউৎসব হচ্ছে। সে মুহূর্তে রাজার কর্মচারীরা বুরহান উদ্দিনকে নিয়ে রাজার নিকট নিয়ে এল। বুরহান উদ্দিনকে দেখে রাজা গৌবিন্দ ক্রোধান্বিত হয়ে বলে, কোন সাহসে তুই আমার রাজ্যে গো-হত্য করলি। বুরহান উদ্দিন নির্ভয়ে অতি শক্তভাবে বললেন–

মহারাজ! আমি সহজে এ কাজে ব্রতী হয়নি, এ কাজ না করে আমার কোন উপায় ছিল না। কেননা, আমি সন্তানহীন ছিলাম। আল্লাহর কাছে অনেক কান্নাকটির পর আল্লাহ আমাকে একটি পুত্র সন্তান দান করেন। তখন আমি মানত করেছিলাম প্রভু, তুমি আমাকে একটি পুত্র সন্তান দান করলে আমি তোমার উদ্দেশ্যে একটি গরু কুরবানী করব। আমি এ মানত আদায় করার জন্য গরু কুরবানী করি।

বুরহান উদ্দিনের কথা শুনে গৌড় গৌবিন্দের ক্রোধ যেন আরও কয়েকগুণ বেড়ে গেল। রাজা তার অনুচরদেরকে লক্ষ্য করে বলে, যে শিশুর জন্য গরু কুরবানী করেছে সে শিশুটিকে এনে দেবতার বেদীমূলে বলিদান কর। আর যে হাত দ্বারা গো-হত্যা করেছে, সে হাতটি কেটে দ্বিখণ্ডিত কর।

অতঃপর রাজার আদেশমত অনুচরগণ বুরহান উদ্দিনের বাড়িতে গিয়ে শিশু পুত্রকে নিয়ে এসে এক পাষণ্ড জল্লাদ এক কোপে শিশুটিকে দুইখণ্ড করে দেন। সাথে বুরহান উদ্দিনের ডানহাত কব্জি পর্যন্ত কেটে দেন। এ লোমহর্ষক কাণ্ড করে রাজা গৌড় গৌবিন্দ ও তার অনুচরবৃন্দসহ ফূর্তি করতে থাকে।

শুধু বুরহান উদ্দিন নয় আরও মুসলিমকে রাজা গৌবিন্দের অনেক অত্যাচার ও অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করতে হচ্ছে। তেমনি তরফের সামন্ত রাজা আচাক নারায়ণ কর্তৃক কাজী নুর উদ্দিন নামক এক সম্ভ্রান্ত মুসলিমের উপর ভীষণ অত্যাচারের ঘটনাও উল্লেখ করা যায়।

অর্থাৎ হযরত শাহজালাল (রহ.) বাংলায়/সিলেটে আগমনের পূর্বে মুসলমানদের ধর্মীয় অবস্থা ও পরিবেশ ছিল খুবই প্রতিকূল। হাতে গোনা কয়েকজন মুসলমান ছাড়া বাকিরা ছিল অন্যান্য ধর্মাবলম্বী। মুসলমানদের উপর অনেক নির্যাতন ও অত্যাচার চলত। তারা স্বাধীনভাবে ধর্ম-কর্ম পালন করতে পারতো না। হযরত শাহজালাল (রহ.) আগমনের পর অনেক বিধর্মী ইসলাম গ্রহণ করেন এবং বাংলার শাসনভার মুসলমানদের হাতে আসে।

পঞ্চম অধ্যায়

সিলেটে ইসলাম প্রচার ও বাংলায় ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ

প্রথম পরিচ্ছেদ

তিনশত ষাট আউলিয়াসহ হযরত শাহজালাল (রহ.)

আধ্যাত্মিক জগতের মহান সাধক শাহজালাল (রহ.) পবিত্র মক্কা শরীফ হতে যখন ভারতবর্ষের দিকে যাত্রা আরম্ভ করেন তখন তাঁর সাথে মাত্র বারোজন দরবেশ ছিলেন। অতঃপর যতই তিনি সামনের দিকে এগুতে থাকেন ততই তাঁর সাথীদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। সর্বশেষ তাঁর ভক্ত অনুরক্তের সংখ্যা তিনশত এগারোতে গিয়ে দাঁড়ায়। তবে সিলেটে পৌঁছার পর তাঁর ভক্ত মুরীদের সংখ্যার সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। অথচ মানুষের মুখে সিলেট তিনশত ষাট আউলিয়ার মুল্লুক বলে সুপরিচিত। সুতরাং বুঝা যায় যে, সিলেট পৌঁছার সাথে সাথে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর ভক্ত সংখ্যা ষাট-এ গিয়ে দাঁড়ায়। অথবা এমনও হতে পারে যে, তিনি তিনশত এগারোজন বা তিনশত তেরোজন শাগরিদ নিয়ে সিলেটে এসেছিলেন। পরে বাংলাদেশের কিছু লোক তাঁর শিষ্যত্ব লাভ করে কামালিয়াত হাসিল করেছিলেন এবং যার ফলশ্রুতিতে তাঁর ভক্ত-অনুরক্তদের সংখ্যা তিনশত ষাট-এ পৌঁছেছিল। হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর শিষ্যদের মধ্যে প্রধান ছিলেন– হাজী ইউসুফ, হাজী খলিল, হাজী দরিয়া এবং আরেকজন সঙ্গী চাশনী পীর ছিলেন মৃত্তিকার তহবিলদার।[২৬৬]

এ তিনশত ষাটজন দরবেশ ছিলেন হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর নিজস্ব হাতে গড়া খাস শাগরিদ। এর বাইরে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর আরো শাগরিদ ছিলেন। যাদের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। ফুলের সুবাস নেয়ার জন্য চারদিক হতে ভ্রমর যেভাবে ছুটে আসে তেমনি হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর সাহচর্য লাভ ও তাঁকে এক নজর দেখার জন্য চারদিক হতে প্রচুর পরিমাণ লোক হযরতের কাছে আসতেন। হযরত শাহজালাল (রহ.) ছিলেন সদা হাস্যময়, সদালাপি ও পরিপাটি মানুষ। তিনি যখন কথা বলতেন তখন মনে হতো তাঁর কণ্ঠ হতে মধু ঝরে পড়ছে। হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর মধুর ব্যবহারেও আধ্যাত্মিক সাধনার আকর্ষণে অনেক হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত শাহজালাল (রহ.) যে দায়িত্বভার নিয়ে ভারতবর্ষে আগমন করেছিলেন সে মহান দায়িত্ব পালন তাঁর একার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই আধ্যাত্মিক সাধনার কামালিয়াত হাসিল করা খাস শাগরিদদেরকে ইসলাম প্রচারের জন্য বিভিন্ন এলাকায় প্রেরণ করেছিলেন। হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর ভক্ত শিষ্যবৃন্দ মুর্শিদের আদেশ অনুযায়ী আপনাপন স্থানে অবস্থান করে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছিলেন। কোথাও কোন জটিলতার সৃষ্টি হলে শাগরিদবৃন্দ মুর্শিদের কাছে তা ব্যক্ত করতেন।

---

২৬৬. মুফতি আজহার উদ্দিন সিদ্দিকী, *শ্রীহট্টে ইসলাম জোতি* (ঢাকা : উৎস প্রকাশন, ২০০২ খৃ.); পরিদর্শনের তারিখ : ২৮ জুন ২০১১ খৃ.

হযরত শাহজালাল (রহ.) এর সুষ্ঠু সমাধান প্রদান করতেন। সিলেটের বিভিন্ন জায়গায় এসব দরবেশের মাজার এখনও বিদ্যমান আছে।[২৬৭] নিম্নে কয়েকজন আউলিয়া কেরামের বর্ণনা তুলে ধরা হলো :

গাজী সিকান্দার খান

গাজী সিকান্দার খান ছিলেন দিল্লীর সম্রাট ফিরোজশাহ তুঘলোকের বোনের ছেলে। ফিরোজশাহ তুঘলোকের আদেশে তিনিই সর্বপ্রথম সিলেট অভিযানের জন্য সসৈন্যে যাত্রা করেন; কিন্তু প্রতিকূল আবহাওয়ার দরুন তার সৈন্যদের স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাওয়ায় তিনি হতোদ্যম হয়ে পড়েন। এহেন পরিস্থিতিতে তিনি আরো সৈন্য পাঠানোর আবেদন জানিয়ে ফিরোজশাহের কাছে দূত প্রেরণ করেন। সম্রাট ফিরোজশাহ তুঘলোক দূত মারফত সিকান্দার গাজীর দুরাবস্থার কথা শ্রবণ করে জ্যোতিষীর সাথে পরামর্শ করে সাইয়্যিদ নাসিরুদ্দীনকে সিপাহসালার বানিয়ে আরো অনেক সেনাসদস্যসহ এক বিরাট বাহিনী সিলেট অভিযানের জন্য প্রেরণ করেন। হযরত সাইয়্যিদ নাসিরুদ্দীন সিপাহসালার হয়ে আসার পর গাজী সিকান্দার খান সেনাপতির আসন হতে পদত্যাগ করে সাইয়্যিদ নাসিরুদ্দীনের হাতে পূর্ণ বাহিনীর নেতৃত্বের দায়িত্ব অর্পণ করেন। অতঃপর সাইয়্যিদ নাসিরুদ্দীন সিপাহসালার হয়ে এক বিশাল বাহিনী নিয়ে সিলেট আক্রমণ করেন এবং সিলেট বিজিত হয়। গাজী সিকান্দার খানের মাযার সপ্তগ্রামে অবস্থিত। তবে জনশ্রুতি আছে যে, সুরমা নদীতে নৌকা ডুবির ফলে তাঁর মৃত্যু হয়।[২৬৮]

সেনাপতি সাইয়্যিদ নাসিরুদ্দীন (রহ.)

হযরত সাইয়্যিদ নাসিরুদ্দীন (রহ.) ইরাকের রাজধানী বাগদাদের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি রাজনৈতিক কারণে বাগদাদ ত্যাগ করে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং পাঠান সম্রাট ফিরোহ শাহ তুঘলকের সেনাবাহিনীতে সাধারণ একজন সৈনিকের চাকরি গ্রহণ করেন। তবে জনশ্রুতি আছে যে, তিনি আত্মীয়-স্বজনের ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে স্বদেশ ত্যাগ করেন;[২৬৯] কিন্তু তাঁর আচার-ব্যবহারে তা মনে হয় না। কারণ, তাঁর মতো কোমলপ্রাণ এবং ধার্মিক ব্যক্তির পক্ষে কারো সাথে ঝগড়া-বিবাদ বা মনোমালিন্য করে স্বদেশ ত্যাগ করার যুক্তিযুক্ত কোন কারণ থাকতে পারে বলে আমদের মনে হয় না। রাজনৈতিক কারণে তিনি স্বদেশ ত্যাগ করেছিলেন বলে আমাদের বিশ্বাস। তার যাথেষ্ট কারণও আছে। তখন বাগদাদের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল খুবই নাজুক। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তখনকার জ্ঞানী-গুণী অনেকেই বাগদাদ ত্যাগ করে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় হিজরত করেছিলেন। খুব সম্ভব সাইয়্যিদ নাসিরুদ্দীনও সে ঘোলাটে রাজনীতির কারণেই স্বদেশ ত্যাগ করেছিলেন।

নীরব সাধক সাইয়্যিদ নাসিরুদ্দীন (রহ.)

সিপাহসালার সাইয়্যিদ নাসিরুদ্দীন (রহ.) নীরব সাধক ছিলেন। হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর কাছে দীক্ষা গ্রহণের পূর্বে তিনি অন্য কারো নিকট দীক্ষা নিয়েছিলেন কিনা তা জানা যায় না। তবে তাঁর

---

২৬৭. দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, *হযরত শাহজালাল (র)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

২৬৮. আলহাজ মাওলানা মোঃ শহীদুল ইসলাম, *হযরত শাহজালাল (রহ.) ও শাহ পরান (রহ.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১

২৬৯. শামসুল আলম, *হযরত শাহজালাল (রহ.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩

সাধনা বহু পূর্ব হতেই চলছিল বলে প্রতীয়মান হয়। কারণ, সৈন্যবাহিনীতে থাকাবস্থায়ই তাঁর ঘরের বাতি নিভে না যাওয়ার অলৌকিকত্ব প্রকাশ পায়। সম্রাট তুঘলকের সৈন্য বিভাগে একজন সাধারণ সৈনিকের চাকুরি পদে যোগদান করে তিনি তার প্রকৃত পরিচয় গোপন করে রেখেছিলেন। প্রকৃত সাধকরা তো তাই কামনা করে থাকেন। তারা চান, তাদের গোপন বিষয় যেন অপর কেউ না জানে। কিন্তু প্রতিভার বিকাশ আপনা হতেই ঘটে থাকে। ফুল ফুটলে সুঘ্রাণ লুকিয়ে রাখা যেমন সম্ভব হয় না, তেমনি সাধক নাসিরুদ্দীনের কামালিয়াতের কথাও গোপন থাকেনি। এক সময় তা ঠিকই প্রকাশ হয়ে পড়েছিল। দিল্লীর সম্রাটের কাছে তিনি ধরা পড়ে গেলেন এবং সাধারণ সৈনিক হতে সরাসরি প্রধান সেনাপতির পদে নিয়োজিত হলেন। তারপর সিলেট বিজয়ের জন্য যাত্রা করে আকস্মিকভাবে রাস্তায় হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর আধ্যাত্মিক সাধনায় মুগ্ধ হয়ে তিনি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সিলেট বিজয়ের পর হযরত শাহজালাল (রহ.) তাঁকে তরফ বিজয়ের জন্য প্রেরণ করেন। তরফে মুড়ারবন্দে তাঁর মাযার আজো তার সাক্ষ্য বহন করে।[২৭০]

খাজা আদীনা (রহ.)

হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর অন্যতম সহচর হযরত খাজা আদীনা (রহ.) একজন কামেল ওলী ছিলেন। হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর সাথে থেকে তাঁর আধ্যাত্মিক সাহচর্য পেয়ে তিনি কামালিয়াতের সর্বোচ্চ মাকামে উন্নীত হয়েছিলেন। তাঁর নামানুসারেই সিলেট শহরে খাস দবীর মহল্লার উত্তর দিকে একশত বিশ গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটির নাম আদীনা মসজিদ রাখা হয়েছে। পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও জুমুয়ার নামায ছাড়াও এ মসজিদে দুই ঈদের নামায অনুষ্ঠিত হয়। ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে ইসপিনদিয়ার খান কর্তৃক মসজিদটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ইসপিনদিয়ার খান ছিলেন তখনকার সিলেটের প্রশাসক। কথিত আছে যে, সে বছর ঈদুল আযহার নামায উপলক্ষে মসজিদে আসতে প্রশাসকের খুব দেরী হয়। ফলে ইমাম সাহেব তাকে বাদ দিয়েই নামায সমাপ্ত করেন। তাতে ক্ষুব্ধ হয়ে ইসপিনদিয়ার খান মসজিদটি ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দেন। ভগ্ন মসজিদের সে অবশিষ্টাংশ কালের অতলগর্ভে একেবারে বিলীন হয়ে যায়নি। এর ভগ্নাবশেষ এখন পর্যন্ত টিকে থেকে ওলীয়ে কামেল খাজা আদীনা (রহ.)-এর নাম ও মাহাত্ম্য ঘোষণা করছে। আদীনা মসজিদের কাছেই তাঁর মাযার অবস্থিত।[২৭১]

শাহজাদা আলী (রহ.)

শাহজাদা আলী (রহ.) ইয়ামানের রাজপুত্র ছিলেন। যুবরাজ শাহজাদা আলীর পিতা হযরত শাহজালাল (রহ.)-কে পরীক্ষা করার জন্য শরবতে বিষ মিশিয়ে তার অনুচরবর্গের মাধ্যমে হযরত শাহজালাল (রহ.)-কাছে প্রেরণ করেছিলেন। আল্লাহর প্রিয় বন্ধু হযরত শাহজালাল (রহ.) বিসমিল্লাহ বলে বিষমিশ্রিত শরবত পান করেন। আল্লাহর কুদরত বুঝা বড়ই কঠিন। বিষ তাঁর কোন ক্ষতি করতে

২৭০.দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *সিলেটে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

২৭১.সৈয়দ মুর্তজা আলী, *হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

পারেনি; বরং যিনি তাঁর জন্য বিষ পাঠিয়েছিলেন বিষের ক্রিয়া তার মাঝেই পরিলক্ষিত হলো। বিষমিশ্রিত শরবত পান করলেন হযরত শাহজালাল (রহ) আর বিষের ক্রিয়ায় মৃত্যুবরণ করলো ইয়ামানের বাদশাহ। কি আশ্চর্য ব্যাপার! পিতার এ মর্মান্তিক পরিণতি দেখে শাহজাদা একেবারে সংসার বিরাগী হয়ে পড়লেন। রাজ্য, রাজত্ব তাঁর কাছে ভালো মনে হলো না। হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর দ্বীনদারী ও পরহেযগারীতে মুগ্ধ হয়ে তিনি তাঁর সাথী হতে চাইলেন। কিন্তু হযরত শাহজালাল (রহ.) তাকে তাঁর শিষ্যত্বে নিলেন না। নিরাশ হয়ে শাহজাদা গৃহে ফিরে এলেন। অনেক চেষ্টা-সাধনা করলেন সংসার ধর্মে মন বসাতে; কিন্তু তাতে তিনি ব্যর্থ হলেন। যে মন একবার ঘর ছেড়ে পালায় তাকে কি আর ঘরে ফিরিয়ে আনা যায়। হযরত শাহজালাল (রহ.) তখন ইয়ামান হতে ভারতবর্ষের দিকে যাত্রা শুরু করে দিয়েছেন। যুবরাজ একদা রাতের অন্ধকারে ঘর থেকে বের হয়ে পড়লেন। তিনি সামনের দিকে এগিয়ে চলছেন আর পিছনে পড়ে রইল তার ঘর-সংসার, রাজসিংহাসন–এক কথায় সবকিছু। একাধারে পথ চলতে চলতে তিনি ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর নিকট গিয়ে হাজির হলেন। হযরত শাহজালাল (রহ.) এবার আর তাকে ফিরিয়ে দিলেন না। পরম আদরে তিনি তাকে শিষ্যত্বে বরণ করে নিলেন। রাজপুত্র আলী সারাজীবন হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর কাছে কাছেই ছিলেন। সিলেটে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর মাযারের পাশেই তাঁর মাযার অবস্থিত। কামেল মুর্শিদের উপযুক্ত শাগরিদ বলে তিনি মুর্শিদের মাযারের পাশে সমাহিত হতে পারার গৌরব অর্জন করেছেন।[২৭২]

খাজা বুরহান উদ্দীন কাত্তাল (রহ.)

খাজা বুরহান উদ্দীন কাত্তাল (রহ.) আরব দেশের অধিবাসী। হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর সাথী হয়ে তিনি সিলেটে আগমন করেন। সিলেট শহরেই তিনি স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর পুত্র শাহ জালাল উদ্দীন ও নাতি কামাল উদ্দীন উভয়ই আল্লাহর ওলী ছিলেন। তাঁর বংশধরগণ বর্তমানে মুফতী বংশ বলে পরিচিত। কারণ, এ বংশের এক ব্যক্তি সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে তাঁর দরবারে মুফতী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তখন হতে তাঁর পরবর্তী পুরুষেরা নিজেদেরকে মুফতী বলে পরিচয় দিয়ে আসছেন। সিলেট শহরের দরগা মহল্লায় এখনো যারা নিজেদেরকে মুফতী বলে দাবি করেন, তারা খাজা বুরহান উদ্দীন কাত্তালের বংশধর।[২৭৩]

হযরত নূর উল্লাহ (রহ.)

হযরত নূর উল্লাহ (রহ.)-এর ডাক নাম ছিল শাহনুর। পরবর্তীকালে তিনি শাহচট নামে সমধিক পরিচিতি লাভ করেন। শাহচট নাম ধারণ করার ফলে তাঁর আসল নাম ঢাকা পড়ে যায়। হযরত শাহচট (রহ.) হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর সংস্পর্শে থেকে কামালিয়াতের সর্বোচ্চ মাকামে উন্নীত হন। কথিত আছে, এ শাহচটকে হযরত শাহজালাল (রহ.) মনারায়ের টিলাস্থিত দুর্গ প্রাসাদের নিকট আযান

২৭২.আলহাজ মাওলানা মোঃ শহীদুল ইসলাম, *হযরত শাহজালাল (রহ.) ও শাহ পরান (রহ.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২২
২৭৩.দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *সিলেটে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

দিতে বলেছিলেন। তাঁর সুললিত কণ্ঠের সুউচ্চ আওয়াজে মনারায়ের দুর্গ প্রাসাদ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। বন্দর বাজার মাড়োয়ারী পট্টির পূর্ব-দক্ষিণে তাঁর মাযার অবস্থিত।[২৭৪]

শাহ গাবরু (রহ.)

শাহ গাবরুর আসল নাম শেখ গরীব (রহ.)। তাঁর জন্মস্থান বেলুচিস্তান। হযরত শাহজালাল (রহ.) যখন দিল্লীতে হযরত নিযাম উদ্দীন আউলিয়ার বাসভবনে অবস্থান করছিলেন তখন তাঁর সাথে তিনি পরিচিত হন এবং হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শিষ্যত্ব গ্রহণ করার পর তিনি আর দিল্লীতে থাকেন নি। হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর সাথে সিলেটে চলে আসেন। সিলেটে আসার পর হযরত শাহজালাল (রহ.) তাঁকে সিলেট শহরের গামুরটেকি নামক স্থানে বসতি স্থাপন করার নির্দেশ দেন। হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর নির্দেশে তিনি সেখানেই বসতি স্থাপন করেন এবং সে এলাকার জনসাধারণকে ইসলামের শিক্ষা দিতে থাকেন। গাবুর টেকের পীর বলে পরবর্তীকালে তিনি শাহ গাবরু নামে পরিচিত হন। তাঁর মাযারের পাশে আরো পাঁচজন দরবেশের মাযার আছে বলে ঐ জায়গা এখন পাঁচ পীরের মাকাম বলে পরিচিত।[২৭৫]

হযরত চাশনী পীর (রহ.)

চাশনী পীরের প্রকৃত নাম জানা যায়নি। তবে তিনি হযরত চাশনী পীর নামেই খ্যাত। কর্মস্থল নির্ণয়ের জন্য হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর দীক্ষাগুরু সায়্যিদ আহমদ কবীর (রহ.) মাটির যে টুকরোটি তাঁকে দান করেছিলেন, যাত্রার শুরুতে তিনি তা এ চাশনী পীরের হাতেই অর্পণ করেছিলেন। সিলেট বিজয়ের পর যখন হযরত শাহজালাল (রহ.) আবার যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন তখন এ চাশনী পীর (রহ.) সিলেটের মাটি ও সাইয়্যিদ আহমদ কবীর (রহ.) কর্তৃক প্রদত্ত মাটি তাঁর জিহ্বা দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন।

পরীক্ষা ফলপ্রসূ হয়েছিল। হযরত চাশনী পীর পরীক্ষা করে দেখলেন যে, মুর্শিদ প্রদত্ত মাটি আর সিলেটের মাটির মাঝে কোন পার্থক্য নেই। তা তিনি হযরত শাহজালাল (রহ.)-কে অবহিত করলেন। মুর্শিদের মাটির সাথে সিলেটের মাটির মিল দেখে হযরত শাহজালাল (রহ.) সেখানেই স্থায়ীভাবে আস্তানা পেতেছিলেন। সিলেটের গোয়াই পাহাড়ের একটি টিলার উপর চাশনী পীরের মাযার অবস্থিত। হযরত চাশনী পীর সম্বন্ধে আরো বলা হয় যে, তিনি ছিলেন মৃত্তিকা বিজ্ঞানী। আর তাই তাঁর কাছে হযরত শাহজালাল (রহ.) মুর্শিদ প্রদত্ত মাটির টুকরোটি দিয়েছিলেন, যাতে তিনি যেখানেই যান সেখানের মাটি পরীক্ষা করে হযরত শাহজালাল (রহ.)-কে মাটির মিলের সংবাদ জানাতে পারেন।[২৭৬]

২৭৪.আলহাজ হযরত মাওলানা সিরাজুল ইসলাম, *হযরত শাহজালাল (রহ.) ও শাহ পরান (রহ.)-এর জীবনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

২৭৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

২৭৬.শামসুল আল, *হযরত শায়খ শাহজালাল (রহ.)* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন)।

হযরত মাখদুম রহিম উদ্দীন (রহ.)

হযরত মাখদুম রহিম উদ্দীন (রহ.) খুব কামেল দরবেশ ছিলেন। হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর শাগরিদ হয়ে তিনি সিলেটে আগমন করেন। হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা ও শিক্ষা- দীক্ষায় তিনি কামালিয়াতের সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হয়েছিলেন। হযরত শাহজালাল (রহ.) তাঁকে দ্বীন ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য জালালপুর নামক স্থানে আস্তানা গাঁড়তে নির্দেশ দিয়েছিলেন। পীরের নির্দেশ মত হযরত মাখদুম রহিম উদ্দীন (রহ.) সেখানে চলে যান এবং বসতি স্থাপন করে সেখানকার জনগণের কাছে দ্বীনের তালীম-তরবিয়তের কাজ চালাতে থাকেন। জালালপুরে তাঁর মাযার এখনো সে সাক্ষী প্রদান করছে। দরবেশ রহিম উদ্দীনের কারামত প্রসিদ্ধ ছিল। বর্ণিত আছে যে, হযরত মাখদুম রহিম উদ্দীন (রহ.) তাঁর হাতের লাঠিখানা জালালপুরের কোন এক স্থানে পুঁতে রেখেছিলেন এবং তিনি সেখানে একটুখানি বিশ্রাম নিয়েছিলেন। যার ফলে সেখানে একটি গাছের জন্ম হয়েছিল। এ গাছের পাতার রস সেবন করল বিভিন্ন কঠিন রোগও নিরাময় হয়ে যেত। তাঁর মাযারের খাদেমগণ এ গাছের পাতা বিভিন্ন স্থানে বিক্রয় করে পয়সা উর্পাজন করত।[২৭৭]

শাহ আলাউদ্দীন (রহ.)

হযরত শাহ আলাউদ্দীন (রহ.) খুব কামেল দরবেশ ছিলেন। মুর্শিদের নির্দেশে তিনি গহরপুর পরগনার আলাপুর নামক গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। সেখানকার জনগণের মাঝে দ্বীন-ইসলামের প্রচার ও প্রসার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বলা বাহুল্য, তাঁর নামানুসারেই উক্ত গ্রামের নাম আলাপুর রাখা হয়েছিল। তাঁর বংশধরদের মাঝে শাহ আলী নামক অপর এক দরবেশ আধ্যাত্মিক সাধনা ও কারামতে খুব সুনাম অর্জন করেছিলেন।[২৭৮]

শেখ সামসুদ্দীন বিহারী (রহ.)

হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর অন্যতম শিষ্য ছিলেন শেখ সামসুদ্দীন বিহারী (রহ.)। সুনা ইটা পরগনার অন্তর্গত আটগ্রামে তিনি বসতি স্থাপন করেন। আধ্যাত্মিক সাধনার উচ্চমার্গে অবস্থান করে তিনি খুব কামেল ওলী হিসেবে সুনাম অর্জন করেছিলেন।

উল্লেখ্য যে, তৎকালীন সময়ে আটগ্রামে প্রভাবশালী একটি বংশ বসবাস করত। দুর্বৃত্তপরায়ণতায় তারা খুব পারদর্শী ছিল। শেখ সামসুদ্দীন বিহারী (রহ.) তাদেরকে খুব করে বুঝাতেন। দুর্বৃত্তপরায়ণতা ত্যাগ করে ভালো হওয়ার জন্য বলতেন, কিন্তু তারা তাঁর কথায় কর্ণপাত করত না; বরং উল্টো তাঁর প্রতি মনে মনে দুশমনি পোষণ করতো। বলে রাখা প্রয়োজন যে, তিনি যখন নামাযে দাঁড়াতেন পার্থিব দুনিয়ার কোন খেয়াল তাঁর মধ্যে মোটেই থাকতো না। নামাযে দাঁড়ালে তিনি তাঁর দুনিয়াবী বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন। একদিন তিনি ঐভাবে পার্থিব বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে নামায আদায় করছিলেন। এমন সময় উপরোক্ত বংশের পাঁচ ভাই এসে তাঁকে বললেন না, দুর্বৃত্তরা তাঁকে বেঁধে রেখে

২৭৭.সৈয়দ মুর্তজা আলী, *হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

২৭৮.প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯-৪০

চলে এল। বাড়ি এসে দেখে তাদের এক ভাইয়ের একটি মেয়ে মারা গিয়েছে। রোগ নেই, ব্যাধি নেই হঠাৎ করে ভালো একটি মেয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল! এ ঘটনা তাদের মনে ভাবান্তরের সৃষ্টি করল। তারা ভাবতে লাগল হয়তো শেখ সাহেবের সাথে দুর্ব্যবহারেরর কারণে তাদের মেয়ে মারা গিয়ে থাকতে পারে। বোধোদয় হবার পর তারা পুনরায় শেখ সাহেবের বাড়িতে ফিরে এলো এবং তাঁর বন্ধন মুক্ত করে দিল। শেখ সামসুদ্দীন বিহারী (রহ.)-এর কাছে বিনীতভাবে ক্ষমা ভিক্ষা চাইল। শেখ সাহেব তৎক্ষণাৎ মেয়েটির জন্য দু'আ করলেন। মহান আল্লাহ তা'য়ালার কি অপূর্ব মহিমা! শেখ সাহেবের দু'আ করার সাথে সাথে মেয়েটি আবার জীবিত হয়ে উঠল।

উপরোক্ত অলৌকিক ঘটনার পর রাজানবাহা ও তার বংশীয় সকল জনসাধারণ শেখ সাহেবের কাছে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল এবং সে মেয়েটিকে তাঁর সাথে বিবাহ দিয়ে শেখ সাহেবের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করল। শেখ সাহেবের এক ছেলে ছিলেন, নাম ছিল জিয়া উদ্দীন। তিনি কামেল ওলি ছিলেন। শেখ সাহেবের মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর ছেলেকে ওসিয়ত করে যান যে, তুমি একটি দিঘী খনন করবে এবং সেই দিঘীর পাড়ে আমাকে দাফন করবে। পুত্র জিয়া উদ্দীন বাবার ওসীয়ত পালন করেছিলেন। সে দিঘীটি এখনও জিয়াউদ্দীন নামে পরিচিত। আর দিঘীর পাড়েই শেখ সামসুদ্দীন বিহারী (রহ.)-এর মাযার অবস্থিত।[২৭৯]

সাইয়্যিদ শাহ মোস্তফা (রহ.)

হযরত সাইয়্যিদ শাহ মোস্তফা (রহ.) ইসলামের চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা.)-এর বংশধর ছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষগণ পবিত্র মক্কা শরীফ হতে বাগদাদে হিজরত করে এসেছিলেন। বাগদাদেই তাঁর জন্ম এবং সেখানেই তিনি শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করেন। অতঃপর হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর আধ্যাত্মিক প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ও সহচর হিসেবে তাঁর সাথে ভারতবর্ষে আগমন করেন। সেখান থেকে সিলেটে আসেন। অতঃপর যখন তিনি কামালিয়াত হাসিল করলেন, তখন হযরত শাহজালাল (রহ.) তাঁকে ইসলাম ধর্ম প্রচারের নির্দেশ প্রদান করলেন। মুর্শিদের নির্দেশপ্রাপ্ত হয়ে হযরত সাইয়্যিদ শাহ মোস্তফা (রহ.) ধর্মপ্রচারে বের হন এবং অনেক জায়গা ভ্রমণ করে অবশেষে বর্তমান মৌলভীবাজার জেলার মোস্তফাপুরে তাশরীফ আনেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তাঁর নামানুসারেই জায়গাটির নাম মোস্তফাপুর হয়েছিল।

তৎসময়ে ত্রিপুরা রাজ্যের অধীনে বর্ষিজোড়ার পার্বত্য এলাকার চন্দ্রনারায়ণ নামে এক সামন্ত রাজা রাজত্ব করতেন। তিনি খুব দাম্ভিক ও উচ্চাভিলাষী ছিলেন। হযরত সাইয়্যিদ শাহ মোস্তফা (রহ.) যে স্থান থেকে ধর্ম প্রচারের কাজ শুরু করেছিলেন সে স্থানটি উক্ত রাজার শাসনাধীনে ছিল। কাজেই ধর্ম প্রচারের কাজ নির্বিঘ্নে সম্পাদন করার জন্য তিনি রাজার কাছে কিছু জমি চাইলেন। যাতে তিনি সেখানে তাঁর বসতিও স্থাপন করতে পারেন। কিন্তু হিন্দু রাজা তাঁকে জমি দিতে স্বীকৃত হলেন না। এরপর প্রায়

২৭৯. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *সিলেটে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০

অনেক দিন চলে গেল, হযরত সাইয়্যিদ শাহ মোস্তফা (রহ.) আপন মনে ইসলাম ধর্ম প্রচারেরর কাজে নিয়োজিত রইলেন।

এদিকে রাজা চন্দ্রনারায়ণের এক বিপদ দেখা দিল। বিপদটি মহাবিপদ। এতাদিন তিনি বেশ আরামেই রাজ্য শাসন করছিলেন। কোথাও কোন সমস্যার উদ্ভব হয়নি; কিন্তু হঠাৎ কোথা হতে একটি বাঘ এসে রাজ্যের ভিতর উপদ্রব আরম্ভ করল। প্রায় প্রতিদিনই একজন না একজন বাঘের আক্রমণের শিকার হতে লাগল। বাঘ যে কখন কার ঘরে এসে আক্রমণ চালায় তার কোন নিশ্চয়তা নেই। এলাকার সকল মানুষ বাঘের ভয়ে জড়োসড়ো। রাজ্যের জনসাধারণ প্রতিদিন রাজার দরবারে হাজির হয়ে তাদের আতংকের কথা জানাতে লাগল। রাজা চন্দ্রনারায়ণ মহা দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। কীভাবে বাঘটিকে হত্যা করা যায় তা নিয়ে তিনি রীতিমত হিমশিম খেতে লাগলেন। রাজা যখন বাঘ তাড়ানো নিয়ে ব্যস্ত তখন তার আরেক মসিবত দেখা দিল। একটি মারাত্মক বিষধর সাপ তার সিংহাসনের উপর ফনা উঁচু করে এমনভাবে বসে রইল যে, এ সাপটি তাড়ানোর সাহস কারোই রইল না।

কি মারাত্মক কথা! সিংহাসনের উপর সাপ! এমন ঘটানা কেউ কি কখনও শুনেছে? হঠাৎ রাজার মনে পড়ে গেল, কিছুদিন আগে এক মুসলমান দরবেশ তার কাছে কিছু জমি চেয়েছিলেন; কিন্তু তিনি তা দিতে অস্বীকার করেছিলেন। রাজার মনে হলো হয়তো বা এগুলো সব ঐ দরবেশের কারামতি হবে। জামি না দেওয়ার কারণে হয়তো তিনি ক্ষুদ্ধ হয়ে এ বাঘ সাপ প্রেরণ করেছেন।

নিরূপায় রাজা চন্দ্রনারায়ণ তখন উপায়ন্তর না দেখে একান্ত বাধ্যগতভাবে দরবেশের শরণাপন্ন হলেন। তিনি নিজে দরবেশের আস্তনায় উপস্থিত হয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করার জন্য অনুরোধ করলেন।

হযরত সাইয়্যিদ শাহ মোস্তফা (রহ.) তখন বাঘটিকে ডেকে এনে তার পিঠে সওয়ার হলেন ও সাপটিকে চাবুকরূপে ব্যবহার করে রাজার দরবারে হাজির হলেন। তাঁর এ অলৌকিক কর্মকাণ্ডে রাজা চন্দ্রনারায়ণের বিস্ময়ের অন্ত রইল না। তিনি হযরত সাইয়্যিদ শাহ মোস্তফা (রহ.)-কে তার রাজবাড়ী ছেড়ে দিলেন। শুধু তাই নয়, তার একমাত্র রাজকন্যাকে দরবেশের সাথে বিবাহ দিয়ে তাঁর সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করলেন। বিবাহের আগে দরবেশ তাঁকে মুসলমান বানিয়ে সালমা খাতুন নাম রেখেছিলেন। এরপর রাজা আরেকটি রাজবাড়ী নির্মাণ করে সেখানে বসবাস করেছিলেন। আজীবন তিনি হযরত সাইয়্যিদ শাহ মোস্তফা (রহ.)-এর ভক্ত ছিলেন। তবে তিনি মুসলমান হয়েছিলেন কিনা তা সবিশেষ জানা যায় না।

সুদীর্ঘকাল হযরত সাইয়্যিদ শাহ মোস্তফা (রহ.) মৌলভীবাজারের মোস্তফাপুরে ইসলামের খেদমত করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আজো সেখানে তাঁর মাযার কালের সাক্ষী হিসেবে তাঁর সুমহান স্মৃতি বহন করছে।[২৮০]

২৮০.আলহাজ মাওলানা মোঃ শহীদুল ইসলাম, *হযরত শাহজালাল (রহ.) ও হযরত শাহ পরান (রহ.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪-২৪৫

হযরত শাহপীর (রহ.)

হযরত শাহপীর (রহ.)-এর প্রকৃত নাম হলো সাইয়্যিদ আহমদ গেছুদারাজ (রহ.)। তিনি হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর বোনের ছেলে ছিলেন। ইনিও সাধনা করে কামালিয়াতের সর্বোচ্চস্তরে উন্নীত হয়েছিলেন। তিনি তরফ অভিযানে যোগদান করে শাহদাত বরণ করেছিলেন।

হযরত শাহজালাল (রহ.) তাঁকে ভীষণ আদর করতেন। আপন ভাগিনা বলে নয়, আধ্যাত্মিক সাধনায় তাঁর অনুরাগ, ইসলামের অনুশাসন ও রীতি-নীতিতে তার প্রেরণা ও তাবলীগে দ্বীন সম্পর্কে তাঁর উচ্চ ধারণার কথা অবগত হতে পেরেই তার প্রতি হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর অনুরাগ বেশি ছিল। উপযুক্ত মামার যোগ্য ভাগিনেয় ছিলেন তিনি। সদা হাস্যময়ী এ লোকটির মুখাবয়র দেখে মনে হতো যেন তাঁর চেহারা থেকে আলোর ছটা বিচ্ছুরিত হচ্ছে। যেমন সুন্দর কান্তি, তেমনি সরল মধুর প্রাণ। অথচ জিহাদের আহ্বানে তিনি ছিলেন পাগলপারা। সেখানে ছিলেন তিনি অমিত তেজি সিংহ বীর। সাধনা জগতে তাঁর স্থান ছিল খুবই উপরে। তিনি সুলতানুল আযকার অর্জন করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, শাহদাত বরণ করার পর তাঁর কর্তিত পবত্রি মস্তক নদী পথে তরফ হতে খড়মপুর পর্যন্ত ভেসে এসেছিল। চৈতন দাস নামক এক জেলে ও তার অন্যান্য সাথীরা মাছধরার জন্য নদীতে জাল পেতে রেখেছিল। মস্তকটি তাদের জালে আটকা পড়ে। তাজা ছিন্ন মস্তক দেখে চৈতন্য দাস তা উঠিয়ে নেয়; কিন্তু কি আশ্চর্য! ছিন্ন মস্তক হতে তখনও আল্লাহ তা'য়ালার যিকিরের আওয়াজ বের হচ্ছিল। যিকিরেরর আওয়াজ পরিষ্কার শুনা যাচ্ছিল। চৈতন্য দাস ও তার সাথীদের বুঝতে বাকী ছিল না যে, তিনি উঁচু মাপের একজন মুসলিম দরবেশ ছিলেন। তারা সযত্নে মস্তকটিকে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর দরবারে হাজির করল এবং অত্যাশ্চর্য ঘটনায় মুগ্ধ হয়ে তারা হযরতের নিকট পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল। তাদের দেখাদেখি অন্যান্য জেলেরাও কালেমা পাঠ করে মুসলমান হয়েছিল। হযরত শাহজালাল (রহ.) তাঁর মস্তকবিহীন দেহ লুতের মাযার নামক স্থানে দাফন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ছিন্ন মস্তক দাফন করা হয় তিতাস নদীর তীরে। কারণ, শাহদাতবরণ করার পূর্বে হযরত শাহজালাল (রহ.) তাঁকে ধর্ম প্রচারেরর জন্য ত্রিপুরা রাজ্যে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ কলেছিলেন। হযরত শাহপীর (রহ.) কল্লা শহীদ নামেও পরিচিত। হযরত শাহপীর (রহ.)-এর মাযার সংলগ্ন একটি মসজিদ ও মুসাফিরখানা আছে। দূর-দূরান্ত হতে ভক্ত অনুরক্তের দল তাঁর মাযার যিয়ারত করার জন্য আসে এবং মুসাফিরখানায় আশ্রয় গ্রহণ করে। যিয়ারত শেষে আবার তারা নিজ নিজ গন্তব্য পথে পা বাড়ায়।[২৮১]

শাহ বদর (রহ.)

হযরত বদর শাহ (রহ.)-এর প্রকৃত নাম সাইয়্যিদ বদর উদ্দীন (রহ.)। তবে শাহ বদর বা বদর শাহ (রহ.) বলেই তিনি অধিক পরিচিত। হযরত সাইয়্যিদ নাসির উদ্দীনের সাথে যে বারোজন দরবেশ তরফ বিজয় করার জন্য অভিযান চালিয়েছিলেন, শাহ বদর তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তরফ

২৮১.সৈয়দ মুর্তজা আলী, *হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

বিজয়ের পর মুর্শিদের হুকুম নিয়ে তিনি বদরপুর নামক স্থানে বসতি স্থাপন করেন এবং বদরপুরেই পবিত্র ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসার কাজে আজীবন নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। হযরত বদর শাহ (রহ.) তাঁর জীবদ্দশায় অনেক বিপথগামী মানুষকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিতে সহায়তা করেন। হযরত বদর শাহ (রহ.) আধ্যাত্মিক শক্তি ও অলৌকিকত্বে খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। ঐ সময় বদরপুরের কাছে বরাক নদীতে খুব জোয়ার ছিল। যার ফলে উক্ত নদীতে নৌকা চলাচল করা খুবই বিপজ্জনক ছিল। বহু নৌকা নদীর জোয়ারে ডুবে গিয়েছিল। মাঝিদের মধ্যে যার ভাগ্য ভালো হতো সে কোন রকমে বেঁচে যেত, তখন সর্বপ্রথম তীরে উঠে হযরত বদর শাহ (রহ.)-এর নামে শিরনী বিতরণ করে যেত। চট্টগ্রামে শাহ বদর নামে যে দরবেশের খ্যাতি শুনতে পাওয়া যায় সম্ভবত ইনিই সে শাহ বদর পীর (রহ.)। ইসলাম প্রচার কাজে একবার তনি চট্টগ্রামে গিয়েছিলেন। তবে সেখানে তিনি স্থায়ীভাবে আস্তানা গাঁড়েননি। বদরপুরে রেল স্টেশনের নিকটে তাঁর মাযার অবস্থিত। অনেক অনেক যুগ চলে যাওয়ার পরও আজ পর্যন্ত বহু লোক দূরদূরান্ত থেকে তাঁর মাযার যিয়ারত করার জন্য আসে। ভক্তিভরে মাযার যিয়ারত করে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ে। সাধারণ লোকের ধারণা, মহান আল্লাহ তা'য়ালার নামে কোন কিছু মানত করে হযরত বদর শাহ (রহ.)-এ মাযারে দান খয়রাত করলে যথাশীঘ্র মকসুদ পূর্ণ হয়।[২৮২]

শাহ হেলিমুদ্দীন (রহ.)

হযরত শাহ হেলিমুদ্দীন (রহ.) বিখ্যাত কামেল বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর জন্মস্থান সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মাঝে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। তিনি ইয়ামানে জন্মলাভ করেন, কারো মতে তিনি মধ্যপ্রদেশের অধিবাসী। তিনি হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর সহচর রূপে সিলেটে আগমন করেছিলেন। হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর সন্নিধ্যে থেকে তিনি যখন কামালিয়াতের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেন, তখন মুর্শিদের নির্দেশে তিনি ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য ত্রিপুরা রাজ্যে গমন করেন।

ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত কৈলা শহরের সামন্ত রাজা ছিলেন আসলাম রায় নামক জনৈক হিন্দু লোক। তিনি একদিন বাঘ শিকার করতে গিয়ে জাল ফেলে অপেক্ষা করছিলেন। এমন সময় শাহ হেলিমুদ্দীন (রহ.) সেখানে উপস্থিত হলেন। রাজার সাথে তাঁর কথাবার্তা হলো। তার আসার উদ্দেশ্য তিনি অবগত হলেন। শাহ হেলিমুদ্দীন (রহ.) গভীর অরণ্যে চলে গেলেন। তাঁর হাতে কোন হাতিয়ার ছিল না। খালি হাতেই তিনি একটি বাঘ ধরে এনে সামন্ত রাজার সামনে দিলেন ও পরে আবার বাঘটিকে ছেড়ে দিলেন। এহেন অবস্থা দেখে সামন্ত রাজা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। মানুষও কি এমন ঘটনা ঘটাতে পারে? মানুষ খেকো বাঘকে হাতিয়ার বিহীন খালি হাতে ধরে আনা কি সোজা কথা! আসলে ইনি মানুষ না অন্য কিছু! রাজা এ দরবেশকে তার এলাকায় থাকার জন্য কিছু জমি দিতে চাইলেন। দরবেশ বললেন, আপনার তীরসমূহের মধ্যে একটি তীর বের করে নিক্ষেপ করলে তীরটি যতদূর গিয়ে পৌঁছে ততটুকু জমি যদি আমাকে দিতে চান তাহলে আমি আপনার কথায় রাজি হতে

২৮২. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *সিলেটে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

পারি। রাজা আসলাম রায় তাতেই রাজি হয়ে গেলেন। এরপর দরবেশ নিজেই তীর নিক্ষেপ করলেন। তীরটি অনেক দূরে গিয়ে একটি গাছের মধ্যে বিদ্ধ হলো। যে গ্রামে তীর বিদ্ধ গাছটি ছিল সে গ্রামের নাম ছিল তীরপাশা। সামন্ত রাজা আসলাম রায় তার বেরী হতে তীরপাশা পর্যন্ত সবটুকু জায়গা দরবেশকে দান করলেন।

তারপর শাহ হেলিমুদ্দীন (রহ.) মনু নদীর পশ্চিম পাড়ে আস্তানা গেঁড়ে সেখানেই সাধনায় নিমগ্ন হন। তাঁর ছেলে শাহ মালিকও পিতার সাহচর্যে থেকে আধ্যাত্মিক সাধনায় প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। পিতা ও পুত্রের প্রচেষ্টায় ঐ এলাকার বহুলোক কুসংস্কার পরিত্যাগ করে ইসলামের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।[২৮৩]

উল্লেখ্য যে, একদিন রাজা আসলাম রায় স্বপ্নে দেখলেন, তার ঘরের একটি বাতি বের হয়ে শাহ হেলিমুদ্দীনের হুজরায় গিয়ে প্রবেশ করেছে এবং তিনি নিজেও সেখানে গিয়ে উঠেছেন। স্বপ্ন দেখে কুসংস্কারী রাজার মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হলো। তিনি মনে করলেন যে, তার সুখের দিন সমাপ্ত প্রায়। এবার দুঃখ- কাষ্টের পালা। রাজ্য রাজত্ব সবকিছুই হারাবেন তিনি। কাজেই সময় থাকতে ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তিনি দরবেশের আস্তানায় গেলেন ও স্বপ্ন বৃত্তান্ত খুলে বললেন, আর বললেন, আমার মনে হয় এ জায়গা হতে আমার শান্তি চলে গেছে। পরবর্তীকালে আমার বংশধররাও যে এখানে অবস্থান করতে পারবে সে আশাও ক্ষীণ। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আপনার হাতেই আমি আমার রাজ্য ও রাজত্ব ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চলে যাব। এখন দয়া করে আপনি সম্মতি প্রদান করলেই হয়।

শাহ হেলিমুদ্দীন (রহ.)-এর রাজ্যলোভ কোনদিনই ছিল না, থাকার কথাও নয়। কেননা খাস আল্লাহ প্রেমিকগণ কখনও অর্থ-বিত্তের দিকে মন ঝুকান না। কারণ, দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী, আখেরাত চিরস্থায়ী। কিন্তু মহান আল্লাহর কুদরত বুঝে সাধ্য কার? আসলাম রায়ের স্বপ্নে দেখা ঘরের বাতি যে তাঁর ঘরে প্রবেশ করছে তা তিনি নিজেও ধ্যান যোগে দেখেছিলেন। তাঁর কাছে তা মহান আল্লাহ তা'য়ালার ইচ্ছা বলেই মনে হলো। তিনি সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। অতঃপর রাজা আসলাম রায় দরবেশের হাতে রাজ্য ও রাজত্ব সবকিছু পরিত্যাগ করে দেশ ত্যাগ করলেন।

আসলাম রায় চলে গেলেও তার সহধর্মিণী কনকরানী স্থানের মায়া ছাড়তে পারলেন না। রানী সেখানেই থেকে গেলেন। দরবেশ তার বসবাসের জন্য নির্দিষ্ট একটি জায়গা করে দিলেন ও তার অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিলেন। কনকরানী যে বাড়িতে থাকতেন তা এখন কনকীর বাড়ি বা কানী বাড়ি নামে পরিচিত। রানীর একটি মেয়ে ছিল। সে দরবেশের কাছে মুসলমান হয়ে যায়। দরবেশ তাকে নিজের ছেলের বউ হিসেবে বাড়িতে নিয়ে আসেন। মনু নদীর পশ্চিম তীরে শাহ হেলিমুদ্দীন (রহ.)-এর মাযার ছিল। কিন্তু নদী ভাঙ্গনের ফলে তা এখন আর নেই। নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।[২৮৪]

২৮৩.সৈয়দ মুর্তজা আলী, *হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

২৮৪.ড. গোলাম সাকলায়েন, *পূর্ব পাকিস্তানের সূফী সাধক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

ফতেহ গাযী (রহ.)

ফতেহ গাযী (রহ.) হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর অন্যতম সহচর ছিলেন। তিনি আপন মুর্শিদের অনুমতি নিয়ে সাইয়্যিদ নাসিরুদ্দীন সিপাহসালার (রহ.)-এর সাথে তরফ বিজয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বহু বছর যাবৎ আধ্যাত্মিক সাধনা ও ইসলাম প্রচারের কাজে নিয়োজিত থেকে তিনি মুসলিম জগতের প্রভূত ক্যলাণ সাধন করেন। তাঁর মাযার সিলেটের শাহজি বাজার রেল-স্টেশনের পাশে একটি মনোরম আট্টালিকার ভিতরে অবস্থিত। মাযারের নিকটে একটি মসজিদ আছে। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ এখানে পীর ফতেহ গাযী (রহ.)-এর মাযার যিয়ারত করতে আসে এবং মসজিদে নামায আদায় করে মহান আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করে। মোগল আমলে এ মাযারের ব্যয়ভার বহন করার জন্য জায়গীরের ব্যবস্থা ছিল।

ফতেহ গাযী (রহ.) রঘুনন্দন নামক পাহাড়ের যে স্থানে বসে চিল্লা করতেন সে জায়গা এখন ফতেহপুর বলে সমধিক পরিচিত। আজোবধি সেখানে তাঁর চিল্লাখানা দেখতে পাওয়া যায়। তিনি খুবই কামেল ওলী ছিলেন, তাই সাধারণ জনতা, আমীর-ওমারা, হাজী-গাযী সবাই তার মাযার যিয়ারত করে আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন ও আত্মতৃপ্তি লাভ করে।[২৮৫]

শাহ শরীফ (রহ.)

হযরত শাহ শরীফ (রহ.)ও হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর সাথী ছিলেন। তিনি স্বীয় মুর্শিদ হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর নির্দেশে পিল্লাকান্দি নামক স্থানে গিয়ে আধ্যাত্মিক সাধনায় লিপ্ত হন ও সেখানে পবিত্র ইসলাম ধর্মের প্রচার-প্রসার কাজে নিয়োজিত থাকেন। তাঁর প্রচেষ্টায় অনেক অমুসলিম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হয়। পিল্লাকান্দি ও এর আশেপাশের লোকজন এখনও ভক্তিসহকারে তাঁর নাম উচ্চারণ করে থাকে। পিল্লাকান্দিতেই তাঁর মাযার অবস্থিত। কিন্তু কুশিয়ারা নদীর ভাঙ্গনের কারণে তাঁর মাযার নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। তাই ভক্ত-অনুরক্তরা তার মূল কবরের মাটি সংগ্রহ করে নদীর তীরবর্তী আরেক জায়গায় তাঁর মাযার স্থাপন করে যিয়ারত করে থাকে।[২৮৬]

সাইয়্যিদ রুকনুদ্দীন (রহ.)

সাইয়্যিদ রুকনুদ্দীন (রহ.) হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাঁর সহচররূপে সিলেটে আগমন করেন। কামালিয়াত অর্জন করার পর স্বীয় মুর্শিদ হযরত শাহজালাল (রহ.) তাঁকে ইসলাম ধর্ম প্রচারের নির্দেশ প্রদান করে, সে অনুযায়ী তিনি সফরে বের হন এবং বহু লোককে ইসলামের আলোকে আলোকিত করে সর্বশেষে কদমহাটা নামক স্থানে উপস্থিত হন। কদমহাটার আগের নাম 'কদমআটকা'। কদম আরবী শব্দ, এর অর্থ হচ্ছে পা। কথিত আছে, সাইয়্যিদ রুকনুদ্দীন (রহ.) এখানে উপস্থিত হলে তাঁর পা আটকে যায় এবং তিনি এখানেই তাঁর সফর শেষ করেন বলে এ স্থানের নাম 'কদম হাটা' রাখা হয়। এ কদমহাটাই তাঁর সর্বশেষ কর্মক্ষেত্র। এরপর আর তিনি অন্য

২৮৫.দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *সিলেটে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

২৮৬.সৈয়দ মুর্তজা আলী, *হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

কোথাও গমন করেননি। কদমহাটায় তিনি একটি ঈদগাহ নির্মাণ করেছিলেন। তিনি নিজে প্রতিবছর ঈদের নামাযে এ ঈদগাহে ইমামতি করতেন বলে বহু লোকের সমাবেশ সেখানে হতো। ঈদগাহের সাথেই তাঁর পবিত্র মাযার অবস্থিত।[২৮৭]

শাহকালা মুজাররদ (রহ.)

হযরত শাহকালা মুজাররদ (রহ.) ছিলেন ইয়ামানের অধিবাসী। তিনি জীবনে বিবাহ করেননি বলে তাঁকে মুজাররদ বলা হয়। আমরা সাধারণত জানি যে, হযরত শাহজালাল (রহ.) ছিলেন মুজাররদ; কিন্তু ইতিহাস আমাদেরকে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর সহচর শাহকালাও (রহ.) যে মুজাররদ ছিলেন সে সংবাদ অবগত করায়। হযরত শাহকালা (রহ.)-এর ঘর-সংসার বলতে কিছুই ছিল না। তিনি তাঁর পীর-মুর্শিদ হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর নির্দেশে ইসলাম প্রচারের কেন্দ্র হিসেবে ভাদার দেউল নামক স্থানে আস্তানা স্থাপন করেন এবং জীবনের শেষকাল পর্যন্ত সেখানে তাবলীগে দ্বীনের কাজ সম্পাদন করে যান। তিনি সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ভাদার দেউলে তাঁর মাযার অবস্থিত।[২৮৮]

শাহ জিয়া উদ্দীন (রহ.)

হযরত শাহ জিয়া উদ্দীন (রহ.) ছিলেন ইয়ামানের অধিবাসী। তিনি হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর সাথে সিলেটে গমন করেন। হযরত শাহজালাল (রহ.) তাঁকে ইসলাম প্রচারেরর জন্য দেওরাইল পরগণার অন্তর্গত বোন্দাশীল গ্রামে প্রেরণ করেন। তৎকালে বোন্দাশীল গ্রামের লোকগুলো যেমন কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল তেমনি ছিল দুর্দান্ত প্রকৃতির। শাহ জিয়া উদ্দীন (রহ.) তাদেরকে আপনজনের মতো মিষ্টি মধুর ভাষায় সৎপথে আনতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে সেখানের অনেক হিন্দু মুসলমান হয়। হযরত শাহ জিয়া উদ্দীন (রহ.) তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দ্বীনের দাওয়াতী কাজে লিপ্ত ছিলেন।

উল্লেখ্য যে, একবার দেওরাইল নামক এক দৈত্য বোন্দাশীল গ্রামে খুব উৎপাত আরম্ভ করে দেয়। উৎপীড়িত জনগণ হযরত শাহ জিয়া উদ্দীন (রহ.)-এর কাছে এর অভিযোগ পেশ করলেন। জিয়া উদ্দীন (রহ.) তাঁর পীর ও মুর্শিদ হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর কাছে হাজির হন এবং সকল ঘটনা আদ্যোপান্ত তাঁকে খুলে বলেন। তিনি এ ব্যাপারে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর কাছে সাহায্য কামনা করেন। তা শুনে হযরত শাহজালাল (রহ.) নিজেই সেখানে উপস্থিত হন। হযরত শাহজালাল (রহ.)-কে দেখা মাত্রই দৈত্যের হৃদকম্পন শুরু হয়ে যায়। সাথে সাথে সে তার জীবন নিয়ে পলায়ন করে। বোন্দাশীলেই হযরত শাহ জিয়া উদ্দীন (রহ.)-এর মাযার ছিল, কিন্তু নদী ভাঙ্গনের কারণে তা পানির মধ্যে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়।[২৮৯]

২৮৭.দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, *হযরত শাহজালাল (র)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৭

২৮৮.সৈয়দ মুর্তজা আলী, *হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

২৮৯.প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

হামিদ ফারুকী (রহ.)

হযরত হামিদ ফারুকী (রহ.)ও হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর সাথী ছিলেন। ইসলাম প্রচার করার জন্য সর্বপ্রথম তিনি যে স্থানে আস্তানা স্থাপন করেন সে জায়গার নাম মউরাপুর। সেখানে তিনি সপরিবারে বাস করতেন। এরপর তিনি সেখান থেকে কাউকাপন চলে যান এবং সেখানকার কুসংস্কারগ্রস্ত লোকদেরকে আলোর পথে আসার জন্য অনুরোধ করেন। তাদের মাঝে ইসলামী আদর্শের বাণী প্রচার করেন। হামিদ ফারুকী (রহ.)-এর দাদাপীর হযরত সাইয়্যিদ আহমদও তাঁকে এক মুষ্টি মাটি দিয়েছিলেন। তাই তিনি যেখানেই যেতেন দাদাপীর কর্তৃক মাটির সাথে সেখানকার মাটি মিলিয়ে দেখতেন। তা তাঁর অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। দরবেশ হামিদ ফারুকী কাউকাপনে গিয়ে দেখলেন, দাদাপীর প্রদত্ত মাটির সাথে কাউকাপনের মাটির যথেষ্ট মিল রয়েছে। আর সেজন্য তিনি স্থির করলেন যে, মউরাপুর ত্যাগ করে কাউকাপনে বসতি স্থাপন করবেন। আমরা জানি না এর মধ্যে কি রহস্য লুকায়িত ছিল। দরবেশ হামিদ ফারুকী (রহ.) সত্যি সত্যিই একদিন সপরিবারে কাউকাপন চলে আসেন এবং সেখানে স্থায়ীভাবে আস্তানা পাতেন। কাউকাপনে তাঁর মাযার অবস্থিত। তিনি যে বাড়িতে থাকতেন সে বাড়িটি খন্দকার বাড়ি নামে পরিচিত।[২৯০]

পীর গোরাচাঁদ (রহ.)

পীর গোরাচাঁদের আসল নাম ছিল সাইয়্যিদ আব্বাস। পরবর্তীকালে তিনি পীর গোরাচাঁদ নামেই খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি আধ্যাত্মিক সাধনায় খুব উচ্চপর্যায়ে লোক ছিলেন। তাঁর মুর্শিদ হযরত শাহজালাল (রহ.) তাঁকে ইসলাম প্রচারের জন্য বাংলাদেশের সুন্দরবন এলাকায় প্রেরণ করেন। তখন সেখানকার লোকগুলো ছিল ভীষণ দুর্দান্ত। পীর গোরাচাঁদ তাদের মাঝে ইসলামের শান্তির বাণী প্রচার করতে লাগলেন। সুতরাং একদিন গভীর রাতে কতিপয় দুর্বৃত্ত লোক একত্রিত হয়ে অতর্কিতে আক্রমণ করে তাঁকে শহীদ করল। চব্বিশ পরগণা জেলার বশিরহাট মহকুমার হাড়োয়া গ্রামে তাঁর মাযার অবস্থিত। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ পীর গোরাচাঁদের খাদেমের বংশধর।[২৯১]

শাহ কামাল ও শাহ জামাল (রহ.)

হযরত শাহ কামাল ও হযরত শাহ জামাল (রহ.) হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর বিশিষ্ট শাগরিদ ছিলেন। তাঁরা কামিল ওলী ছিলেন। হযরত শাহজালাল (রহ.) তাঁদেরকে ইসলাম প্রচার করার জন্য নির্দিষ্ট কোন স্থান নির্দেশ করে দেননি। হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর নির্দেশক্রমে তাঁরা যখন ইসলাম ধর্ম প্রচার করার জন্য কোথাও যাওয়ার মনস্থ করছিলেন তখন মুর্শিদের কাছ হতে দোয়া নেয়ার জন্য তাঁর কাছে এলে তিনি তাঁদের বললেন, তোমাদের এ বাহন উটই তোমাদের প্রচার কেন্দ্র নির্দিষ্ট করে দিবে। তোমাদের বাহন উট যেখানে গিয়ে থামবে সে জায়গায়ই হবে তোমাদের ইসলাম প্রচারের মূল কেন্দ্রস্থল। যাও! মহান আল্লাহর নামে বের হয়ে যাও। তিনিই তোমাদের উত্তম পথপ্রদর্শক।

---

২৯০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

২৯১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর দোয়া নিয়ে হযরত শাহ কামাল ও হযরত শাহ জামাল (রহ.) তাঁদের সফর শুরু করলেন। কুমিল্লা হতে সাত আট মাইল দূরে একটি নির্দিষ্ট স্থানে যাওয়ার পর হঠাৎ তাদের বাহনটি দাঁড়িয়ে পড়ল। কোনভাবেই আর তাকে সামনে অগ্রসর করা গেল না। হযরত শাহ কামাল ও হযরত শাহ জামাল (রহ.) উপলব্ধি করলেন যে, এটিই তাদের ইসলাম প্রচার করার জায়গা।[২৯২] এখানেই তাঁদেরকে বসতি স্থাপন করে কাজে নেমে পড়তে হবে। তারা উভয়য়ে পরামর্শ করে সেখানেই বাহন হতে অবতরণ করলেন। তারপর একটি ভালো জায়গা দেখে নিজেদের হুজরা নির্মাণ করলেন। শাহ ভ্রাতৃদ্বয়ের উট দাঁড়িয়ে পড়েছিল বলে পরবর্তীকালে সে গ্রামের নামকরণ করা হয় 'উটখাড়া' গ্রাম। এখানেই তাদের মাযার অবস্থিত।

পীর জালালুদ্দীন (রহ.)

হযরত পীর জালালুদ্দীন (রহ.) শাহ জালাল নামেও পরিচিত ছিলেন। আধ্যাত্মিক সাধনায় পরিপক্কতা হাসিলের পর হযরত শাহজালাল (রহ.) তাঁকে করুয়া পরগণার খুশকীপুর মৌজায় ইসলাম প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন। কথিত আছে যে, খুশকীপুরে এক ঠাকুর বাস করত। তার খুব সুন্দরী একটি মেয়ে ছিল। কিন্তু মিয়েটি ছিল খুবই অসুস্থ। হযরত পীর জালালুদ্দীন (রহ.) খুশকীপুরে আসার পর ঠাকুর তাঁর কামালিয়াতে মুগ্ধ হয়ে একদিন তাঁর দরবারে হাজির হয়ে পীর সাহেবকে তার মেয়ের ব্যাপারে সব ঘটনা খুলে বললেন। হযরত পীর জালালুদ্দীন (রহ.) মেয়েটির আরোগ্য কামনা করে মহান আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে মুনাজাত করলেন। খোদার কুদরত বুঝার সাধ্য কার! এর পর পরই মেয়েটি সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যায়। তারপর কোন অসুবিধা থাকেনি। ঠাকুর তার দীর্ঘদিনের অসুস্থ মেয়েটিকে সম্পূর্ণ সুস্থাবস্থায় দেখে সপরিবারে পীর সাহেবের দরবারে হাজির হয়ে মুসলমান হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, সে পীর জালালুদ্দীন (রহ.)-এর সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করে। পীর জালালুদ্দীন (রহ.)-এর মাযার এই খুশকীপুরেই অবস্থিত। সেখানকার অনেক লোক নিজেকে হযরত পীর জালালুদ্দীন (রহ.)-এর বংশধর বলে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করে।[২৯৩]

খতীব দাওর বখশ (রহ.)

হযরত খতীব দাওর বখশ (রহ.)আতুয়াজান পরগণার দাওয়াই নামক গ্রামে বসবাস করতেন। আ্যধাত্মিক সাধনায় যেমন তিনি কামালিয়াত হাসিল করেছিলেন, বক্তৃতায়ও তাঁর তেমন দক্ষতা ছিল। আর সেজন্যই তাঁকে খতীব উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল। কথিত আছে যে, একদা তিনি সমবেত জনতাকে ইসলামের মর্মকথা বুঝাচ্ছিলেন। তাঁর মর্মস্পর্শী ভাষণ শ্রবণ করে এক হিন্দু মহিলা সাথে সাথে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং তাঁর কাছে বিয়ের প্রস্তাব পেশ করে। দরবেশ দাওর বখশ তার প্রস্তাব এড়িয়ে যাননি। তিনি সে মহিলাকে বিবাহ করেছিলেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তার সাথেই দাম্পত্যজীবন যাপন করেছিলেন। যে মৌজায় তিনি বাস করতেন সে মৌজা তার নামানুসারে দাওরাই

---

২৯২. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *সিলেটে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

২৯৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭

মৌজা নামে অভিহিত। এ দাওরাই মৌজার একটি টিলার উপর হযরত খতীব দাওর বখশ (রহ.)-এর মাযার অবস্থিত। মাযারের পাশে একটি ঈদগাহ আছে। এই ঈদগাহটি হযরত খতীব দাওর বখশ (রহ.) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রতিবছর ঈদের নামাযে তিনিই ইমামতি করতেন।[২৯৪]

কুতুবুল আওলিয়া (রহ.)

তাঁর প্রকৃত নাম ছিল হযরত শাহ ইলিয়াছ কুদ্দুস (রহ.)। তরফ বিজেতা সাইয়্যিদ নাসিরুদ্দীন (রহ.)-এর বংশে ঘরগাও নামক গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর সরাসরি শাগরিদ ছিলেন না। তবে পরোক্ষভাবে তিনি হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর শাগরিদ ছিলেন। হযরত শাহজালাল (রহ.) তাঁর শিষ্যবৃন্দের মাঝে আধ্যাত্মিকতার যে আলোকরশ্মি প্রদীপ্ত করে দিয়েছিলেন, যুগের পর যুগ তা তাদের মাঝে বিদ্যমান ছিল। সময়ের স্রোত বা কালের প্রভাব তা বিলীন করতে পারেনি। সে আলোকরশ্মিই প্রবেশ করেছিল শাহ ইলিয়াছ (রহ.)-এর হৃদয়ে।

প্রথমত, বংশীয় রক্তধারা। হযরত কুতুবুল আওলিয়া সাইয়্যিদ বংশের লোক ছিলেন। আর সাইয়্যিদ বংশের লোকজন স্বভাবগতভাবেই অধিক ধর্মপরায়ণ ছিলেন। তদুপরি হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর হাতে গড়া শাগরিদ সাইয়্যিদ নাসিরুদ্দীন (রহ.)-এর বংশানুক্রমিক যে রক্তধারা তিনি পেয়েছিলেন তা স্বভাবতই তার হৃদয়ে ধর্মীয় অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে রেখেছিল। তবে এতদিন তা লুকানো ছিল। হঠাৎ একটি ঘটনায় সে সুপ্ত আগ্নেয়গীরির বিস্ফোরণ ঘটল।

শাহ ইলিয়াছ (রহ.)-এর পরিবারে একটি বাঁদী ছিল। একদিন কি এক কথা প্রসঙ্গে তাঁর মুখ হতে বের হয়ে পড়ল– 'দিন তো চলে গেল' শাহ ইলিয়াছ নিকটেই ছিলেন। উক্ত কথাটি তাঁর হৃদয় রাজ্যে তোলপাড় শুরু করল। দেহ-মনে কম্পন শুরু হলো। সত্যিই তো দিন চলে যাচ্ছে। এ পৃথিবীতে আমার কর্তব্য কাজের কতটুকু করতে পেরেছি? পৃথিবীতে কেন এলাম, আর কি করে গেলাম। পুঁজি তো কিছুই জমা করা হয়নি। খরচের খাতাই শুধু ভরে গেছে। জমার খাতা যে একেবারে খালি।

একথা শ্রবণ করে হযরত শাহ ইলিয়াছ (রহ.) জঙ্গলে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি একাগ্রচিত্তে মহান আল্লাহ তা'য়ালার ইবাদতে মশগুল হলেন। আহার নেই, নিদ্রা নেই, সাধনা, একাগ্র চিত্তে শুধুমাত্র সাধনা। দিন রাত তিনি ইবাদতে ডুবে রইলেন। সুদীর্ঘকাল এভাবে মহান আল্লাহর ইবাদতে নিমগ্ন থাকার পর মহান আল্লাহ তাঁর উপর সদয় হলেন, তিনি আধ্যাত্মিক সাধনার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছলেন, কামালিয়াত হাসিল করলেন।[২৯৫]

চন্দ্র চুরি

উল্লেখ্য যে, একদা রাতের বেলা তিনি তাঁর ইবাদতখানায় ধ্যানমগ্ন ছিলেন, ঘরে বাতি জ্বালানো ছিল না। এমন সময় উপর হতে একটি প্রজ্বলিত শিখা তাঁর ঘরে প্রবেশ করল, যার ফলে তাঁর সমস্ত ঘর

২৯৪.প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

২৯৫.আলহাজ মাওলানা মোঃ শহীদুল ইসলাম, *হযরত শাহজালাল (রহ.) ও হযরত শাহ পরান (রহ.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯-২৫০

উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। এ ঘটনা সংঘটিত হবার পর জনসমক্ষে তাঁর কামালিয়াত স্থায়ী আসন লাভ করল। প্রকাশ হয়ে পড়ল যে, রাতে হুজুরের দরবারে আকাশের চাঁদ নেমে এসেছিল। সে থেকে গ্রামের নাম হয়ে গেল চন্দ্রচুরি।[২৯৬]

হযরত শাহ ইলিয়াছ (রহ.) আউলিয়াদের মুকুট-মণি ছিলেন। আধ্যাত্মিক সাধনায় তাঁর সময়কালে তাঁর মতো আর কেউ এতো উচ্চশিখরে পৌঁছাতে পারেননি। কুতুবুল আউলিয়া যখন নামাযে দাঁড়াতেন, তখন তাঁর বাহ্যজ্ঞান লোপ পেয়ে যেত। 'দিন তো চলে গেল, দুনিয়াতে এসে কি করলাম' কথাটি তাঁর মনোরাজ্যে যে ঢেউ তুলেছিল, আজীবন তা আর তিনি ভুলতে পারেননি। তিনি কথা বলতেন হৃদয়ের ভাষা দিয়ে। তাঁর মুখনিঃসৃত ভাষা মারাত্মক পাপীর মনেও দাগ কাটত। তিনি যখন মুনাজাতে হাত তুলতেন, তখন তিনি কি দুনিয়ায় আছেন না অন্য কোথাও চলে গেছেন এ সম্বন্ধে তাঁর কোন খেয়াল থাকত না। মুনাজাত করার সময় তাঁর দুই চক্ষু হতে বিগলিত ধারায় অশ্রু ঝরে পড়ত। মা হারানো ছোট্ট সন্তান মাকে না পেয়ে যেভাবে মা মা করে ক্রন্দন করে থাকে, মুনাজাতের সময় তিনিও তদ্রূপভাবে ক্রন্দন করতেন। হযরত কুতুবুল আউলিয়ার কান্নায় হয়তো বা মহান আল্লাহর আরশে আযীম প্রকম্পিত হতো। আল্লাহর নূরের ফেরেশতারা নীরব নিথর হয়ে তা শ্রবণ করত। তা দেখে তাঁর ভক্ত-অনুরক্তের দল কেঁদে কেঁদে অস্থির হয়ে যেত।

হযরত কুতুবুল আউলিয়া (রহ.)-এর পার্থিব সম্পদ বলতে মাত্র তিনখানা পাথর ছিল। এ পাথরের একখণ্ডে বসে তিনি ওযূ করতেন, একটির উপর দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতেন এবং শেষ পাথর খণ্ডটির উপর বসে তিনি খাবার গ্রহণ করতেন। প্রস্তর খণ্ডত্রয় তাঁর জন্মস্থান ঘরগাওয়ে আজোবধি সযত্নে সংরক্ষিত আছে। ঘরগাওয়ের যে বাড়িতে তিনি বসবাস করতেন সে বাড়িটি পীর বাড়ি বলে পরিচিত।

কুতুবুল আউলিয়ার প্রপৌত্র হযরত হাসানও উচ্চস্তরের ওলী ছিলেন। আধ্যাত্মিক জগতে তাঁর খুব নামডাক ছিল। কথিত আছে যে, আরাকানের তখনকার সময়ের মগ রাজা তাঁর পূর্বপুরুষ সাইয়্যিদ মূসাকে যে তলোয়ারটি উপহার দিয়েছিলেন এবং যা পুরুষানুক্রমিকভাবে ওয়ারিসসূত্রে তিনি প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তা এবং এর সাথে একটি ঘোড়া সুবিখ্যাত মোজাহিদ শমসের গাযীকে দান করে বলেছিলেন যে, এ তলোয়ার ও ঘোড়া তোমাকে দান করলাম। আল্লাহর ফজলে এ দুটির কারণে সর্বদা তুমি বিজযী হবে। শেষ পর্যন্ত চাকলাবাদের শাসনক্ষমতা তোমার হাতে আসবে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়েছিল। শমসের গাযী চাকলাবাদের শাসনকর্তা হয়েছিলেন।

খোয়াই নদীর তীরে মুড়ারবন্দ নামক স্থানে হযরত কুতুবুল আউলিয়া শাহ ইলিয়াছ কুদ্দুস (রহ.)-এর মাযার অবস্থিত। দূরদূরান্ত হতে ভক্ত-অনুরক্তেরা তাঁর মাযার যিয়ারত করতে আসে ও ভক্তিভরে যিয়ারত করে চলে যায়। মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর প্রকৃত প্রেমিক বান্দাগণকে এভাবেই চিরজীবী করে রাখেন।

---

২৯৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১

হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর শিষ্যের সংখ্যা অনেক। সিলেট শহর তিনশত ষাট আউলিয়ার মুল্লুক বলে যে প্রবাদ প্রচলিত আছে তা তাঁর হাতে গড়া আধ্যাত্মিক সাধকদের সংখ্যা। এসব শিষ্যদেরকে তিনি ইসলাম ধর্ম প্রচার-প্রসারের কাজে নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁদের সবাই এক মহা মূল্যবান রত্ন ছিলেন।[২৯৭]

এছাড়াও তাঁর আরো অনেক শিষ্যবৃন্দ ছিলেন, যারা হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, কিন্তু কামালিয়াত প্রাপ্ত ছিলেন না। সম্মানিত পাঠকবৃন্দের খেদমতে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর এসব শিষ্যবৃন্দের নামের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা পেশ করা হলো :

১. হযরত সিকান্দার গাজী (রহ.)
২. হযরত সাইয়্যিদ নাসিরুদ্দীন (রহ.)
৩. শাহাজাদা হযরত আলী (রহ.)
৪. হযরত খাজা আদীনা (রহ.)
৫. হযরত হাজী খলীল (রহ.)
৬. হযরত হাজী দরিয়া (রহ.)
৭. হযরত শেখ খিযির খান দবীর (রহ.)
৮. হযরত হাজী ইউসুফ (রহ.)
৯. হযরত ছোট পীর (রহ.)
১০. হযরত শাহচট (রহ.)
১১. হযরত মানিক পীর (রহ.)
১২. হযরত আব্দুল মালিক (রহ.)
১৩. হযরত আহমদ শেখ (রহ.)
১৪. হযরত আমান উল্লাহ শেখ (রহ.)
১৫. হযরত আলী ইয়ামানি (রহ.)
১৬. হযরত আবুল ফজল শেখ (রহ.)
১৭. হযরত আহমদ হাজী-১ (রহ.)
১৮. হযরত আহমদ হাজী-২ (রহ.)
১৯. হযরত আদম খাকি (রহ.)
২০. হযরত আলম সাইয়্যিদ (রহ.)
২১. হযরত আব্দুল্লাহ (রহ.)
২২. হযরত সাইয়্যিদ আহমদ কবির (রহ.)
২৩. হযরত সাইয়্যিদ আযীয (রহ.)

২৯৭.সৈয়দ মুর্তজা আলী, *হযরত শাহজালাল (রহ.) ও সিলেটের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭-৭৪

২৪. হযরত সাইয়্যিদ আহমদ (রহ.)

২৫. হযরত সাইয়্যিদ আযিয়াল (রহ.)

২৬. হযরত আব্দুশ শুকুর (রহ.)

২৭. হযরত আবুল হাসান (রহ.)

২৮. হযরত আযীয আস্কারী (রহ.)

২৯. হযরত আবুল আরীজ (রহ.)

৩০. হযরত সাইয়্যিদ আবু বকর-১ (রহ.)

৩১. হযরত সাইয়্যিদ আবু বকর-২ (রহ.)

৩২. হযরত খাজা আদ (রহ.)

৩৩. হযরত খাজা আলী-১ (রহ.)

৩৪. হযরত খাজা আলী-২ (রহ.)

৩৫. হযরত খাজা ইকবাল (রহ.)

৩৬. হযরত আবুল খায়ের (রহ.)

৩৭. হযরত আযীয চিশতি খাজা (রহ.)

৩৮. হযরত আব্দুর রহিম (রহ.)

৩৯. হযরত খাজা ইখতিয়ার (রহ.)

৪০. হযরত আসলি ইয়ামানি (রহ.)

৪১. হযরত আমিরুদ্দীন খাজা (রহ.)

৪২. হযরত আবু সাইদ (রহ.)

৪৩. হযরত সাইয়্যিদ আবুল আব্বাস (রহ.)

৪৪. হযরত সাইয়্যিদ আব্দুল জলীল (রহ.)

৪৫. হযরত আব্দুল হেকমী (রহ.)

৪৬. হযরত আহমদ নিশান বরদার (রহ.)

৪৭. হযরত আতাউল্লাহ হাফিজ (রহ.)

৪৮. হযরত সাইয়্যিদ আমীর (রহ.)

৪৯. হযরত আরীফ মুলতানী (রহ.)

৫০. হযরত ইমামুদ্দীন (রহ.)

৫১. হযরত মুহিব আলী (রহ.)

৫২. হযরত খলীল দেওয়ান (রহ.)

৫৩. হযরত সাইয়্যিদ ফখরুদ্দীন (রহ.)

৫৪. হযরত দৌলত শহীদ (রহ.)

৫৫. হযরত খাজা বুরহানুদ্দীন কাত্তাল (রহ.)

৫৬. হযরত হোসেন শহীদ (রহ.)
৫৭. হযরত হুজ্জাত মালিক (রহ.)
৫৮. হযরত সাইয়্যিদ দৌলত (রহ.)
৫৯. হযরত সাইয়্যিদ কাশিম হাক্কানী (রহ.)
৬০. হযরত কুতুব আমল শেখ (রহ.)
৬১. হযরত সাইয়্যিদ জাহাঙ্গীর (রহ.)
৬২. হযরত ফখরুদ্দীন কাজির (রহ.)
৬৩. হযরত সাইয়্যিদ জামিল (রহ.)
৬৪. হযরত হাসান সূফী (রহ.)
৬৫. হযরত ফয়েজ উদ্দীন শেখ (রহ.)
৬৬. হযরত খিযির শেখ (রহ.)
৬৭. হযরত গায়েবী পীর (রহ.)
৬৮. হযরত সাইয়্যিদ বদর (রহ.)
৬৯. হযরত বুরহানুদ্দীন বুরহানা (রহ.)
৭০. হযরত শেখ বাহারউদ্দীন (রহ.)
৭১. হযরত ফহেত গাজী (রহ.)
৭২. হযরত গরীব খাকী (রহ.)
৭৩. হযরত শেখ ইলিয়াস (রহ.)
৭৪. হযরত জুনায়েদ গুজরাটি (রহ.)
৭৫. হযরত সাইয়্যিদ ঈসা-১ (রহ.)
৭৬. হযরত সাইয়্যিদ ঈসা-২ (রহ.)
৭৭. হযরত ঈসা শেখ (রহ.)
৭৮. হযরত হুসামুদ্দীন বিহারী (রহ.)
৭৯. হযরত বাহার আস্কারী (রহ.)
৮০. হযরত সাইয়্যিদ ফরিদ (রহ.)
৮১. হযরত দাউদ কোরায়শী (রহ.)
৮২. হযরত সাইয়্যিদ বায়েজিদ (রহ.)
৮৩. হযরত শেখ গরীব (রহ.)
৮৪. হযরত করিমদাদ রুমী (রহ.)
৮৫. হযরত সাইয়্যিদ কবীর (রহ.)
৮৬. হযরত গনি মাহমুদ (রহ.)
৮৭. হযরত দৌলত হাজী (রহ.)

৮৮. হযরত সাইয়্যিদ হামজা (রহ.)

৮৯. হযরত সাইয়্যিদ জওহর (রহ.)

৯০. হযরত দৌলত মুনিরী (রহ.)

৯১. হযরত কাযী ফিরোজ (রহ.)

৯২. হযরত বদর মালিক (রহ.)

৯৩. হযরত সাইয়্যিদ বদরুদ্দীন (রহ.)

৯৪. হযরত হোসেন শেখ (রহ.)

৯৫. হযরত যমশের হাজী (রহ.)

৯৬. হযরত কালু শেখ (রহ.)

৯৭. হযরত বাজ শেখ (রহ.)

৯৮. হযরত শেখ আব্দুল্লাহ (রহ.)

৯৯. হযরত হাজী খিযির (রহ.)

১০০. হযরত হাজী কাসিম (রহ.)

১০১. হযরত গাযী মালেক (রহ.)

১০২. হযরত হাফিজ মাহমুদ (রহ.)

১০৩. হযরত জগাই শেখ (রহ.)

১০৪. হযরত ফসীহ হাফিজ (রহ.)

১০৫. হযরত সাইয়্যিদ আহমদ (রহ.)

১০৬. হযরত আবদুল আযীয শেখ (রহ.)

১০৭. হযরত হাজী হাবিব (রহ.)

১০৮. হযরত হাশিম চিশতি (রহ.)

১০৯. হযরত হুসামুদ্দীন (রহ.)

১১০. হযরত শেখ বাহাউদ্দীন (রহ.)

১১১. হযরত সাইয়্যিদ বুযর্গ সাইয়্যিদ (রহ.)

১১২. হযরত খতীব হাযরাত উল্লাহ (রহ.)

১১৩. হযরত আবু সাইয়্যিদ (রহ.)

১১৪. হযরত সাইয়্যিদ বদরুদ্দীন (রহ.)

১১৫. হযরত খাজা দাউদ (রহ.)

১১৬. হযরত খাজা মালিক (রহ.)

১১৭. হযরত সাইয়্যিদ খলীল (রহ.)

১১৮. হযরত কামাল ইয়ামানী (রহ.)

১১৯. হযরত ইসমাঈল উমারী (রহ.)

১২০. হযরত জালালুদ্দীন (রহ.)
১২১. হযরত ফয়েজুল্লাহ কাযী (রহ.)
১২২. হযরত দিলওয়ার খতীব (রহ.)
১২৩. হযরত দাওর বখশ খতীব (রহ.)
১২৪. হযর দৌলত গাযী (রহ.)
১২৫. হযরত জামাল শেখ (রহ.)
১২৬. হযরত সাইয়্যিদ পীর কাসিম (রহ.)
১২৭. হযরত খাজা ওমর জাহান শেখ (রহ.)
১২৮. হযরত হেলিমুদ্দীন শেখ (রহ.)
১২৯. হযরত শেখ কুতুবুদ্দীন (রহ.)
১৩০. হযরত খাজা ঝকমক (রহ.)
১৩১. হযরত জাহান কাযী (রহ.)
১৩২. হযরত জামালুদ্দীন (রহ.)
১৩৩. হযরত মাওলানা করীমুদ্দীন (রহ.)
১৩৪. হযরত ইমাম শুকুর উল্লাহ (রহ.)
১৩৫. হযরত সাইয়্যিদ খলিলুল্লাহ (রহ.)
১৩৬. হযরত সাইয়্যিদ কুতুব উদ্দীন (রহ.)
১৩৭. হযরত ফরিদ শেখ রওশন চেরাগ (রহ.)
১৩৮. হযরত সাইয়্যিদ আবুল মুয়ালী (রহ.)
১৩৯. হযরত সাইয়্যিদ জালালুদ্দীন (রহ.)
১৪০. হযরত সাইয়্যিদ আবদুল করীম (রহ.)
১৪১. হযরত খাজা নাসিরুদ্দীন (রহ.)
১৪২. হযরত শেখ সিরাজউদ্দীন (রহ.)
১৪৩. হযরত হাজী মুহাম্মদ (রহ.)
১৪৪. হযরত শেখ জিয়া উল্লাহ (রহ.)
১৪৫. হযরত নাসির উদ্দীন শেখ (রহ.)
১৪৬. হযরত মুহাম্মদ ইয়াছিন (রহ.)
১৪৭. হযরত সালেহ মালেক (রহ.)
১৪৮. হযরত পীর মালেক (রহ.)
১৪৯. হযরত মুহাম্মদ শেখ আনসারী (রহ.)
১৫০. হযরত পর্বত জাহান পীর (রহ.)
১৫১. হযরত নসর সৈয়দ উল্লাহ (রহ.)

১৫২. হযরত শরীফ হাজী (রহ.)
১৫৩. হযরত মখদুম নিযাম উদ্দীন ওসমানী (রহ.)
১৫৪. হযরত লতীফ হাজী (রহ.)
১৫৫. হযরত ওমর জাহান খাজা (রহ.)
১৫৬. হযরত সাইয়্যিদ শাহ তাজ উদ্দীন (রহ.)
১৫৭. হযরত নিয়ামত উল্লাহ শেখ (রহ.)
১৫৮. হযরত সিকান্দর তাবলবাজ (রহ.)
১৫৯. হযরত মুহাম্মদ জোনায়েদ (রহ.)
১৬০. হযরত খাজা সলিম (রহ.)
১৬১. হযরত সিরাজ খাজা (রহ.)
১৬২. হযরত সুনী গাযী (রহ.)
১৬৩. হযরত সুলতান শাহ (রহ.)
১৬৪. হযরত মুহাম্মদ শাহবাজ (রহ.)
১৬৫. হযরত নিযামুদ্দিন বাগদাদী (রহ.)
১৬৬. হযরত পীর সাইয়্যিদ কাসিম (রহ.)
১৬৭. হযরত সদর শেখ (রহ.)
১৬৮. হযরত মুখতার শহীদ (রহ.)
১৬৯. হযরত সলিম শেখ (রহ.)
১৭০. হযরত জাকারিয়া আরবী (রহ.)
১৭১. হযরত মুহাম্মদ মুজা (রহ.)
১৭২. হযরত শরীফ আজমীরী (রহ.)
১৭৩. হযরত পিয়ার খাজা (রহ.)
১৭৪. হযরত মাখদুম রহীম উদ্দীন (রহ.)
১৭৫. হযরত সিকান্দার শেখ (রহ.)
১৭৬. হযরত নিযামুদ্দীন কিরমানি (রহ.)
১৭৭. হযরত শেখ নসরত (রহ.)
১৭৮. হযরত শেখ শমন (রহ.)
১৭৯. হযরত জৈনদ্দিন আব্বাসী (রহ.)
১৮০. হযরত ওসমান উদ্দীন (রহ.)
১৮১. হযরত ওমর শেখ (রহ.)
১৮২. হযরত জৈব হাজি (রহ.)
১৮৩. হযরত নূর মালিক (রহ.)

১৮৪. হযরত জাকারিয়া আরাবী (রহ.)

১৮৫. হযরত মুহাম্মদ শুজা (রহ.)

১৮৬. হযরত জাকি শেখ (রহ.)

১৮৭. হযরত সাইয়্যিদ মুস্তাফা (রহ.)

১৮৮. হযরত জাবারিয়া হাফিজ (রহ.)

১৮৯. হযরত সাইয়্যিদ ওমর সমরকান্দি (রহ.)

১৯০. হযরত সাইয়্যিদ মুসলিম (রহ.)

১৯১. হযরত সাইয়্যিদ সাইফ উদ্দীন (রহ.)

১৯২. হযরত মারুফ সিলাহদার (রহ.)

১৯৩. হযরত মুহাম্মদ আশিক (রহ.)

১৯৪. হযরত মওদুদ সাইয়্যিদ (রহ.)

১৯৫. হযরত মখদুম জাফর গজনবী (রহ.)

১৯৬. হযরত নূরুল হুদা (রহ.)

১৯৭. হযরত মুজফর বিহারী (রহ.)

১৯৮. হযরত মুহাম্মদ তুর্কী (রহ.)

১৯৯. হযরত নকী (রহ.)

২০০. হযরত মুহাম্মদ আইয়ুব ইমাম (রহ.)

২০১. হযরত মুহাম্মদ আমীন (রহ.)

২০২. হযরত শাহ দেওয়ান গাযী (রহ.)

২০৩. হযরত সাধু শেখ (রহ.)

২০৪. হযরত তাহির শেখ (রহ.)

২০৫. হযরত কামাল উদ্দীন (রহ.)

২০৬. হযরত নূরুল্লাহ (রহ.)

২০৭. হযরত সাইয়্যিদ মুহাম্মদ গজনবী (রহ.)

২০৮. হযরত ওমর দরিয়াই (রহ.)

২০৯. হযরত মুহাম্মদ দানা শেখ (রহ.)

২১০. হযরত সাইয়্যিদ মুহাম্মদ নূর (রহ.)

২১১. হযরত তৈয়ব সালেমী (রহ.)

২১২. হযরত মুহিমুদ্দীন শেখ (রহ.)

২১৩. হযরত সুফিয়ানা খাজা (রহ.)

২১৪. হযরত মুহাম্মদ কিবারী (রহ.)

২১৫. হযরত সাহাবুদ্দীন (রহ.)।[২৯৮]

উপরোক্ত বুযুর্গগণের সকলেই ওলীয়ে কামিল ছিলেন। হযরত শাহজালাল (রহ) তাঁর এ সকল সহচরের সহায়তায় সমগ্র বাংলাদেশে ইসলামের আলোকমালা পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছিলেন। এসব বুযুর্গগণ হযরত শাহজালাল (রহ)-এর নিজ হাতে গড়া ছিলেন। তাঁদের সকলের একাধিক শাগরিদ ছিল, যারা নিজেদের দুনিয়াবী সুখ বিসর্জন দিয়ে আল্লাহর যমীনে তাঁর দ্বীন ইসলামের ঝাণ্ডাকে উড্ডীন করতে জীবন কুরবান করেছিলেন। বাংলাদেশ আজ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসেবে পরিচিত। এর মূলে রয়েছেন এ সকল নিবেদিত প্রাণ আউলিয়া কেরাম। তাঁদের আত্মোৎসর্গের ফসলই হচ্ছে আজকের বাংলাদেশ। মহান আল্লাহ তাঁদের সবাইকে উচ্চ মর্যাদা দান করুন।

২৯৮.আলহাজ মাওলানা মোঃ শহীদুল ইসলাম, *হযরত শাহজালাল (রহ.) ও হযরত শাহ পরান (রহ.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৩-২৮৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর ইসলাম প্রচার

আউলিয়াকুল শিরোমণি হযরত শাহজালাল (রহ.) সিলেটে আসার ফলশ্রুতিতে রাজা গৌড় গৌবিন্দের আমলের সব অপকর্মের অবসান হলো। রক্তপাতহীনভাবে হযরত শাহজালাল (রহ.) সিলেটের মাটিতে ইসলামের বিজয় নিশান উত্তোলন করতে সক্ষম হলেন। সত্যের কাছে অসত্য চরমভাবে পরাজিত হয়। বিজয় হলো সত্যধর্মের। ন্যায়ের আগমনে অন্যায় নির্বাসিত হলো চিরতরে। শঙ্খধ্বনির বদলে মিনারে মিনারে প্রচারিত হতে লাগলো মহান আল্লাহর মহিমা ও গুণগান। হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর স্বপ্ন সফল হলো। তিনি সিলেটের মাটিতেই তাঁর আস্তানা স্থাপন করলেন। তাঁর শাগরিদরা ও সেনাপতিরা তাঁকে রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করলেন; কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি বললেন, রাজ্য পরিচালনা করার ভার নিজের কাঁধে তুলে নিবেন না; বরং পূর্বের প্রতিশ্রুতি মোতাবেক দিল্লীর সম্রাট ফিরোজ শাহ তুঘলকের ভাগিনা সিকান্দার গাজীর হাতেই রাজ্যের পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করলেন। হযরত শাহজালাল (রহ.) নেপথ্যে থেকে সিকান্দার গাজীকে দিক-নির্দেশনা দিতে লাগলেন। তাঁর দূরদর্শিতায় সকলের মুখে হাসি ফুটল।[২৯৯]

হযরত শাহজালাল (রহ.) আস্তানা নির্মাণ করে সাদাসিধেভাবে তাঁর জীবন চালাতে লাগলেন। ইসলাম প্রচারের যাবতীয় দায়িত্ব তিনি নিজ কাঁধে তুলে নিলেন। কারণ তিনি তাঁর শিক্ষা জীবনের প্রথমেই ভেবেছিলেন তাঁর এ মহান দায়িত্বের কথা। তিনি স্বপ্নেও প্রত্যাদেশ পেয়েছিলেন তাই। সেহেতু তিনি সময় ক্ষেপণ না করে তাঁর সে দায়িত্ব পালনে তৎপর হলেন। যে মাটিতে একদিন ছিল পৌত্তলিকতা, অশান্তি, হানাহানি, মারামারি ও স্বার্থের হাতছানী সেখানে আজ হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় শান্তি, শৃংখলা, প্রেম-প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হলো সকল শ্রেণি-ধর্মের মানুষ।

ধর্মপ্রচারক হযরত শাহজালাল (রহ.) এবং তাঁর শিষ্যবৃন্দের কঠোর সাধনা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সিলেটের মানুষ ধীরে ধীরে দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিতে লাগল। এতদিন যারা ছিল অনৈক্যে শতধাবিভক্ত এক কালিমাযুক্ত জাতি, আজ তারা ইসলামের মাহাত্ম্যে হয়ে উঠল শান্তি শৃংখলার ধারক ও বাহক এক মহৎ জাতি। তারা বুঝতে পারল যে, মানুষ কখনো মানুষের প্রভু হতে পারে না। ইসলাম তাদেরকে শিখাল এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। তিনি এক এবং একক। তাঁর কোন শরীক নেই। হযরত মুহাম্মাদ (সা.) মহান আল্লাহ তা'য়ালার রাসূল। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) জীবন প্রণালীর মাঝে রয়েছে মানুষের দু'জাহানের মুক্তির সঠিক, সরল দিশা। রাসূল (সা.)-ই মানবজাতির জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। হযরত শাহজালাল (রহ.) মানুষের মাঝে ইসলামের এ মূল মন্ত্রই প্রচার করতে লাগলেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ক্রমে ক্রমে মুসলমানের সংখ্যা বাড়তে লাগল।

---

২৯৯. শাহ ওয়ালী উল্লাহ, *জীবনী গ্রন্থ, শাহজালাল (রহ.)* (ঢাকা : ছাফা বুক করপোরেশন, ১৯৯৭ খৃ.), পৃ. ৫৫-৫৮

হযরত শাহজালাল (রহ.) যখন সিলেটে এসেছিলেন, তখন মূলত এদেশ শিরক ও ভূত-প্রেতের আস্তানা হিসেবে খ্যাত ছিল। মানুষের সামাজিক কোন মর্যাদা ছিল না। এদেশে যে কয়জন মুসলমান ছিলেন, তাদের অবস্থা ছিল মারাত্মক শোচনীয়। এহেন অবস্থায় হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর মতো একজন মহান সংস্কারকের দরকার ছিল। তাইতো মহান আল্লাহ তাঁকে সুদূর ইয়ামন হতে এদেশে পাঠিয়েছেন।

আধ্যাত্মিক সাধক, ওলীয়ে কামেল হযরত শাহজালাল (রহ.) সর্বস্তরের লোকজনকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নেয়ার জন্য আহ্বান জানালেন। তিনি বারবার মানুষকে জানিয়ে দিলেন যে, ইসলাম শান্তি ও সমৃদ্ধির ধর্ম। এ ধর্ম ছাড়া ইহ-পরকালে মুক্তির কোন পথ নেই। যারা ইসলামকে নিজেদের জীবন বিধানরূপে গ্রহণ করবে তারা ইহ-পরকালে প্রভূত কল্যাণ লাভ করে ধন্য হবে। পক্ষান্তরে যারা ইসলামকে দ্বীনরূপে গ্রহণ করবে না, তারা উভয় জাহানে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হযরত শাহজালাল (রহ.) যুক্তি এবং হিকমতের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে ইসলামের বাস্তবতা তুলে ধরেছেন। তাঁর মধুর আহ্বানে মুগ্ধ হয়ে মানুষ দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিল। ধর্মপ্রচারক হযরত শাহজালাল (রহ.) এমনিভাবে পথভোলা পথিকদেরকে সঠিক পথের দিশা দান করলেন। এরপর তিনি মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বাণী।[৩০০]

হযরত শাহজালাল (রহ.) শুধুমাত্র একজন ধর্মপ্রচারকই ছিলেন না। তিনি একদিকে ছিলেন একজন আলিম, অন্যদিকে একজন দার্শনিক ও সংস্কারক। সর্বোপরি তিনি ছিলেন মহান আল্লাহ তা'য়ালার প্রিয় একজন বান্দা। তাইতো সকল প্রকার জ্ঞান তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। পার্থিব জীবনের প্রতি সামান্যতম লোভ ছিল না তাঁর। সর্বদা তিনি তাঁকে নিয়োজিত রাখতেন দ্বীন প্রচারের কাজে। কখনও কারো সাথে খারাপ ব্যবহার করেননি। গরীব, দুঃখী ও অসহায় মানুষের সহায় ছিলেন হযরত শাহজালাল (রহ.)।

হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর মাহফিল

আল্লাহ তা'য়ালা পৃথিবীতে যত নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন, তাঁর সবাই নিজের জীবনকে বিলিয়ে দিয়ে আল্লাহ তা'য়ালার বাণী মানুষের কাছে প্রচার করেছেন। করেছেন কঠোর পরিশ্রম। প্রতিপক্ষের হাতে অনেকে আবার শাহাদত বরণও করেছেন। তারপরও তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব পালন থেকে বিরত হননি। তাঁদের মিশনটাই ছিল মানুষের কাছে মহান আল্লাহ তা'য়ালার কালেমার দাওয়াত পৌঁছে দেয়া। নবীদের পরে যারা এ দায়িত্ব পালন করেছেন তাঁরা হলেন সাহাবায়ে কিরাম ও আল্লাহর ওলীগণ। তাঁরাও নবীগণের পুরোপুরি অনুসরণ অনুকরণ করে দুনিয়ার মানুষের মাঝে দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন। ফলশ্রুতিতে প্রতিপক্ষের কাছ থেকে নির্যাতন-নিপীড়ন সহ্য করেছেন। তবুও তাঁরা দ্বীন প্রচারের কাজ থেকে সামান্যতম পিছপা হননি। তাঁদেরই অন্যতম ছিলেন হযরত শাহজালাল (রহ.)।

৩০০.আলহাজ মাওলানা মোঃ শহীদুল ইসলাম, *হযরত শাহজালাল (রহ.) ও হযরত শাহ পরান (রহ.)*, প্রাগুক্ত. পৃ. ৬৭

তাঁর জীবনও এর ব্যতিক্রম ছিল না। তাঁকে বিধর্মীদের মোকাবেলা করতে হয়েছে। সহ্য করতে হয়েছে অনেক নির্যাতন, নিপীড়ন।

মহান মুবাল্লিগ হযরত শাহজালাল (রহ.) যেসব পথ বা পন্থা অবলম্বন করে মানুষের মাঝে দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছিলেন, সেগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল জলসা বা মাহফিল। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে সেখানকার জনসাধারণকে একত্রিত করে সাবলিল ও হিকমতপূর্ণ ভাষায় ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন, কালেমার দাওয়াত পেশ করেছেন।

মহান আল্লাহ তাঁকে জ্ঞান দান করার পাশাপাশি সাবলিল ভঙ্গিমায় তা প্রকাশ করার জন্যও শ্রুতিমধুর একটি কণ্ঠস্বর দান করেছিলেন। তিনি যখন কথা বলতেন হিন্দু, খ্রিস্টান, মুসলমান যারাই তাঁর মাহফিলে উপস্থিত থাকতো কেউই তাঁর দিকে না তাকিয়ে থাকতে পারতো না। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে কেউ যদি শুনত যে, অমুক জায়গায় হযরত শাহজালাল (রহ.) বক্তৃতা করবেন, তখন সেখানে হাজার হাজার মানুষ জমায়েত হতো। মনোযোগ সহকারে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর বয়ান শ্রবণ করতো এবং দলে দলে লোক তাঁর হাতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যেত।[৩০১]

হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর কথামালার মধ্যে মানুষকে প্রভাবিত করার শক্তি ছিল খুব বেশি। তিনি যে কথাই বলতেন না কেন জনগণের ভিতর তাঁর তাছির বা প্রভাব সাথে সাথে পরিলক্ষিত হতো। হযরত শাহজালাল (রহ.) ছিলেন মুস্তাজাবুদ দাওয়াত। অর্থাৎ দোয়া করার সাথে সাথেই আল্লাহ তা'য়ালা তা কবুল করে নিতেন।

---

৩০১. আলহাজ হযরত মাওলানা সিরাজুল ইসলাম, *হযরত শাহজালাল (রহ.) ও হযরত শাহ পরান (রহ.)-এর জীবনী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
সিলেটে ইসলাম প্রচার কেন্দ্র নির্বাচন

বাংলাদেশে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর আসার মূল ও মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর বিধান ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আদর্শ বিভ্রান্ত মানব জাতির মধ্যে প্রচার ও প্রসার করা। এ মুখ্য ও মৌলিক কর্তব্য পালন করতে গিয়ে অনেক সময় গৌণ কর্তব্যে জড়িয়ে পড়তে হয়। হযরত শাহজালাল (রহ.)-কেও জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল রাজনীতি ও যুদ্ধ-বিগ্রহে। এটা ছিল তাঁর গৌণ কর্তব্যে ডাক।

হযরত শাহজালাল (রহ.) যখন কুদরতী ইঙ্গিতে ইসলাম প্রচারের জন্য বের হন, তখন তাঁর সহচর ছিলো মাত্র বারো জন। দেশ ভ্রমণ করতে করতে দিল্লী এসে পৌঁছলে সহচরের সংখ্যা দাঁড়ালো ৩১৩ জনে। দিল্লী হতে যখন বাংলাদেশের অভিযানে বের হয়েছিলেন সম্ভবত এই ৩১৩ জনসহ আরো অনেক সহচর হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর উপদেশে গৌড় গৌবিন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল।

হযরত শাহজালাল (রহ.) মক্কা বিজয়ের ন্যায় আল্লাহ প্রদত্ত গোপন শক্তিবলে রক্তপাতহীনভাবেই গৌড় রাজ্যের রাজধানীতে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আদর্শ অনুযায়ী রাজনীতির এ কাজগুলো রাসূল (সা.)-এর ন্যায়ই হযরত শাহজালাল (রহ.) কাছে ছিল সম্পূর্ণ গৌণ উদ্দেশ্য।

মক্কা বিজয়ের পর রাসূল (সা.) যেমন বলেছিলেন, আমার জিহাদের ন্যায় গৌণ উদ্দেশ্য শেষ, এখন আমি বিধান প্রচারের ন্যায় মৌল উদ্দেশ্যের প্রতি মনোনিবেশ করছি। রাসূল (সা.)-এর একই আদর্শ হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। গৌড় ও তরফ রাজ্য পদানত হওয়ার পর এ রাজ্য দুটির শাসনভার তাঁরই অন্যতম মুরীদ সিকান্দার শাহের হাতে অর্পণ করে তিনি ধর্ম প্রচারের ন্যায় মৌল উদ্দেশ্যে মনোনিবেশ করলেন।

হযরত শাহজালাল (রহ.) বাংলাদেশে এসে ধর্মপ্রচার শুরু করতে গিয়ে একটি স্থায়ী আবাসস্থলের তীব্র অভাব অনুভব করলেন। তখনই তাঁর মনে পড়ল তাঁর পীর সৈয়দ আহমদ কবীরের দেয়া মাটির কথা। তিনি তাঁকে একমুষ্টি মাটি প্রদান করে বলেছিলেন, ইসলাম প্রচারের জন্য বের হও এবং এই মাটির সাথে যে স্থানের মাটির মিল পাবে, মনে করবে সেই স্থানেই হবে তোমার ধর্ম প্রচারের স্থায়ী আস্তানা। সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করে ধর্মপ্রচারের মহান দায়িত্ব পালন করবে।

হযরত শাহজালাল (রহ.) সে মাটি সংরক্ষিত স্থান থেকে বের করে সিলেটের মাটির সাথে মিলিয়ে দেখলেন সিলেটের মাটি ও এ মাটির হুবহু মিল রয়েছে, রং ও গন্ধের কোন ব্যবধান নেই। তখন তাঁর আর বুঝতে বাকি রইল না যে, এ সিলেট তাঁর স্থায়ী কর্মক্ষেত্র। পীরের দেয়া মাটির সাথে সিলেটের মাটির অবিকল মিল পেয়ে হযরত শাহজালাল (রহ.) আর সময় নষ্ট না করে সিলেটে একটি টিলার উপর আস্তানা তৈরি করে নিলেন।

হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর মাতা সৈয়দ আহমদ কবীর ও তাঁর দেয়া মাটি প্রসঙ্গে ড. ওয়াইজ বলেন, হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর মাতুল ও মুর্শিদ সৈয়দ আহমদ কবীর সোহরাওয়ার্দী তাকে

বললেন, এগিয়ে যাও, পৃথিবী পর্যটন কর যে পর্যন্ত না এমন ভূমি পাও যার রং গন্ধ এ মাটির অনুরূপ। সেরূপ নিজ আবাসগৃহ রূপে তিনি স্থির করেন এবং সেখানেই ইন্তিকাল করেন।[৩০২]

সৈয়দ মুজতাবা আলী তার 'হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস' গ্রন্থে লেখেন যে,"তোমরা আর আমার কাছ থেকে ইবাদতের প্রয়োজন নেই, তুমি হিন্দুস্তানে গিয়ে পবিত্র ইসলাম ধর্ম প্রচার কর। অতঃপর তার হোজরা থেকে এক মুষ্ঠি মাটি তুলে হযরত তাঁর শাহজালালের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, এ বর্ণের এ গন্ধের এ স্বাদের মাটি যেখানে পাবে বুঝবে সে স্থান পবিত্র। তুমি সেখানেই থাকবে। সে স্থানই তোমার সাধন ভূমি। যাও বৎস! তোমাকে আল্লাহর হাদে তুলে দিলাম।[৩০৩]

তাছাড়া নির্দিষ্ট স্থানে বসবাস করার কারণে তাঁর সহচর, ভক্ত ও মুরীদগণের তাঁর সান্নিধ্য লাভ করা বেশ সুবিধা হলো। হযরত শাহজালাল (রহ.) শেষ পর্যন্ত এই আস্তানায় ছিলেন। বাংলা ভাষার লেখা সিলেট অঞ্চলের প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ 'শ্রীহট্ট দর্পণ' এ বলা হয়েছে হযরত শাহজালাল (রহ.) ছোট্ট টিলায় বাস করতেন, মৃত্যুর পর সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। দাফনের পর কবরের চারপাশে ছোট্ট দেয়াল তোলা হয়। পাশেই বানানো হয় একটি মসজিদ।

হযরত শাহজালাল (রহ.) সিলেটকে ইসলামের কেন্দ্র নির্বাচন করে সেখান থেকে ইসলামকে সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

৩০২.*জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটিঅব বেঙ্গল* (কলকাতা : ১৮৭ - ২৭৮), পৃ. ৫

৩০৩.সৈয়দ মুর্তজা আলী, *হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর কারামাত, ইবাদাত ও তাওয়াক্কুল

হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর জীবনী প্রথমিক উপকরণ প্রধানত উপাখ্যানমূলক। এ সমস্ত উপাখ্যানগুলোর অবলম্বনে তাঁর ইতিহাসে গোড়াপত্ত হয়েছে। যদিও কোন কোন ঘটনায় নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। কিন্তু মতাধিক বছরের চেয়ে বেশি সময়ের মধ্যে হযরত শাহজালাল (রহ.) সম্বন্ধে যতগুলো পুস্তক লেখা হয়েছে বা প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে প্রায় সবকটিতে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর বিভিন্ন কারামত উল্লেখ করেছেন।[৩০৪]

মহান আল্লাহ হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে শেষনবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত যে সমস্ত আম্বিয়াগণকে প্রেরণ করেছিলেন, তাঁদের সবাইকে মু'জিযা দান করেছিলেন। সময় ও সুযোগ মত তাঁরা এ সমস্ত মু'জিযা[৩০৫] জনসাধারণকে প্রদর্শন করে তাদের ভিতর ঈমানের প্রেরণা দান করতেন। আল্লাহ তা'য়ালার নবী ও রাসূলগণের মু'জিযাসমূহ দেখে অনেক অমুসলিম ঈমানদার হতো, আবার অনেক দুর্বল ঈমানের লোকেরা তাদের ঈমানকে পাকাপোক্ত করতো। আর যে সমস্ত লোক আল্লাহর নবীদের মু'জিযাকে অবিশ্বাস করতো তারা একে যাদু ইত্যাদি নামে অভিহিত করে পয়গাম্বরদের যাদুকর বলে আখ্যায়িত করতো।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বিভিন্ন নবীকে বিভিন্ন মু'জিযা দান করেছিলেন। হযরত মূসা (আ.)-এর হাতের লাঠি সাপে পরিণত হওয়া। তাঁর পবিত্র হাত বগলের ভিতর রেখে আবার তা বের করলে চাঁদের আলোর মতো উজ্জ্বল হওয়া ইত্যাদি। ফেরাউন হযরত মূসা (আ.)-কে যাদুকর মনে করে তার রাজ্যের সব যাদুকরকে ডেকে এনে হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে প্রতিযোগিতা করা জন্য আদেশ দিল। ফেরাউনের নির্দেশে তার রাজ্যের যাদুকরেরা হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে যাদু প্রদর্শন করতে এসে যারপর নাই লজ্জিত ও বিস্মিত হলো। হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে যাদু প্রদর্শন করতে গিয়ে তারা হার মানল এবং তাঁর কাছে কালেমা পাঠ করে আল্লাহর উপর ঈমান আনল। ফেরাউনের যাদুকরেরা ঈমান আনলেও ফেরাউন ঈমান আনেনি। কারণ সে ছিল চরম দাম্ভিক। পাপ করতে করতে তার অন্তর পাথরের চেয়েও কঠিন হয়ে গিয়েছিল।

হযরত ঈসা (আ.) মহান আল্লাহর বিখ্যাত এক নবী ছিলেন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে অনেক মু'জিযা প্রদান করেছিলেন। তিনি আল্লাহ তা'য়ালার আদেশে হাজার বছরের মৃতকে জীবিত করতে পারতেন। তাঁর হাতের স্পর্শে মারাত্মক কুষ্ঠ রোগী মুহূর্তের মাঝে ভালো হয়ে যেত।

৩০৪.এ জেড এম শাসুল আলম, *হযরত শাহজালাল কুনিয়াভি (রহ.)* (ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল লি., ৩য় সংস্ক., ১৯৯৬ খৃ.), পৃ. ৫

৩০৫.নবী-রাসূল কর্তৃক অলৌকিক কর্মকাণ্ডকে বলা হয় মু'জিযা। এবং ওলী-আউলিয়া কর্তৃক অলৌকিক কর্মকাণ্ডকে বলা হয় কারামত।

সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল সাইয়্যিদুনা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কেও মহান আল্লাহ তা'য়ালা অনেক মু'জিযা দান করেছিলেন। বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'য়ালা সকল নবী ও রাসূলকে যে সমস্ত মু'জিযা দান করেছিলেন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-কে একাই তার চেয়ে অধিক মু'জিযা দিয়েছিলেন। আল্লাহর নবী হাতের ইশারায় আকাশের চাঁদকে দুই টুকরো করে দিয়েছিলেন। পাথর কণার ভিতর হতে কালেমার আওয়াজ বের হয়েছিল। মরা খেজুর গাছের গুড়ি হতে বিচ্ছেদ বেদনার কান্নার আওয়াজ বের হয়েছিল। পবিত্র হাত মোবারকের আঙ্গুল মোবারক হতে পানির ঝর্ণা প্রবাহিত হয়েছিল ইত্যাদি হাজারো মু'জিযা।

আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নবুওয়াতের মাধ্যমে নবুওয়াতী যুগ শেষ হয়ে গেছে। কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবী বা রাসূল দুনিয়াতে আসবেন না। আর সে জন্য মু'জিযা প্রদর্শনেরও যুগ অবসান হয়ে গেছে। এখন যা আছে তা হলো কারামাত। আর এ কারামাত প্রদর্শন করেন মহান আল্লাহ তা'য়ালার ওলীগণ। আকাইদের কিতাবে বর্ণিত আছে যে, *"কারামাতুল আউলিয়াই হাক্কুন"* অর্থাৎ ওলীগণের কারামাত সত্য।

ওলীগণও মহান আল্লাহ তা'য়ালার ইচ্ছায়ই কারামাত প্রদর্শন করে থাকেন। তবে সকল প্রকার অলৌকিক ঘটনা কারামাত নয়। অর্থাৎ যে কোন লোক কোন প্রকার অলৌকিক ঘটনা দেখালেই একে কারামাত বলা যাবে না এবং এর কারণে ঐ ব্যক্তিকে বুযুর্গও বলা যাবে না। কারণ, অনেক ফাসেক পাপী এমনকি কাফের মুশরিক দ্বারাও অনেক সময় বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হতে পারে। অলৌকিকত্বের মাধ্যমে লোকের বুযুর্গী প্রকাশ হবে তখন, যখন দেখা যাবে যে সে লোকটি পুরোপুরি মহান আল্লাহ তা'য়ালার হুকুম-আহকাম মেনে চলে। তাঁর নির্দেশিত পথে জীবন চালাচ্ছে এবং তাবলীগে দ্বীনের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে।

আউলিয়া কেরামের জীবনের অলৌকিক ঘটনা সম্বন্ধে মালিক আহমদ নিজামী লিখেন–

As years roll on the real and human figure of the saints gets obscured by the legend and fiction which grows round him. Their legendary stories may reveal the working of the mind of people among whom they are current but they do not help the least understanding the saint himself or interpre tiny his teavhing properly. [৩০৬]

অলৌকিকত্বের প্রকারভেদ

ওলামায়ে কেরামগণ অলৌকিকত্বকে তিনভাগে ভাগ করেছেন : ১. মু'জিযা, ২. কারামাত, ও ৩. ইস্তিদরাজ। নবী ও রাসূলগণ প্রদর্শিত অলৌকিক ঘটনাকে মু'জিযা এবং আল্লাহর ওলীদের প্রদর্শিত ঘটনাকে কারামাত বলা হয়। মু'জিযা ও কারামাত নবী ও ওলীগণের বিশেষত্ব। পক্ষান্তরে ফাসিক ও কাফের-মুশরিকদের দ্বারা যদি কোন অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শিত হয় তাকে বলা হয় ইস্তিদরাজ। এটা শয়তানের মাধ্যমে ঘটে থাকে। সরলপ্রাণ জনতাকে বিভ্রান্তির জালে আটকে রেখে তাদেরকে বিপথগামী

৩০৬.নিজামী মালিক আহমদ, *দি লাইফ এন্ডটাইম অব ফরিদউদ্দিন গঞ্জেশকর* (ভারত : আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৫ খৃ.), পৃ. ৫

করার জন্যই এর উৎপত্তি। সে জন্য সত্যিকার আল্লাহর ওলীগণ বলেন যে, ব্যক্তির চরিত্র না জেনে শুধু অলৌকিকত্বে প্রভাবিত না হয়ে কারো কাছে যেন দীক্ষা গ্রহণ করা না হয়। কারণ, মানুষ নামধারী প্রতারকের দল সরলপ্রাণ জনতাকে ধোঁকা দিয়ে নিজ স্বার্থ আদায় করে থাকে।

আল্লাহর মকবুল বান্দা হযরত শাহজালাল (রহ.) কামেল ওলী ছিলেন। তিনি আধ্যাত্মিক সাধনার সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হয়েছিলেন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর মাধ্যমে অনেক অলৌকিক ঘটনার উন্মেষ ঘটিয়েছেন। নিম্নে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর কতিপয় অলৌকিক ঘটনা বা কারামাত উল্লেখ করা হলো :

১. আগাম মৃত্যু সংবাদ ও নসিহত প্রদান

বিশ্ব পরিব্রাজক ইবনে বতুতা কামরূপ পাহাড় অঞ্চলে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য আগমন করেন। ইবনে বতুতা লিখেছেন যে, তিনি কামরূপ থেকে দু'দিনের পথ দূরে থাকাকালে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর চারজন শাগরিদ তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। শাগরিদরা ইবনে বতুতাকে বলেন যে, শায়খ তাদেরকে বলেছেন, "পশ্চিম দেশ থেকে এক পরিব্রাজক তোমাদের দেশে আসছে। যাও তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়ে নিয়ে আসো।

ইবনে বতুতা লিখেছেন যে, তাঁর কামরূপ অঞ্চলে গমন সম্বন্ধে অবগত হওয়ার কোন সম্ভাবনাই শায়খের ছিল না; কিন্তু তিনি তা অলৌকিক শাক্তি বলে জানতে পেরেছেন।

ইবনে বতুতা আরো লিখেছেন যে, মৃত্যুর পূর্ব দিনে হযরত শাহজালাল (রহ.) স্বীয় শাগরিদদের আহ্বান করে নানাবিধ নসিহত করেন। পরিশেষে বলেন, "আমি আগামীকল্য তোমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ। আমি তোমাদেরকে আল্লাহর নিকটই সোপর্দ করে যাচ্ছি, যিনি ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই। তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখবে। আল্লাহকে ভয় করবে।"

পরদিন জোহরের নামাযের শেষ সেজদার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর হুজরার কাছেই দেখা যায় সদ্য খনন করা একটি কবর, সুগন্ধি কাপড় এবং দাফনের অন্যান্য সরঞ্জাম।

২. জায়নামাযে উপবেশন করে নদী অতিক্রমণ

হযরত শাহজালাল (রহ.) সিলেট অভিযানকালে মুসলিম বাহিনীসহ হরিণ চর্ম নির্মিত জায়নামাযে উপবেশন করে পথিমধ্যে সকল নদ-নদী অতিক্রম করে পরিশেষে তাঁর ৩৬০ জন আউলিয়াসহ সুরমা নদী অতিক্রম করে শ্রীহট্টে উপনীত হয়েছেন। কোন কোন গবেষক বাঁশ ও কলাগাছ কেটে ভেলা বানিয়ে তাঁর উপর জায়নামায বিছিয়ে নদী অতিক্রম করেছিলেন বলে অভিমত পেশ করেন।

এটা কখনও কারামাতের পর্যায়ে পড়েই না। ভেলা দ্বারা নদী পারাপার এটা তো স্বাভাবিক। অলৌকিক কোন কর্ম তথা কারামাত নয়। কারামাত বা অলৌকিকতার সংজ্ঞাতেই পড়ে না। যুগ যুগ ধরে চলে আসা হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর অন্যতম কারামাত অস্বীকারের নামান্তর। অথচ আকাইদ

শাস্ত্রের মূলনীতি হচ্ছে, কারামাতুল আউলিয়ায়ে হাক্কুন অর্থাৎ ওলী-আউলিয়া কর্তৃক সংঘটিত অলৌকিক কর্মকাণ্ড তথা কারামাত সত্য।

৩. ধনুতে গুন যোজন

মুসলিম বাহিনী সিলেটের সুরমা নদীর তীর এসে উপস্থিত হলে গোবিন্দ বেশ বুঝতে পারলেন আর রক্ষা নেই। তবুও তিনি নিজ ভাগ্য পরীক্ষার জন্য এক উপায় উদ্ভাবন করলেন। তার অস্ত্রাগারে অতি প্রচীন একটা লৌহ ধনুক ছিল। এরূপ প্রবাদ ছিল যে, যে ব্যক্তি সে ধনুকের গুন যোজনা করতে পারবে কেবলমাত্র সে গৌড়রাজ্য জয়ে সমর্থ হবে। গৌড় গোবিন্দের বিশ্বাস ছিল কেউ এতে গুন যোজন করতে পারবে না। তাই তিনি হযরতের কাছে তা পাঠিয়ে জানালেন যে, তাঁর মধ্যে কেউ যদি গুন আরোপ করতে পারেন, তবে তিনি বিনাযুদ্ধেই রাজ্য ছেড়ে যাবেন। হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর নিকট তা আনা হলে তিনি সঙ্গীদের ডেকে বললেন, যে ব্যক্তি কোন দিন আসরের বা ফজরের নামায কাযা করেনি, তিনিই এ কাজ সাধনে সক্ষম হবেন। সকলের মধ্যে কেবল মাত্র দরবেশ সৈয়দ নাসির উদ্দীন সিপাহসালার এ কাজের উপযুক্ত বিবেচিত হওয়াতে হযরত তাকেই ধনুতে গুন যোজনা করতে বললেন। আল্লাহর হুকুমে দরবেশ সৈয়দ নাসির উদ্দীন সিপাহসালার সহজেই কৃতকার্য হলেন। এ কথা জানতে পেরে গোবিন্দ পলায়নের কথা চিন্তা করতে লাগলেন।[৩০৭]

৪. গৌড় গোবিন্দের প্রাসাদ ধ্বংস

কথিত আছে যে, একদিন হযরত শাহজালাল (রহ.) তাঁর সঙ্গি-সাথী দরবেশদের সাথে মসজিদ প্রাঙ্গণে উপবিষ্ট ছিলেন। গড়দুয়ারে অবস্থিত গৌড় গোবিন্দের দুর্গ তার দৃষ্টিপথে নিপতিত হলো। হযরত শাহজালাল (রহ.) দুর্গের গঠিত উঁচু শিখরের প্রতি তাকিয়ে বললেন, অত্যাচারী রাজার প্রাসাদটি যদি রাজার ন্যায় দূরীভূত হয়ে যেত, তার অত্যাচারের স্মৃতি খুব সম্ভব বিলীন হয়ে যেত। এ বিশাল দুর্গ প্রাসাদ অত্যচারী রাজার শৌর্যবীর্যের প্রতীক। দরবেশের এ কথার সাথে সাথেই প্রাসাদটি নষ্ট হয়ে যেতে থাকে।[৩০৮]

জনবসতি আছে এ গড়দুয়ারে প্রকাশিত মজুমদারী নামক স্থানে পূর্বে মাটির নীচে উক্ত দুর্গের প্রচুর পরিমাণে ইষ্টক পাওয়া যেত। সৈয়দ বখত মজুমদার কর্তৃক ১২৭৬ হিজরীতে একটি পুকুর খনন করার সময় নয় দশহাত মাটির নীচে একটি পাকা দেওয়াল বের হয়।

৫. আযানের ধ্বনিতের দুর্গ পতন

হযরত শাহজালাল (রহ.) ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, আযানের ধ্বনির সাথে সাথেই যেন দুর্গ ধ্বংস হয়। তিনি যে কোন এক শাগরিদকে আযান দিতে নির্দেশ দেন। কিন্তু তাঁরা গোবিন্দের যাদু বিদ্যার ভয়ে ইতস্তত করতে থাকেন। হযরত শাহজালাল (রহ.) তখন বলেন যে, যিনি ফজরের নামায কখনও কাযা করেননি, এমন ব্যক্তি আযান দিক। নাসির উদ্দীন শাহচট (নুরুল্লাহ) ব্যতীত এমন

---

৩০৭. *হযরত শাহজালাল (রহ.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭-২০৮

৩০৮. মুফতি আজহার উদ্দিন সিদ্দিকী, *শ্রীহট্টে ইসলাম জোতি* (ঢাকা : উৎস প্রকাশন, ২০০২ খৃ.), পৃ. ৫১

কাউকেও পাওয়া গেল না। তার প্রথম ও প্রাকাশ্য আযানের সাথে সাথে পৌত্তলিকের রাজপ্রাসাদ ধ্বসে পড়ে। কোন কোন জীবনীকার বলেন, আযান শেষ হওয়ার সাথে সাথে শাহচট তীব্র বেদনায় আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে ওঠেন এবং বলেন যে, একদিনকার নামায তাঁর কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়েছিল। তিনি বিস্মিত ছিলেন। তাঁর মুখ থেকে রক্ত নির্গত হতে থাকে এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি ইন্তেকাল করেন।[৩০৯] তাঁর ইন্তেকাল সম্পর্কিত এ ঘটনাটির সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।

নাসির উদ্দীন শাহচটের আকস্মিক মৃত্যুর পর গোবিন্দ ছদ্মবেশে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন। কিন্তু তা হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর অজানা ছিল না। তিনি রাজা গৌড় গোবিন্দকে বলেন, যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ কর তবে এ রাজ্য তোমারই থাকবে; কিন্তু গোবিন্দ তা অস্বীকার করেন। ক্রুদ্ধ হয়ে হযরত শাহজালাল (রহ.) বলেন, দূর হও। সাথে সাথে গোবিন্দ শূন্যে মিলিয়ে যায় আর তাঁকে দেখা যায়নি।

৬. সাপুড়িয়ার ঝুড়িতে রাজা গৌড় গোবিন্দ

ছদ্মবেশে রাজা-গোবিন্দের হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে একটি ঘটনা প্রচলিত আছে। কথিত আছে যে, হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর নিকট বিনা যুদ্ধে পরাজিত রাজা গোবিন্দ রাজ্য ত্যাগের পূর্বে একবার অলৌকক শক্তিসম্পন্ন দরবেশকে চোখে দেখার ইচ্ছা পোষণ করেন। তিনি সাপুড়ের ঝুড়িতে লুকিয়ে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর আস্তানায় উপস্থিত হন। সাপুড়ে দরবেশকে বিভিন্ন প্রকার সাপ প্রদর্শন করে; কিন্তু একটি ঝুড়ির সাপ একবারও বের করেননি। হযরত শাহজালাল (রহ.) দৈবশক্তির প্রভাবে ঝুড়ির মধ্যে রাজা গোবিন্দের অস্তিত্ব অবগত হন এবং রাজা গোবিন্দকে ঝুড়ি থেকে বের হয়ে আসতে নির্দেশ দেন। তাঁর ইন্দ্রজাল ব্যর্থ দেখে নিরূপায় রাজা দরবেশের পদতলে পতিত হন এবং ক্ষমা ভিক্ষা করেন। দরবেশ তাকে ক্ষমা করেন ও রাজ্য ত্যাগ করতে নির্দেশ দেন।[৩১০]

৭. মনা রায়ের দুর্গ পতন

রাজা গোবিন্দের প্রধান সেনাপতি মনারায় শহরের সর্বোচ্চ শিখরে বৃহৎ সপ্ততল হরমে বাস করতেন। এক একবার আযানের ধ্বনির সাথে সাথে এ প্রাসাদের এক একটি তলা বিধ্বস্ত হয়ে যায়। মনারায়ের টিলা উচ্চতায় সিলেট টাউনে সর্বোচ্চ। বর্তমানে জেলা জজের বাংলো এ টিলায় অবস্থিত।

৮. সুরমা নদীর পানি সুপেয় ও স্বাস্থ্যকর

হযরত শাহজালাল (রহ.) তাঁর অনুগত শাগরিদ শাহ জিয়া উদ্দিনকে বৃন্দাচল এলাকায় ইসলাম প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন। সে অঞ্চলের সুরমা নদীর পানি ছিল অস্বচ্ছ ও পানের অনুপযুক্ত। পানি পান করে লোক অসুস্থ হয়ে পড়ত। সে অঞ্চলের লোকজন হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর কাছে এসে তাদের খাবার পানির সমস্যা সমাধানের আবেদন জানায়। শাহ জিয়া উদ্দিন মনে করেন যে, হযরত

---

৩০৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

৩১০. আজহার উদ্দিন আহমেদ, *হিস্ট্রি অব শাহজালাল এন্ড হিজ খাদিমস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

শাহজালাল (রহ.) একবার ওই অঞ্চলে গেলে খাবার পানির দুরবস্থা এবং অন্যান্য সমস্যা দূরীভূত হবে। তাই তিনি স্বীয় মুর্শিদকে সে অঞ্চলে তাশরীফ আনার আবেদন জানান।

হযরত শাহজালাল (রহ.) বৃন্দাচলের অবস্থা নিজের চোখে দেখার জন্য সেখানে যান। তিনি জনসাধারণের দুরবস্থা দেখে অত্যন্ত ব্যথিত এবং বিচলিত হন। একদিন জুমুআর নামাযান্তে তিনি এক মুষ্ঠি বালুকা সুরমা নদীর ঘোলাটে পানিতে নিক্ষেপ করেন। তখন থেকে সে অঞ্চলে সুরমা নদীর পানি স্বচ্ছ ও সুপেয় হয়। যে স্থানে হযরত শাহজালাল (রহ.) বালুকা নিক্ষেপ করেছেন বলে কথিত আছে, আজও দেখ যায় তার পূর্বদিকের নদীর পানি ঘোলাটে এবং অপরিষ্কার; কিন্তু পশ্চিম দিকের পানি পরিষ্কার, স্বচ্ছ। আরও কথিত আছে যে, পাহাড় থেকে অবতরণের পর ওই অঞ্চলে নদীর স্রোত অত্যন্ত প্রখর ছিল। প্রায় সময় নদীর দুইকূল প্লাবিত হয়ে ঘর-বাড়ি শস্য ক্ষেত্র বিনষ্ট হয়ে যেত। হযরত শাহজালাল (রহ.) কর্তৃক বালুকা নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর থেকে সে অঞ্চলে সুরমার গতি শান্ত ও সমাহিত অবস্থা লাভ করে।[৩১১]

৯. দু'টি দৈত্য হত্যা

শাহ জিয়া উদ্দিন (রহ.) কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে হযরত শাহজালাল (রহ.) যখন বৃন্দাচল যাচ্ছিলেন তখন সিলেটের শহরের অনতি দূরে কুশিয়ারা নদীর তীরে বহু সংখ্যক লোক তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন। স্থানীয় জনসাধারণ তাঁর কাছে ধুলাকেনু নামক দৈত্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে তাঁর অত্যাচার থেকে রক্ষা করার জন্য হযরত শাহজালাল (রহ.)-কে প্রার্থনা করতে বলেন। এ দৈত্য একস্থান থেকে অপর স্থানে গমনকালে এত অধিক ধুলা উড়াতো যে, লোকজন ঘণ্টার পর ঘণ্টা কিছুই চোঁখে দেখত না। তারা আরও জানায় এ দৈত্যের গর্জনকালে লোকজন ভয় ভীতিতে মৃত প্রায় হয়ে যায়। ধুলাকেনু গৌড় গোবিন্দের অনুগত দৈত্য ছিল। এর সাহায্যে গেবিন্দ সোনাপুর নামক স্থানে সিকান্দর গাজীকে পরাস্ত করেন। হযরত শাহজালাল (রহ.) দৈত্য ধুলাকেনুকে নিজের সামনে এনে নিহত করেন। ধুলাকেনুর মৃত্যুতে স্থানীয় লোকজন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

বৃন্দাচল অঞ্চলে দেওরাইল নামে আর একটি ভীষণাকার দৈত্য বাস করতো। সে বিভিন্ন উপায়ে জনগণের উপর নির্যাতন চালাত। এরই নামানুসারে করিমগঞ্জ মহকুমার দেওরাইল পরগণার নামকরণ হয়। দেওরাইল দৈত্যটি ছিল আসলে একটি ভণ্ড পীর। সে বিভিন্ন প্রাণীর রং ধারণ করতে পারত এবং নিজের স্বর যে রকমের ইচ্ছা রূপান্তরিত করতে পারত। ভীত সন্ত্রস্ত মানুষ আশ্রয় এবং সাহায্যের জন্য তার নিকট আগমন করত। দিনের বেলায় এ পীরের নিকট আগমন করে নানা রকমের নজরানা পেশ করত। দেওরাইলকে হত্যা করে হযরত শাহজালাল (রহ.) দীর্ঘদিনের অত্যাচার-নিপীড়ন থেকে জনগণকে মুক্তি দান করেন।

১০. বাঘের উপযুক্ত বিচার

জনশ্রুতি আছে যে, একদা একটি হরিণ স্বীয় শাবক বাঘের হাতে হারিয়ে সৈয়দ আহমদ কবির (রহ.)-এর শরাণাপন্ন হন। তিনি এর অবস্থা দেখে দয়ার্দ্র হলেন এবং ভাগিনা হযরত শাহজালাল

---

৩১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

(রহ.)-কে বললেন, তুমি কি এটার কোন প্রকার উপকার করতে পার না? তিনি মামার মনের ভাব বুঝতে পেরে বাঘের সন্ধানে জঙ্গলে প্রবেশ করলেন। ওলী-দরবেশের স্বচ্ছ দর্পণ, তার ক্ষমতা সর্বব্যাপী (আল্লাহর ইচ্ছায়)। বাঘ, সিংহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তু তাঁদের করায়ত ও বাধ্যগত। বাঘটি উপস্থিত হয়ে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর পদচুম্বন করত প্রার্থনা করল। তিনি এটাকে আমার সামনে হাজির করলেন এবং তার আদেশে বাঘের দক্ষিণ হস্ত ভেঙ্গে দেওয়া হলো। অতঃপর বাঘটি বনে চলে গেল। হরিণটিও বিচার পেয়ে সন্তুষ্ট হলো। হযরত শাহজালাল (রহ.) পরীক্ষার পাশ করলেন। মামা বললে, "জালাল সুমা বকমালে রছিদি" অর্থাৎ জালাল তুমি আত্মোন্নতির চরম সীমায় পৌঁছেছ। জনাব নুরুল হক এর নিম্নরূপ বর্ণনা দিয়েছেন–

"একদা এক বাঘ একটি হরিণীকে আক্রমণ করে। হরিণ বাঘের হাত থেকে বাঁচবার জন্য প্রাণপণে দৌড়াইয়া অবশেষে আহমদ কবীর (রহ.)-এর কুটিরের সামনে আসে। হযরত শাহজালাল (রহ.) তা দেখতে পেয়ে হরিণকে তাঁদের কুটিরে আশ্রয় প্রদান করলেন এবং বাঘটিকে এক চড় মেরে তাড়াইয়া দেন।"[৩১২]

১১. ইয়ামান রাজার মৃত্যু

হযরত শাহজালাল (রহ.)-কে জব্দ করার জন্য ইয়ামান রাজা কৌশলে ও সঙ্গোপনে শরবরতের সাথে বিষ মিশ্রত করে হযরত শাহজালাল (রহ.)-কে পান করতে অনুরোধ করলেন; কিন্তু তৎক্ষণাৎ গোমর ফাঁক করলেন না। শরবত সামনে রেখে কেবল বললেন, ভাল-মন্দ সবই তকদীরে আছে, ফকীরের এটা শরাবান তাহুরা; কিন্তু যে এটা প্রদান করেছে তার জন্যই এটা বিষ। অতঃপর বিসমিল্লাহ বলে তিনি শরবত পান করলেন। হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর কোন প্রতিক্রিয়া করল না শরবত। ইয়ামান রাজ ভাবতে লাগলেন একি! বিষও কার্যকরী হলো না! অবশেষে কি রাজ্য হারাতেই হবে!! এ সব চিন্তা করতে করতে ইয়ামান রাজা চির নিদ্রায় শায়িত হলেন।

১২. শাহজালাল (রহ.)-এর ঝরণা

হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর জীবদ্দশায় তাঁর আস্তানার নিকটে একটি কূপ খনন করা হয়। সৌভাগ্যক্রমে এ কূপটি একটি প্রাকৃতিক ঝরনার সাথে সংযুক্ত হয়ে যায়। এ কূপটি বর্তমানে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর মাজারের পশ্চিম দিকে অবস্থিত। এর পানি অত্যন্ত স্বচ্ছ, স্বাস্থ্যকর এবং রোগ নিবারক। এ ঝরনার পানির রোগ নিবারণ ক্ষমতা এখনও দৃষ্ট হয়। বিশেষত পেটের অসুখে ঝরণার পানি অত্যন্ত উপকারক। কবির ভাষায় :

কত রোগী ভালো অইলা
ঝরণার পানি খাইয়া
বাবা শাহজালাল আউলিয়া।

---

৩১২. *আল-ইসলাহ*, শাহজালাল সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪

ঝরণার পানি সিলেটে তথা বহিরাগত যিয়ারতকারীদের সকলেই পবিত্র মনে করেন। এ পানিতে গোসল করা হয় না, ঝরণার পানি দিয়ে অনেকে ইফতার করেন।

কথিত আছে যে, কূপ খনন শেষ হলে হযরত শাহজালাল (রহ.) আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন, কূপটি যেন মক্কার জমজম কূপের সাথে যুক্ত হয়ে যায়। তিনি কূপের তল দেশে আপন লাঠি প্রোথিত করার সাথে সাথে এটি মক্কার জমজম কূপের সাথে যুক্ত হয়ে যায় এবং জমজম কূপের পানি প্রবাহিত হতে থাকে। এ কূপটির নামও জমজম চশমা।

Dr. Wise এর বর্ণনায় দেখা যায় Shaikh Jalal wised that a fountain like holy Zamzam of Makkah might spring of near his abode and immediately the fountain appeared.[৩১৩]

কথিত আছে যে, খিত্তা পরগণার চান্দাইটিলা নামক এক গ্রামে আব্দুল ওহাব নামে এক ব্যক্তি তাঁর বন্ধু মুনসুর আহমদের সাথে হজ্জ আদায় করার জন্য পবিত্র মক্কা গমন করেন। হজ্জ সমাপনান্তে তিনি দেখেন যে, তার কাছে রাখা খরচের উপরেও নয়টি স্বর্ণ মুদ্রা উদ্বৃত্ত ছিল। তিনি আশঙ্কা করলেন যে, পথিমধ্যে এ স্বর্ণমুদ্রাগুলো দস্যু-তস্কর লুণ্ঠন করতে পারে। হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর চশমার সাথে জমজম কূপের সংযোগে তিনি পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন। তাই একটি কাঠের ডিব্বায় স্বর্ণমুদ্রাগুলো প্রবেশ করিয়ে তিনি তা পবিত্র মক্কার জমজম কূপে নিক্ষেপ করেন। আর প্রার্থনা করেন যে, হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর চশমার সাথে জমজম কূপের সংযোগে তার বিশ্বাস যদি সত্য হয়, তবে তার কৌটাটি যেন সিলেটে পৌঁছে যায়। এক সুন্দর প্রভাতে শাহ খায়রুদ্দীন নামে মাজারের এক খাদিম কুপটি পরিষ্কার করার জন্য অবতরণ করেন। তিনি স্বর্ণ মুদ্রা পূর্ণ কৌটাটি প্রাপ্ত হন। হজ্জ সমাপনান্তে গৃহে প্রত্যাবতনের পর হাজী আব্দুল ওহাব খায়রুদ্দীনের নিকট ঘটনাটি বর্ণনা করেন। খায়রুদ্দীন বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করে মৃদু হাস্য করলেন এবং কৌটাটি তাঁকে অর্পণ করেন। হাজী আব্দুল ওহাব দুটি স্বর্ণ মুদ্রা মাজারের খেদমতের জন্যে অর্পণ করে সাতটি স্বর্ণ মুদ্রাসহ হৃষ্টচিত্তে প্রত্যাবর্তন করেন।[৩১৪]

১৩. জ্বলন্ত অঙ্গার খাদ্যে পরিণত হওয়া

হযরত নিযাম উদ্দীন আউলিয়ার এক শাগরিদ হযরত শাহজালাল (রহ.) দিল্লী অবস্থান কালে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন। উক্ত শাগরিদ নিজাম উদ্দিন আউলিয়াকে জানান যে, দিল্লীতে এক সূফী সাধক এসেছেন যার দর্শনে সকল চিন্তা-ভাবনা দূরীভূত হয়। শান্তির পূর্ত ধারায় হৃদয় স্নাত হয়। তিনি অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন। অজানা বিষয়ে তাঁর জ্ঞান সুদূর বিস্তৃত। নিজাম উদ্দীন আউলিয়া হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর অলৌকিক শক্তি পরীক্ষা করতে মনস্থ করেন। তাই তিনি রুটি জড়িয়ে কিছু জ্বলন্ত অঙ্গার তার সমীপে প্রেরণ করেন। হযরত শাহজালাল (রহ.) দিব্যদৃষ্টি বলে হযরত নিজাম উদ্দীনের মনোভাব অবগত হন। আল্লাহর নাম নিয়ে তিনি খাবারের কোটাটি খুললেন। নিজামুদ্দীন আউলিয়ার হতভম্ভ শাগরিদ বিস্মিত নেত্রে অবলোকন করল যে, জ্বলন্ত অঙ্গার পরিণত হয়েছে সুস্বাদু

৩১৩. ড. ওয়াইজ, *জার্নাল অব এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল*, ১৮৭৩, পৃ. ২২৯
৩১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০

খাদ্যে। তিনি এ অতি অস্বাভাবিক ঘটনাটি নিজামুদ্দীন আউলিয়ার নিকট বর্ণনা করেন। তাঁর আধ্যাত্মিক উৎকর্ষে নিঃসন্দেহে মুগ্ধ হয়ে নিজামুদ্দীন আউলিয়া হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর আস্তানায় উপস্থিত হয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।[৩১৫]

১৪. টগা তীরের সাহায্যে সপ্তকোদালী ছেদ

অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ফকীরের সাথে অস্ত্র সংগ্রাম নিরর্থক ভেবে রাজা গৌড় গোবিন্দ চাতুর্যের আশ্রয় নেন। তিনি হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর নিকট সাতটি কোদালী ও বাঁশের ধনুক এবং টগার তীর প্রেরণ করেন। তিনি প্রস্তাব করেন যে, যদি মুসলিমরা টগার তীরের সাহায্যে সাতটি কোদালী একত্রে ছিদ্র করতে পারে তবে তিনি বিনা যুদ্ধে রাজধানী ত্যাগ করবেন। হযরত শাহজালাল (রহ.) জিজ্ঞাস করলেন যে, এমন কে আছ যিনি ফজরের নামায কাযা করনি? বিলম্ব পদক্ষেপে শাহচট এগিয়ে এলেন।

হযরত শাহজালাল (রহ.) শাহচটকে গোবিন্দের প্রস্তাবিত কাজটি সম্পাদন করতে অনুরোধ করেন। শাহচট এ টগার তীরে সাতটি কোদালী ছেদ করেন। যদিও তিনি তাঁর কাজে সমর্থ হন; কিন্তু তিনি তীর নিক্ষেপের সাথে সাথেই ছিটকে পড়েন এবং হাঁপাতে থাকেন। তার সাথীরা কাছে গিয়ে দেখেন যে, তার লোমকুপের গোড়া থেকে রক্ত নির্গত হচ্ছে। তাঁরা শাহচটের এমন অবস্থায় আশ্চর্যান্বিত হন। তিনি সাথীদের বলেন যে, তার জানামতে তিনি কখনও ফজরের নামায কাযা করেননি। কিন্তু একদিন অতি দ্রুত নামায সমাধা করেছিলেন।[৩১৬]

১৫. সিলেটের নামের উৎপত্তি

সৈন্য বাহিনীসহ হযরত শাহজালাল (রহ.) সিলেট আগমন বার্তায় ভীত সন্ত্রস্ত রাজা গোবিন্দ সুরমা নদীর সমস্ত খেয়া বন্ধ করে দেন। অলৌকিক শক্তির প্রভাবে হযরত শাহজালাল (রহ.) জায়নামাযে উপবেশন করে নদী অতিক্রম করে দেখেন যে, নদী তীরের সমস্ত রাস্তা বন্ধ। কথিত আছে যে, অধীনস্থ দৈত্য-দানবদের দ্বারা ঐ দুলর্জ্ঘ প্রস্তর প্রাচীর নির্মিত হয়েছিল। প্রস্তর প্রাচীর লক্ষ্য করে হযরত শাহজালাল (রহ.) নির্দেশ দিলেন 'সিলহট' (পাথর সরে যাও) তাঁর নির্দেশের সাথে সাথে প্রস্তর প্রাচীর আন্দোলিত হলো এবং শিলা খণ্ডগুলো আস্তে আস্তে অপসারিত হয়ে গেল। নগর পথ উন্মুক্ত হলো। তখন থেকেই শহরের নাম হয় সিলহট। বর্তমানে সিলেট 'সিলহট' শব্দেরই মার্জিত ও পরিবর্তিত সংস্করণ।[৩১৭]

১৬. গজার মাছের উপাখ্যান

সেনাপতি সিকান্দর গাজী মাছ ধরতে ভালোবাসতেন। বড়শী দিয়ে মাছ ধরা ছিল তাঁর নেশা। সিকান্দর গাজীর মাছ ধরা সম্বন্ধে সিলেটে নানা ছড়া এবং উপকথা প্রচলিত আছে। একদিন হযরত

---

৩১৫. *শ্রীহট্ট নূর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪
৩১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১
৩১৭. *আল-ইসলাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

শাহজালাল (রহ.) সুরমা নদীর তীরে বেড়াতে যান। কতকগুলো গজার মাছ মাথা তুলে শায়খের নিকট নালিশ করে যে, সিকান্দর গাজী বড়শীর সাহায্যে তাদেরকে বিনাশ করছে। হযরত শাহজালাল (রহ.) তাদেরকে বললেন, বড়শীর টোঁপ না গিলতে। মাছগুলো তাকে বললো, তা কি করে সম্ভব হয়? ক্ষুধার সময় আমদের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। ক্ষুধার তাড়নায় বাঘিনী নিজের সন্তান পর্যন্ত খেয়ে ফেলে। আমরা কি করে বড়শীর টোঁপ খাওয়ার লোভ সংবরণ করি? আমাদেরকে আপনি আশ্রয় দিন।

হযরত শাহজালাল (রহ.) তাদের অনুরোধ রক্ষা করেন। গজার মাছগুলো নিয়ে এসে তিনি তাঁর খানকার কাছের পুকুরে আশ্রয় দেন। সে মাছগুলোর বংশধর আজও মাযারের ধারের পুকুরে রয়েছে। মাযার যিয়ারতকারীরা মাছগুলোকে যত্ন করে নানা খাদ্য খাওয়ায়। এ মাছ কেউ খায় না। মারা গেলে মাছগুলো পুঁতে ফেলা হয়। দরগার মাছকে সকলেই সম্মান প্রদর্শন করে থাকে। অনেক বিদেশী মাযার পরিদর্শন করতে যান। কথিত আছে, জনৈক ইংরেজ মাযারের পুকুরে এতো গজার মাছ এবং এগুলোকে নির্ভয়ে নিকটে আসতে দেখে আনন্দিত হয়। খেলাচ্ছলে সে মাছগুলোকে গুলি করে। একটি গজার মাছেরও কিছু হয়নি; কিন্তু ইংরেজটি সাথে সাথে রক্ত বমি করতে করতে মারা যায়।[৩১৮]

১৭. মাযারের বৃহৎ ডেকচি

হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর ওরসের সময় মাযারে একটি বৃহৎ ডেকচি ব্যবহৃত হয়। এটা কোন এক মোগল যুবরাজ কর্তৃক মাযারে প্রেরিত হয়। ডেকচির উপরের লেখা নিম্নরূপ :

"১২ই রমজান ১১১৫ হি. জাহাঙ্গীর নগরের শাহ আবু সাঈদ ইবনে মুহাম্মাদ জাফর ইবনে ইয়ার মুহাম্মাদ কর্তৃক এটি নির্মিত হয় এবং হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর মাযারে ব্যবহারের জন্য প্রেরিত হয়। আল্লাহর কসম! এটা যেন কখনও মাযারের পরিসীমার বাইরে নেওয়া না হয়। এর ওজন পাঁচ মন তিন সের দুই পোয়।"

যে যুবরাজ ডেকচিটি সিলেট পাঠিয়েছিলেন তিনি তা নদীতে ছেড়ে দিয়ে বললেন, "তোমাকে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর মাযারের জন্য তৈরি করা হয়েছে। চলে যাও সেখানে।" ভাসতে ভাসতে ডেকচিটি সিলেট শহরের নিকটে সুরমা নদীর চাঁদনি ঘাটে পৌঁছে গেল। এ বৃহৎ ডেকচিটি দেখার জন্য শত শত লোক নদী তীরে জমায়েত হলো। ডেকচিটির গায়ে মাযারের নাম খোদাই দেখে লোকজন মাযারের খাদেমকে খবর দিল। শহরের বহু লোক ডেকচিটি ধরতে চাইল; কিন্তু ধরতে পারলো না। কারণ, লোকজন ধরতে গেলেই ডেকচিটি দূরে সরে যায়। কথিত আছে যে, বহু লোক পথিমধ্যে ডেকচিটি ধরতে চেয়েছিল; কিন্তু কোন ব্যক্তি নিকটে এলেই ডেকচিটি নদীর মাঝখানে চলে যেত। ফলে কেউ তাতে হাত লাগাতে পারে না। এভাবে বহু দস্যু-তস্করের লোলুপ দৃষ্টি উপেক্ষা করে ডেকচিটি সিলেট শহরে উপস্থিত হয়। দরগার খাদিম আবুল আয়াস মুহাম্মদ আহমদ ওরফে আনা মিয়া ডেকচিটি ধরতে গেলে দেখা গেল যে, তা মোটেই আর সরে গেল না। খাদিম আনা মিয়া একটি সুসজ্জিত হাতীতে চড়িয়ে ডেকচিটি মাযারে নিয়ে আসেন। এক বিরাট জনতার মিছিল হাতীর পীঠে স্থাপিত

---

৩১৮. *শ্রীহট্ট জ্যোতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

ডেকচিটি মাযার পর্যন্ত অনুসরণ করে। সাতমন চাল এবং সাতমন গরুর গোশত এতে এক সাথে রান্না করা যায়।[৩১৯]

১৮. সিপাহসালার নাসির উদ্দীনের মৃতদেহ শূন্যে বিলীন

সিপাহসালার নাসির উদ্দীনের সমাধি সিলেটে নেই। তাঁর সমাধি বলে যে স্থানটি আছে তাতে তাঁর মৃত দেহ বহনের খাটিয়া দাফন করা হয়। কথিত আছে যে, সেনাপতি নাসির উদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁর মৃতদেহ জানাযার জন্য আনয়ন করা হয়। জানাযায় অংশগ্রহণকারী সালাম ফিরিয়ে দেখে যে, মৃতদেহ বহনের খাট শূন্য পড়ে রয়েছে, মৃতদেহ নেই। জনশ্রুতি এ যে, হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর অলৌকিক শক্তির প্রভাবে সেনাপতি নাসির উদ্দীনের মৃতদেহ দিল্লী নীত হয় এবং সেখানে দাফন করাহয়।

Dr. Wise এর ভাষায় He caused the carpse of Nasiruddin Sipahsalar who died at Sylhet to disapear from Mosque while the friend's were mourning over it.[৩২০]

১৯. সিলেট-১ আসনে বিজয়ী দল সরকার গঠন করে থাকে

বহুল আলোচিত ও বাস্তব সত্য এ যে, জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যে দল সিলেট-১ আসনে পাশ করে থাকে, সে দলই সরকার গঠন করে। হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর ওফাতের অদ্যাবধি সাতশত সাত বছর পরও এ মহান ওলীর এটা কত বড় কারামাত। গভীরভাবে চিন্তা করলে দিবালোকের ন্যায় বিষয়টি বুঝতে কারো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

২০. বিবি গয়রত এবং বিবির মোকাম

বিবির মোকাম ও বিবি গয়রত সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত জনশ্রুতি নিম্নরূপ :

হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর মাযারের উত্তর দিকে অবস্থিত একটি নীচু স্থান বিবি গয়রত নামে পরিচিত ছিল। কথিত আছে, উক্ত স্থানে পূর্বে একটি পুস্করিনী ছিল। একদিন বিকেল বেলা হযরত শাহজালাল (রহ.) তাঁর হুজরা থেকে ওযু করার জন্যে বা ভ্রমণের জন্যে বের হয়ে আসেন। শুক্লা নাম্নী একজক হিন্দুনারী তখন স্নানরত ছিলেন। ইতিপূর্বে হযরত শাহজালাল (রহ.) কখনও নারী দেখেননি এবং জীবনে কখনও নারী মুখ দর্শন করবেন না–এ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। শুক্লাকে স্নানরতা দেখে হযরত শাহজালাল (রহ.) জিজ্ঞেস করেন, 'এটা কোন প্রাণী?' তাঁকে জানানো হলো, ওটা কোন প্রাণী নয়, ও একজন নারী।

কথিত আছে যে, মোকামদোয়ার থেকে সিলেট শহরে প্রবেশের সময় চৌকিদেখি এলাকায় পথিপার্শ্বে দণ্ডায়মান একজন মহিলা হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর দৃষ্টিপথে পতিত হয়। তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'এটা কোন প্রকার জীব?' তাঁকে জানানো হয়, এটা একজন নারী। তিনি আক্ষেপ করে বললেন,

---

৩১৯. হযরত শাহজালাল (রহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬-৯৭

৩২০. ড. ওয়াইজ, *জার্নাল অব এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০

'আমি কী হতভাগ্য যে, আমাকে নারী মুখ দেখতে হলো।' সাথে সাথে মহিলাটি স্বাভাবিকভাবে মৃত্তিকা তলে পতিত হয়ে যায় এবং স্থানটি বিবি গয়রত নামে পরিচিত হয়।

উল্লেখ্য, বিবির মোকাম সিলেট শহরের সুবিদ বাজার ড্রামারটুলি মহল্লার আম্বরখানা দস্তিদার বাড়ির দক্ষিণ পাশে অবস্থিত। এলাকাটি মিয়া ফাজিল চিস্তি মহল্লা নামেও পরিচিত। কারও কারও মতে, চৌকিদীঘি এলাকায় বিবির মোকাম অবস্থিত। এ প্রসিদ্ধ ঘটনাটি Dr. Wise নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন :

It is beleived that Shah Jalal never looked on the face of woman. One day however standing on the bank of a stram he saw one bathing. In his simplecity he asked what strange creature. It was on being informed. He was enraged prayed that the water might rise and drown her. He had no sooner expressed this wish than water rose and drowned her. [৩২১]

বিবির মোকাম সম্বন্ধে আর একটি জনশ্রুতি আছে। সোহাগী নামক এক নপুংসক ব্যক্তি সুবদিবাজার এলাকায় বাস করত। সে আরবীয় মুখন্নাসদের তরীকায় নারীর বেশভূষা ও অলংকার পরিধান করতো। কৌতুক করে লোকজন সুদাই সোহাগীর বাড়িকে বিবির মোকাম বলতো। তাঁর মৃত্যুর বহু বছর পর কলন্দররা বিবির মোকামের সাথে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর নাম জড়িয়ে এক গল্প প্রচার করে। অলৌকিক গল্প কাহিনী প্রিয় লোকজন সহজেই বিশ্বাস করে এবং হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর পবিত্র নামের সাথে আর একটি আজগুবী কাহিনীর উদ্ভব হয়।

অন্ধ ভক্তের অনুসারীরা বিবি গয়রত এবং বিবির মোকামকে পবিত্র স্থান মনে করে মোকামে বাতি দেয়, নজর-নেওয়াজ পেশ করে। হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর অভিশাপে প্রোথিত হওয়া নগ্ন নারীর শরীর গোরে বাতি দেয়া অদ্ভুত কুসংস্কার বৈ কিছু নয়। এগুলো শরীয়ত অনুমোদিত কোন ব্যবস্থা নয়। এটা অস্বাভাবিক যে, খানকার পরিসীমার পুকুরে কোন হিন্দু নারী নগ্ন দেহে স্নান সমাপনের উদ্দেশ্যে আগমন করবে।

যেহেতু হযরত শাহজালাল (রহ.) উঁচুস্তরের আলিম ও শায়খুল মাশাইখ ছিলেন, বিধায় তিনি পর্দার অনুশাসন কঠোরভাবে মেনে চলতেন। রাস্তায় চলাকালে মুখ ঢেকে রাখতেন যেন কোন নারী তার দৃষ্টি পথে পতিত না হয়। তবে এটা অবিশ্বাস্য যে, তিনি জীবনে নারী মুখ দর্শন করেননি। হাতের কব্জির নীচের অংশ, পায়ের গিরার নিম্নাংশ এবং যা স্বাভাবিকভাবে দৃষ্টি গোচর হয় তা ছাড়া শরীরের অন্যান্য অংশ ঢেকে রাখার নির্দেশ ইসলামী শরীয়ায় আছে তবে মুখমণ্ডল ঢেকে রাখার নির্দেশ ইসলামে ফরয করা হয়নি। তাছাড়া নারীকে গৃহে খাঁচার মধ্যে আবদ্ধ করে লালন-পালনের নির্দেশও ইসলামে নেই। বিশেষত পুরুষের ক্ষেত্রে মুখ ঢেকে রাখার কোন চিন্তাই করা যায় না। হ্যাঁ, এতটুকু বলা যায়, হযরত শাহজালাল (রহ.) নারী দর্শন থেকে নিজেকে হেফাযতের লক্ষ্যে অতীব সর্তকতার সাথে চলাফেরা করতেন। তাই তিনি পথ চলাকালে মাথার উপর চাদর তথা আরবীয় রুমাল রেখে নীচের

---

৩২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০

দিকে তাকিয়ে চলতেন। এটা ঐতিহাসিক সত্য যে, তিনি নারী সাহচর্য এড়িয়ে চলতেন। আজও মহিলাদের তার মসজিদ বা মাযারের সন্নিকটে যাওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। খাদিমরা কঠোরভাবে নিষেধ করেন। তবে একথা অবিশ্বস্য যে, হযরত শাহজালাল (রহ.) জীবনে কোন দিন নারী মুখ দেখেননি এবং নারী দেখলে জিজ্ঞেস করতেন এটা কোন জীব।[৩২২]

পরিশেষে বলা যায় যে, কোন কিছু অন্ধভাবে গ্রহণ করা যেমন গোঁড়ামী তেমনি কোন কিছু চিন্তাহীনভাবে সত্যাসত্য বিচার না করে বর্জন করাও অযৌক্তিক। চন্দ্রযুগের মানুষ অতি প্রাকৃতিক জগতে আধিপত্য স্থাপনের মানবিক সম্ভাবনা আজো পরীক্ষা করে দেখেনি। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণ অতি প্রাকৃতিক জগতের গোপন তথ্য উন্মোচনে পেশাগত চেষ্টা চালায়নি।

কারামাত বা অলৌকিক ঘটনা কি কাল্পনিক অথবা বাস্তব সত্য– এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেবে ইসলামের আকাইদ শাস্ত্র। এ শাস্ত্রের স্বতঃসিদ্ধ বিধান হলো, 'কারামাতুল আউলিয়া হাক্কুন' অর্থাৎ আউলিয়ায়ে কেরামের কারামত তথা অলৌকিক কর্মকাণ্ড বাস্তব সত্য। এ বিষয়ে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হয়। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্র আজও প্রকৃত পীর-দরবেশ ও আউলিয়াগণ একচেটিয়া অধিকার করে রেখেছেন। তারাই হলেন এ বিষয়ের যোগ্যতম মহান ব্যক্তিত্ব, এ বিষয় অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। প্রাকৃতিক জগতের জ্ঞান বিজ্ঞানের সাহায্যে অতি প্রাকৃতিক জগতের ঘটনাবলী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সত্যাসত্য বিচারের প্রবণতা অবৈজ্ঞানিক, অবাস্তব ও অজ্ঞতাপ্রসূত গোঁড়ামী বৈ কিছু নয়। আল্লাহ তা'য়ালা প্রদত্ত ইলমে ওহী হচ্ছে সব জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল উৎস। জাগতিক বিদ্যাকে বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা– এটাই স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম।

হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর ইবাদত

হযরত শাহজালাল (রহ.) আধ্যাত্মিক সাধনায় নিজেকে যেমন ব্যাপৃত রাখতেন তেমনি তিনি ইবাদতেও সার্বক্ষণিকভাবে নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন। তিনি একদিকে প্রত্যাদেশ অনুযায়ী কাজ করতেন, অপরদিকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে যে উদ্দেশে সৃষ্টি করেছেন তাও যথাযথভাবে পালন করতেন। আল্লাহ তা'য়ালার ইবাদত-বন্দেগীতে তিনি কখনও শৈথিল্যভাব প্রদর্শন করতেন না।

হযরত শাহজালাল (রহ.) দিনের বেলায় তাবলীগে দ্বীনের কাজ করার জন্য এদিক-ওদিক ব্যস্ত থাকতেন। গভীর রাতে তিনি মহান আল্লাহর ইবাদতে নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন। তিনি জীবনেও তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য কিছু করেননি। যা করতেন সবই মহান আল্লাহ তা'য়ালার রেজামন্দি হাসিলের জন্যই করতেন। দিনের বেলায় সময় পেলেই হুজরায় প্রবেশ করে পবিত্র কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন।

রাতের বেলা হযরত শাহজালাল (রহ.) ইশার নামাযান্তে সামান্য আহার করে তিনি স্বীয় পবিত্র হুজরায় প্রবেশ করতেন। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করতেন, তারপর নামাযে দণ্ডায়মান হতেন। কখনও বা তিনি দুহাত তুলে মহান আল্লাহর দরবারে মুনাজাতে মশগুল হতেন। এভাবে তিনি তার রাত

৩২২. আজহার উদ্দিন আহমেদ, *হিস্ট্রি অব শাহজালাল এন্ড হিজ খাদিমস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

কাটিয়ে দিতেন। মানুষের হেদায়েতের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করতেন। মানুষের মঙ্গল কামনা করতেন। তিনি রাতের বেলা যখন স্বীয় হুজরায় ইবাদত করতেন তখন সেখানে কোন শিষ্যেরই যাওয়ার অনুমতি ছিল না। হযরত শাহজালাল (রহ.) গভীর রজনীতে নিস্তব্ধ, নীরব, নিথর পরিবেশে মহান আল্লাহ তা'য়ালার প্রেম সাগরে ডুব দিতেন।[৩২৩]

চিরকুমার হযরত শাহজালাল (রহ.)

পৃথিবীতে আল্লাহ তা'য়ালার প্রেমিক বান্দাগণের মাঝে হযরত শাহজালাল (রহ.) ছিলেন অন্যতম। তিনি আল্লাহর ইবাদতে এমনভাবেই মশগুল ছিলেন যে, বিয়ে করে সংসার পাতবার মতো সময় তাঁর ছিল না। তিনি মনে করতেন, নশ্বর এ দুনিয়ায় সংসার পেতে সময় নষ্ট করে কী লাভ! আল্লাহর ইবাদত করেই তো কুলান যায় না। হযরত শাহজালাল (রহ.) একমাত্র আল্লাহর ইবাদত একনিষ্ঠভাবে সম্পাদন এবং সবসময় তাতে নিয়োজিত থাকার জন্যই সংসারের দিকে মন বসাতে পারেন নি।

কোন কোন সময় কেউ কেউ তাঁকে বিয়ে না করার কারণ জিজ্ঞেস করত। তিনি বলতেন, মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে যে উদ্দেশ্য সৃষ্টি করেছেন সে দায়িত্বই তো সঠিকভাবে আদায় করতে পারছি না। তার উপর আবার বিয়ে করে সংসারের দায়িত্ব মাথায় নিলে সংসার চালাবার সময় পাব কোথায়? আবার তিনি তার শাগরিদদের বলতেন, তোমরা তো আমার বিয়ের কথা বল, আসলে যার শরীর আছে, রক্ত-মাংস আছে তারই বিয়ের প্রয়োজন হয়; কিন্তু আমার তো শরীরই নেই। এ যে দেহখানা দেখছ, এটাতো সম্পূর্ণ আল্লাহতে বিলীন হয়ে গিয়েছে। অতএব আমার বিয়ের প্রয়োজন হয় না।

হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর তাওয়াক্কুল

হযরত শাহজালাল (রহ.) যেমন ছিলেন আল্লাহ প্রেমিক, তেমনি মহান আল্লাহ তা'য়ালা উপর তাঁর নির্ভরতাও ছিল অপরিসীম। দুনিয়ার কোন বালা-মুসিবতে তিনি মানুষের কাছে সাহায্য চাইতেন না। তিনি ভাল করেই জানতেন যে, আল্লাহর হুকুম ছাড়া গাছের পাতাও নড়ে না। কোন বিপদ-আপদ এলে তা মহান আল্লাহর পক্ষ হতে এসেছে বলেই তিনি মনে করতেন এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, এর মাঝে কোন মঙ্গল রয়েছে, যা বিশ্ব বিধাতা গায়েবের মালিক আল্লাহই ভাল জানেন। তাই তিনি তাঁর কাছেই সাহায্য কামনা করতেন। যখন সিলেটের আকাশে বাতাসে অত্যাচার, অনাচার, অবিচার, রাহাজানি, খুনাখুনি নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল তখন মহান আল্লাহর সরাসরি রহমত হিসেবে তিনি সিলেটের যমীনে তাশরিফ এনেছিলেন। তাঁর সুভাগমনে জ্বলন্ত নরককুণ্ড বেহেশতের সুষমায় ভরে উঠেছিল। আধ্যাত্মিক সম্রাট হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর মহোত্তম আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলাদেশের মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে মুক্তির স্বাদ নিয়ে ধন্য হলো। তিনি জালিমদের থাবা হতে সিলেটের জনগণকে মুক্ত করলেন। প্রতিষ্ঠিত করলেন ন্যায়দণ্ড।[৩২৪]

৩২৩.মাওলানা সৈয়দ মোঃ মিজানুর রহমান, *হযরত শাহজালাল ও শাহ পরান (রহ.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩
৩২৪.প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪

হযরত শাহজালাল (রহ.) ৬২ বছর এ দুনিয়াতে জীবিত ছিলেন। এর মধ্যে প্রথম ৩০ বছর তিনি তাঁর মামা পীর হযরত সাইয়্যিদ আহমদ কবির (রহ.)-এর সান্নিধ্যে থেকে ইলমে শরীয়ত, মা'রেফত ও আধ্যাত্মিক শক্তি বিষয়ে উচ্চতর কামালিয়াত হাসিল করেন। এর পর দুই বছর তিনি ইসলাম প্রচারের নিমিত্তে বিভিন্ন দেশ সফর করেন। হযরত শাহজালাল (রহ.) তাঁর জীবনের শেষের ত্রিশ বছর সিলেটে অতিবাহিত করেছেন। কর্মজীবনে অসামান্য অবদান রেখে তিনি সিলেটেই সমাধিস্ত হন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সংস্কারক হিসেবে হযরত শাহজালাল (রহ.)

ঐতিহাসিকদের মতে জানা যায় যে, বাংলার নির্যাতিত মানুষ মাত্র কিছুদিন পূর্বে ১২০৪ ঈসায়ী সালে দুরাচারি সেন রাজার কবল হতে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা কিসের যেন শূন্যতা অনুভব করতে লাগল। সত্যিই মুসলমান কর্তৃক বাংলা বিজয়ের মাত্র ২৫ বছরের মাঝেই তাদের মনের সেই শূন্যতা কিছুটা দূর হলো। এবারে মহান আল্লাহর রহমতে বাংলার ভাগ্যাকাশে আবির্ভাব ঘটল হযরত শাহজালাল ইয়ামানী (রহ.)-এর।

হযরত শাহজালাল (রহ.)-কে পেয়ে সিলেটের মানুষ যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেল। তিনি সিলেটে আসার পর সংস্কারমূলক কাজ শুরু করেন। তাঁর সংস্কারমূলক কাজ দেখে সিলেটের মানুষ তাঁর পদতলে আশ্রয় নিল। অমুসলিমরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করল। আর মুসলমানরা শরীয়ত মা'রেফতের তালিম তরবিয়ত গ্রহণ করে পুরোদমে ইসলামের অনুশাসন মেনে চলতে শুরু করল। মুসলমানদের সঠিকভাবে নামায আদায় করার জন্য বিভিন্ন স্থানে মসজিদ নির্মাণ শুরু করলেন। জ্ঞানার্জনের জন্য প্রতিষ্ঠা করলেন অসংখ্য মাদরাসা। আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য বিভিন্ন জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করলেন খানকাহ এবং খানকাহ পরিচালনার জন্য নিয়োগ করলেন একজন শিষ্য বা শাগরিদ। শুধু তাই নয় অসহায়, গরীব-দুঃখী, ইয়াতীম-মিসকীন, ভুখা-নাঙ্গা পথিকদের জন্য থাকা খাওয়ার সুব্যবস্থাও করলেন। স্থাপন করলেন বিভিন্ন স্থানে লংগরখানা। হযরত শাহজালাল (রহ.) রাতের অন্ধকারে ঘুরে ঘুরে গরীব-দুঃখীদের খোঁজ খবর নিতেন। তাঁর এহেন সমাজ সংস্কারমূলক কাজ দেখে অমুসলিমরা দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিতে লাগল।

ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পর হতে হযরত শাহজালাল (রহ.) ছিলেন সপ্তদশতম ব্যক্তিত্ব। নিম্নে এর তালিকা প্রদান করা হলো :

১. হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু।
২. হযরত হাসান বসরী (রহ.)।
৩. হযরত হাবীব আজমী (রহ.)।
৪. হযরত দাউদ তায়ী (রহ.)।
৫. হযরত শেখ মারুফ কারখী (রহ.)।
৬. হযরত শেখ শরীফ খাতমী (রহ.)।
৭. হযরত শামসুদ্দিন নূরী (রহ.)।
৮. হযরত শেখ আমুনূরী (রহ.)।
৯. হযরত শেখ আহমদ নূরী (রহ.)।
১০. হযরত শেখ ওয়াজ উদ্দিন (রহ.)।
১১. হযরত আবু নসর জিয়া উদ্দিন (রহ.)।

১২. হযরত মাখদুম বাহাউদ্দিন (রহ.)।

১৩. হযরত আবুল ফজল সদরুদ্দীন (রহ.)।

১৪. হযরত রোকন উদ্দীন আবুল ফাতহ বোখারী (রহ.)।

১৫. হযরত সাইয়্যিদ জালাল উদ্দিন কবীর (রহ.)।

১৬. হযরত সাইয়্যিদ আহমদ কবীর (রহ.)।

১৭. হযরত শাহজালাল ইয়ামানী মুজাররাদি (রহ.)।[৩২৫]

উপরে বর্ণিত সকল মনীষীগণই আল্লাহ তা'য়ালার এক একজন মকবুল বান্দা ও ধর্মপ্রচারক এবং সমাজ সংস্কারক ছিলেন।

ইবনে বতুতার দৃষ্টিতে হযরত শাহজালাল (রহ.)

বিখ্যাত পরিব্রাজক ইবনে বতুতা হযরত শাহজালাল (রহ.)-কে শুধুমাত্র একজন ওলীয়ে কামেল বলেই চিহ্নিত করেন নি; বরং তিনি তাঁকে মানুষদের মধ্যে একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মহৎ কার্যাবলী বা মহান নিদর্শনাবলীর নিরিখে মানবিক দৃষ্টিকোণ ও কর্মকাণ্ডের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যের ভিত্তিতেই ইবনে বতুতা তাঁকে এমন মূল্যায়ন করেছেন।[৩২৬]

ত্রয়োদশ শতকের সামাজিক জীবনে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর প্রভাব সম্বন্ধে মলফুযাত সমূহে প্রাণবন্ত বর্ণনা পাওয়া যায়। আসলে সেকাল আর এ কালের সামাজিক জীবনে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর প্রভাবের মৌলিক তেমন কোন পার্থক্য সূচিত হয়নি। তবে সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে সামাজিক জীবনে তাঁর প্রভাবের কার্যকারিতার প্রমাণ এবং প্রয়োজনীয়তা বেড়েই চলেছে। আমরা এখানে অতীত ও বর্তমানের কয়েকজন কবির কবিতাংশ উদ্ধৃত করে অতীত ও বর্তমানের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করতে চাই।

কবির ভাষায় হযরত শাহজালাল (রহ.)

(১)

তুমি এনেছিলে ঈমানের আলো
আখেরী নবীর এ নয়া মদীনাতে
সত্য সাধক জালালী
হযরত শাহজালাল ....[৩২৭]

(২)

ধন্য তুমি দ্বীনের ফকীর-ফকীর শাহজালাল
করছে সারা আজম আলো তোমর রং মশাল।

---

৩২৫. সৈয়দ মুর্তজা আলী, *হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

৩২৬. HAR Gibb, *Ibn Buttyta : Travels in Asia and Africa,* London, 1928.

৩২৭. কবি ফররুখ আহমদ, *আল-ইসলাহ,* শাহজালাল সংখ্যা, ১৩৬৪ বাংলা।

ধন্য সে দেশ যে দেশেতে রাখছ তোমার পাও
ধন্য সে দেশ, যার বুকে রাখছ পাকি গাও।[৩২৮]

(৩)

দরবেশ তুমি কহ আজ ...
কবে তুমি সেই প্রথম ফজরে দাঁড়ায়ে মিনার পরে
নিখিল নরেরে ডাক দিয়েছেলে, আযানের মধুসুরে।
আজো সেই সুর ঘুরে ঘুরে মানুষের বুকে বুকে
খোদাতায়ালার আরশে পরে, মুরছি পড়ছে সুখে।
বহু পথ আসছি আমি, তোমার কবর পরে
শিখতে এসেছি কোন ডাকে তুমি ডাকতে নিখিল নরে।[৩২৯]

(৪)

এসেছ কি হেথা তুমি
উয়ায়সী এশকে কাবার গিলাফ চুমি?
ইয়ামন কারণে মরুবমি লংঘি গিয়েছ কি মদীনায়
সেথা কি নবীর ইরশাদ নিয়ে এলে এ বাংলায়।[৩৩০]

(৫)

তুমিই সত্য একক সাধক
সালাম তোমায় শাহজালাল।[৩৩১]

(৬)

ইসলাম কেতু ধরে
শ্রীহট্ট বিজয় করলে
তৌহিদ বাণী গেয়ে
দেশটিরে প্রেমে মাতালে।

(৭)

বঙ্গ দেশের বড় ওলী শাহজালাল পীর
আনন্দে বিদায় দিয়ে আমায় কারো স্থির।

৩২৮.রওশন ইজদানী, *আল-ইসলাহ*, শাহজালাল সংখ্যা, ১৩৬৪ বাংলা
৩২৯.কবি জসিম উদ্দীন, *আল-ইসলাহ*, শাহজালাল সংখ্যা, ১৩৬৪ বাংলা
৩৩০.শাহ মুস্তাফিজুর রহমান, *আল-ইসলাহ*, শাহজালাল সংখ্যা, ১৩৬৪ বাংলা
৩৩১.প্রসন্ন কুমার বিদ্যাবিনোদ, দ্র. মোহাম্মদ আবদুল হামিদ, *কাফেলা*, সিলেট, জুন ১৯৭৩, পৃ. ১৮

আমি তোমার তুমি আমার আর তো কেউ নাই
জন্মের মতো বিদায় হয়ে মদীনাতে যাই।[৩৩২]

(৮)

তুমি রহমের নদীয়া, তুমি রহমের দরিয়া
দোয়া করো মোরে হযরত শাহজালাল আউলিয়া।[৩৩৩]

জালালী তরীকার প্রভাব

হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর জালালী তরীকা ছিল একটি আন্দোলন। সুতরাং জালালী তরীকা আর জালালী আন্দোলন একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। ইনসানিয়াত বা মানবতার প্রচারই কেবল এই তরীকার বৈশিষ্ট্য নয়, খিদমতে খালক বা সৃষ্টির সেবাও এর একমাত্র লক্ষ্য নয়। কথা ও কাজে মহান আল্লাহ তা'য়ালার দাসত্ব বরণ অর্থাৎ তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত জীবনের প্রতি অবিচল আস্থা ও আত্মসমর্পণই জালালী তরীকার প্রধান বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তা'য়ালা খলীফা ও ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া বা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিশ্বস্ত অনুসারী হযরত শাহজালাল (রহ.) কারামতই নয়, আবার কারামত বর্জিত বৈজ্ঞানিক যৌক্তিক কর্মকাণ্ডই নয়, আসহাব সুফফার অনুসরণই কেবল নয়, খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শের বাস্তব রূপায়ণ ও জালালী তরীকা বা জালালী আন্দোলনের মর্মকথা।[৩৩৪] সুতরাং ইলমে শরীয়ত, ইলমে তরীকত, হাকিকত ও মা'রেফতের বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জনও এর বৈশিষ্ট্য। আল্লাহর যমীনে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠাই এর আদর্শ ও লক্ষ্য ছিল এবং তা বাস্তবায়িতও হয়েছে। আর সে জন্য সামাজিক জীবনে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর প্রভাব এত বেশি ও সুদূরপ্রসারী। মানুষ যত খোদাভীরু হয় তার প্রভাবও তত বেশি এবং স্থায়ী হয়। খোদাভীরু লোকদের প্রভাব আল্লাহ প্রদত্ত একটা গুণ। যা সবাই অর্জন করতে সক্ষম হয় না। হযরত শাহজালাল (রহ.) ছিলেন আল্লাহ ভীরু লোকদের মূর্ত প্রতীক। তাই তো তাঁর এত প্রভাব।

হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর শেষ জীবন

আমরা আগেই বর্ণনা করছি যে, হযরত শাহজালাল (রহ.) একদিকে ছিলেন বিখ্যাত ধর্মপ্রচারক ও আধ্যাত্মিক সাধক, অপরদিকে ছিলেন সমাজসংস্কারক জনহিতৈষী এক মহাপুরুষ। এটা ছিল তার সবচেয়ে বড় পরিচয়। জনসেবা এবং সমাজ সংস্কার কাজে তিনি নিজেকে এমনভাবে বিলিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর ব্যক্তিগত সুখ ভোগ একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন। তাঁর আহার-বিহার কোনটারই নির্দিষ্ট কোন সময় ছিল না। অধিকন্তু তিনি সারা রাত জাগ্রত থেকে মহান আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকতেন।[৩৩৫]

৩৩২.ছহিফা খাতুন হাজিক বিবি, দ্র. মোহাম্মদ আবদুল হামিদ, *কাফেলা*, সিলেট, জুন ১৯৭৩, পৃ. ১৪
৩৩৩.কবি দিলওয়ার, *সাপ্তাহিক বিপ্লব*, ঢাকা, ২৪ আগস্ট, ১৯৮৩
৩৩৪.দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, *হযরত শাহজালাল (র)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০-২২১
৩৩৫.*হযরত শাহজালাল ও শাহ পরান (রহ.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩

সংস্কারমূলক কাজের মধ্যে প্রধানত ছিল তাঁর ধর্মনীতির সাথে সমাজনীতি, অর্থনীতি, বিশেষত রাজনীতির সমন্বয় সাধন। হযরত শাহজালাল (রহ.) বিশ্বাস করতেন যে, ইসলাম যেহেতু একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা তাই জীবনের সর্বক্ষেত্রের চাহিদাই ইসলাম পরিপূর্ণ করতে পারবে। আর এ আদর্শই ছিল হযরত রাসূলে আকরাম (সা.) এবং সাহাবায়ে কেরামগণের। আর হযরত শাহজালাল (রহ.) ছিলেন এর বাস্তব অনুসারী।

হযরত শাহজালাল (রহ.) বিশ্বাস করতেন যে, আখেরাতে মুক্তির জন্য এ কাজই একমাত্র নির্ভরযোগ্য। তাই বলা হয়– 'দুনিয়া হলো আখেরাতের শস্যক্ষেত্র।' এখানে ফসল উৎপাদন করতে হবে আর আখেরাতে তা উপভোগ করতে হবে। তবে এসব উৎপাদন প্রক্রিয়া হতে হবে ধর্মসম্মত এবং ইসলাম অনুযায়ী। শরীয়তের বিধানের বাইরে এ উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে তা গ্রহণীয় হবে না। সে বিধান হলো হযরত রাসূলে পাক (সা.)-এর উপর নাযিলকৃত মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। এ কারণেই হযরত শাহজালাল (রহ.) ইসলাম প্রচার করার ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহর অনুসৃত নীতির কোন কিছুই বাদ দেননি। তিনি ইসলাম প্রচারকে শুধুমাত্র নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত এবং যিকির-আযকারের মাঝে সীমাবদ্ধ করে রাখেননি। তিনি ইসলামের নীতির সকল বিষয়ের প্রতিই কড়া দৃষ্টি রাখতেন। হযরত শাহজালাল (রহ.) ইসলামের সকল আদর্শ-নীতির উপর সমান গুরুত্ব প্রদান করতেন। আর এজন্যই তাঁর দরবারে সর্বদা সকল শ্রেণির মানুষের ভীড় লেগে থাকত। সামাজিক সালিশ বিচার হতে আরম্ভ করে রাজনৈতিক বিচার বিবেচনার কাজও তাঁর দরবারে সম্পন্ন হত। যার কারণে তাঁর মাহফিলে সকল শ্রেণির লোকের ভীড় জমত।[৩৩৬]

হযরত শাহজালাল (রহ.) সারা জীবন কঠোর পরিশ্রম ও নিরলস সাধনার কারণে ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর শরীর একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। তাঁর সারাজীবন বলতে গেলে সুস্বাস্থ্যেই অতিবাহিত করেছেন। বড় ধরনের কোন রোগ ব্যাধি তাঁর হয়নি। কিন্তু শেষ বয়সের অসুস্থতা আর ভালোর দিকে গড়ালো না। দিন দিন স্বাস্থ্য অবনতির দিকেই যেতে লাগল। ফলে তিনি স্পষ্টই বুঝতে পারলেন যে, তাঁর দ্বারা হয় তো মহান আল্লাহ তা'য়ালার মিশন শেষ হতে চলেছে। এখন আর তাঁর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নেই। মহান আল্লাহ তা'য়ালার ডাকে তাঁকে সাড়া দিতে হবে। পরপারে যাত্রার মনে হয় আর বাকি নেই।

জন্ম ও মৃত্যু এ দুটো প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে চলে আসছে। এটা স্বাভাবিক এবং চিরন্তন। মৃত্যুর হাত হতে কেউ রেহাই পায়নি, হযরত শাহজালাল (রহ.)ও পাবেন না। ঈমানহারা লোকের কাছে মৃত্যু অনাকাঙ্ক্ষিত; কিন্তু মু'মিনদের কাছে তা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। কারণ, এর মাধ্যমে তার প্রেমিক মাওলার সাথে মিলিত হতে পারবেন। এর চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কি হতে পারে! নেককার মু'মিন বান্দারা মরেও অমর হয়ে থাকেন। জীবিতরা তাঁর জীবন থেকে পাথেয় সংগ্রহ করে সৎপথে চলার

৩৩৬.আলহাজ মাওলানা মোঃ শহীদুল ইসলাম, *হযরত শাহজালাল (রহ.) ও শাহ পরান (রহ.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩-১৬৪

অনুপ্রেরণা লাভ করে। আল্লাহর ওলী ও প্রিয়জনেরা এ অমরত্বের প্রথম কাতারের মানুষ। হযরত শাহজালাল (রহ.) ছিলেন তাদের অন্যতম।

আল্লাহর ওলী হযরত শাহজালাল (রহ.) ছিলেন সে শ্রেণির ওলীগণের অন্যতম যারা মৃত্যুর পরেও আজোবধি অমর হয়ে আছেন। তাঁর দেহ যদিও দুনিয়া হতে বিদায় নিয়েছে; কিন্তু তাঁর আদর্শ মানব সমাজে আজো চির অম্লান হয়ে রয়েছে। পৃথিবীর মানুষ তাঁকে ভুলতে পারে না, ভুলবেও না কোনদিন।

খলীফাদের তলব

হযরত শাহজালাল (রহ.) তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ে যখন উপলব্ধি করতে পারলেন যে, তিনি আর বেশিদিন বেঁচে থাকবেন না, তখন তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রচার কাজে নিয়োজিত তাঁর খলীফাগণকে আস্তানায় ডাকলেন। যথাসময়ে খলীফাগণ সিলেটে তাঁর কাছে আগমন করলেন।

হযরত শাহজালাল (রহ.) আগেই ধর্ম প্রচারের জন্য তাঁর কামিল শিষ্যবর্গের মাঝে দায়িত্ব বণ্টন করে দিয়েছিলেন। তাঁর সহকর্মী, সহচর এবং খলীফাদের মধ্যে প্রধান ও শির্ষস্থানীয় ছিলেন সাইয়্যিদ নাসির উদ্দিন (রহ.)। একাধারে যেমন তিনি ছিলেন খলীফাদের মাঝে যোগ্যতম, অন্যদিকে তিনি ছিলেন হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর একান্ত স্নেহভাজন। তিনি তাঁকে তাঁর স্থলবর্তী এবং সকল খলীফাগণের তদারকির দায়িত্ব অর্পণ করে যান। একই সাথে তিনি হযরত নাসির উদ্দিন (রহ.)-এর সহযোগী হিসেবে দায়িত্ব দিয়ে যান হাজী ইউসুফ ও হাজী খলীলকে। তাঁরা উভয়েই তাঁর সান্নিধ্যে অবস্থান করতেন ও তাঁর সমস্ত কাজ সম্পাদন করে দিতন। বর্তমানে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর মাযারের খাদেমদের মধ্যে হাজী ইউসুফের বংশধররাই খেদমতের ব্যবস্থা করছেন।

হযরত শাহজালাল (রহ.) তাঁর প্রধান প্রধান সহচর, সহকর্মী ও খলীফাবৃন্দেকে তাঁর অন্তিম সময়ে একত্রিত করে তাদেরকে জীবনের বিদায় ভাষণ শুনিয়ে তাদের কর্তব্য নির্ধারণ করে দেন।[৩৩৭]

হযরত শাহজালাল (রহ.) এভাবেই ইসলাম ধর্মকে সিলেটসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

৩৩৭.প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর জীবনাদর্শ ও সামাজিক জীবনে এর প্রভাব

হযরত শাহজালাল (রহ.) ছিলেন আসহাবে সুফফার আদর্শে অনুপ্রাণিত এক মহান ওলীকুল শিরোমণি। মহান আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী ও বিশ্বমানবের কল্যাণ সাধনা ব্যতিরেকে অপর কিছু কল্পনা করার অবকাশ তার ছিল না। আসহাবে সুফফার অন্তর্ভুক্ত সাহাবায়ে কিরামগণ ছিলেন ইসলামের জন্য আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর জন্য নিবেদিত প্রাণ।

মসজিদে নববীর দক্ষিণ পাশের মেঝেতে তাঁরা সর্বদা যে স্থানে অবস্থান করতেন আজও সে পবিত্র স্থান চিহ্নিত রয়েছে। জনগণের মধ্যে ইসলামের বাণী প্রচার, জিহাদের আহ্বান এলে পরম উৎসাহ-উদ্দীপনায় অংশগ্রহণ এবং মানবতার কল্যাণমূলক যে কোন কার্যক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়া ছিল তাদের অভ্যাস। এক কথায় তাঁরা আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর নির্দেশে যে কোন ধরনের ত্যাগ স্বীকার ও সার্বক্ষণিক তাঁর সাহচার্য লাভ করে নিজেদেরকে ধন্য করে নিয়েছিলেন। স্বেচ্ছায় আল্লাহর রাস্তায় যেন নিজেদেরকে তাঁরা ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। আল্লাহর রাসূল (সা.) তাদেরকে নিজের আপনজনের মত ভালোবাসতেন, স্নেহ করতেন, নিজের আহারে তাদেরকে শরীক করতেন। শায়খুল মাশাইখ হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর জীবনাদর্শ ও সামাজিক দর্শন ছিল আসহাবে সুফফার আদর্শের অনুরূপ। নিম্নে তাঁর জীবনাদর্শ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো :

১. অবিবাহিত জীবন যাপন

দার পরিগ্রহ করে সংসার করা হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর পক্ষে সম্ভব হয়নি। ভোগ-লালসা, কামনা-বাসনাকে জয় করে আজীবন অবিবাহিত থেকে তিনি মানবতার সেবা করে গেছেন। তিনি কেবলমাত্র যিকির-আযকার, নামায-রোযা প্রভৃতি ইবাদতে সার্বক্ষণিক নিয়োজিত থাকতেন না। আদম সন্তানের কল্যাণ কামনায় এবং তাদের দুঃখ মোচনে তার সময় ব্যয় হতো। বিয়ে-সাদীর চিন্তা-ভাবনা করার মতো সময় তাঁর ছিল না। যদিও তিনি সংসার বিরাগী দরবেশ ছিলেন তবুও তিনি মানব সংসার থেকে দূরে ছিলেন না।

২. সমাজ সেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ

হযরত শাহজালাল (রহ.) ও তাঁর সাথী আউলিয়াগণ প্রয়োজনে তরবারি ধারণ করেছেন, জঙ্গল কেটেছেন, কূপ খনন করেছেন, খাল কেটেছেন, রাস্তা তৈরি করেছেন। তখনকার দিনে সিলেটের অধিকাংশ অঞ্চল জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। অত্যাধিক বৃষ্টিপাতের জন্য গাছ-গাছড়া অতি দ্রুত বৃদ্ধি পেত। সমতল ভূমিতে গাছপালা এত বেশি ছিল যে, সে অঞ্চলকে অরণ্য ভূমি বলে মনে হতো। রাজা গৌড় গৌবিন্দের আমলে রাজধানীও বন বলে মনে হত। গাছপালা কেটে বনভূমি আবাদ করা খুব সহজসাধ্য ছিল না। যারা শহর থেকে দূরে থাকতেন তাদেরকে বাঘ, শুকর ইত্যাদি বন্য জানোয়ার, সাপ, বিচ্ছু

ইত্যাদির সাথে সংগ্রাম করে টিকে থাকতে হতো। হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর সাথীরাও শহর আবাদকারী ভূমিতে না থেকে পাহাড়িয়া অঞ্চলে বসবাস করতেন। পাহাড়ের উপর খানকা স্থাপন, চারিদিকে লোকালয় স্থাপনের চেষ্টা করেন এবং স্থানীয় লোকদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করতেন।

বন-জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করায় হিংস্র প্রাণী তথা বাঘ, ভল্লুক, বন্যহাতী, সাপ, বিচ্ছু প্রভৃতি জীবজন্তু লোকলয় থেকে দূরে সরে যায়। স্থানীয় জনসাধারণ হিংস্র জানোয়ারের কবল থেকে রক্ষা পেয়ে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে। বাঘের আক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে কৃতজ্ঞ মানুষ ফকির-দরবেশদের পদতলে আশ্রয় নিত।

৩. অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে জিহাদ করা

অন্যায়-অত্যাচার, অবিচার-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর জীবনের অন্যতম ব্রত ছিল। নিপীড়িতদের ক্রন্দনে তাঁর দরদী প্রাণ ব্যথিত হয়ে উঠত। তিনি সর্বদাই দুর্বল এবং সহায়-সম্বলহীনের পক্ষ নিতেন। প্রাথমিক জীবনে তিনি বাঘিনীর আক্রমণ থেকে এক অসহায় হরিণ শাবককে রক্ষা করেছিলেন। ইয়ামানের যুবরাজ শাহ আলী যখন রাজ্য রাজধানী এবং সিংহাসন ত্যাগ করে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর সাথী হতে চেয়েছিলেন তখন তিনি তাঁকে উৎসাহিত করেননি; বরং বার বার নিষেধ করেছেন এবং রাজ্য সিংহাসনে বসে মানুষের মধ্যে ইনসাফ কায়েমের পরামর্শ দিয়েছিলেন।

রাজা গৌড় গোবিন্দ এবং রাজা আচক নারায়ণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মূল কারণও ছিল নিরীহ প্রজার প্রতি জালিম শাহির অমানুষিক জুলুম এবং নির্যাতনের প্রতিবিধান করা।

৪. নিরীহ জন্তু-জানোয়ার ও পশুপাখির প্রতি দয়ার ব্যবহার

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন "তোমরা জগদ্বাসীর প্রতি দয়ার ব্যবহার কর। আকাশ অধিপতি (আল্লাহ তা'য়ালা) তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।" যেহেতু স্বয়ং হযরত শাহজালাল (রহ.) উঁচু স্তরের দরবেশ হওয়ার সাথে সাথে অনেক বড় আলিমে দ্বীন তথা আল্লামা ছিলেন তাঁর সঙ্গি-সাথীরাও অনেক বড় বড় আলিম ছিলেন। বিধায় তাঁরা জীবকুলের প্রতি অশেষ সহানুভূতি প্রদর্শন করতেন।

হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর করুণা শুধুমাত্র মানুষের প্রতিই সীমাবদ্ধ ছিল না। নিরীহ বোবা জীব-জানোয়ারও তার দরদী মনের পরশ পেয়েছিল। সিলেটেরে জালালী কবুতর, গজার মাছ আজও তাঁর জীব প্রীতির স্বাক্ষর বহন করে। তিনি গাভী পালতেন এবং বেশিরভাগ রোযার ইফতার করতেন দুধ দ্বারা। অসীম দয়াপ্রবণ হওয়া সত্ত্বেও তিনি 'অহিংসা পরম সত্য' নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না, প্রয়োজন বোধে অস্ত্রধারণ করা কর্তব্য মনে করতেন।

৫. আধ্যাত্মিক শক্তির চরম উৎকর্ষ সাধন

সিলেট বিজয় শুধুমাত্র সামরিক শক্তির বলে হয়নি। সিকান্দর গাজী বাহুবলে সিলেট দখল করার চেষ্টা করে বার বার বিফল হন। হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর দূরদর্শিতা, বাস্তব বোধ এবং

আধ্যাত্মিক শক্তি সিলেট বিজয়ে অধিক কার্যকরী হয়। রাজা গৌড় গোবিন্দের যাদুবিদ্যা, হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর বুদ্ধিমত্তা, দূরদর্শিতা তথা আধ্যাত্মিক শক্তির নিকট সব কিছু ব্যর্থ হয়ে যায়। এ বিষয়ে ডব্লিউ হান্টার তাঁর 'স্ট্যাটিকটিক্যাল একাউন্ট অব আসাম' (সিলেট) গ্রন্থে বিস্তারিত লিখেছেন।

৬. সিলেট জেলার নওয়াবী সনদ প্রত্যাখ্যান এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে কসবে সিলেট (নিস্কর সিলেট) ঘোষণা

হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর কোন কোন জীবনীকার উল্লেখ করেছেন যে, বাংলার সুলতান হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর অলৌকিক ক্ষমতা বলে সিলেট বিজয়ের সংবাদপ্রাপ্ত হয়ে তাঁকে সম্মানিত করার জন্য সিলেট জেলার নওয়াবী সনদসহ একজন সম্মানিত আমীর সিলেট প্রেরণ করেন। নওয়াব প্রেরিত আমীর হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর বাসস্থান থেকে তিন মাইল দূরে শিবির সন্নিবেশ করেন এবং হযরত শাহজালাল (রহ.)-কে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে নওয়াবী সনদ গ্রহণ করতে সংবাদ পাঠান। হযরত শাহজালাল (রহ.) নবাব প্রেরিত আমীরের সাথে সাক্ষাৎ করেননি। আমীর হযরত শাহজালাল (রহ.)-কে সিলেট শহরের জায়গীরদারী গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। হযরত শাহজালাল (রহ.) তাতে অস্বীকৃতি জানান এবং আমীরের সাথে সাক্ষাৎ করতে অসম্মত হন।

হতভম্ব আমীর অগত্যা হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ লাভের অনুমতি প্রার্থনা করেন। তিনি তাতেও অস্বীকৃতি জানান এবং আমীরের সাথে সাক্ষাৎ করতে অসম্মত হন। অতঃপর উক্ত আমীর সিলেট শহরকে কসবে সিলেট বা নিস্কর সিলেট ঘোষণা করে প্রস্থান করেন।

৭. সহজ সরল জীবন-যাপন

ইবনে বতুতার বর্ণনায় দেখা যায় যে, তাঁর জীবন যাত্রা এবং আহার ছিল অত্যন্ত সাধারণ ধরনের। তিনি ৪০ বছর পর্যন্ত রোযা রেখেছিলেন এবং একদিন অন্তর একবার আহার করতেন। তাও ছিল নিজের গাভীর সামান্য দুধ। উপমহাদেশের প্রায় সব ওলী দরবেশের মাযার অত্যন্ত জাঁকজমক এবং আড়ম্বরপূর্ণ প্রকাণ্ড অট্টালিকা, মনোরম চাঁদোয়ার চাকচিক্য সমাহিত ওলীর অস্তিত্ব ঘোষণা করে। তবে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর মাযার এ সাধারণ নিয়মের বিরাট ব্যতিক্রম। তাঁর মাযার নিজাম উদ্দিন আউলিয়া, খজা মঈন উদ্দিন চিশতী, কুতুবউদ্দীন বখতিয়ার কাকী, বাহাউদ্দিন, যাকারিয়া (রহ.) প্রমুখের মাযারের ন্যায় জৌলুসপূর্ণ নয়। হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর মাযারের উপর কোন ছাদই নেই। সিলেট শহরের ১৮০ ডিগ্রী বৃষ্টিতে সারা বছর নিরাববরণ মাযারটি সিক্ত হয়। গ্রীষ্মের প্রখর ঘনবর্ষার বারিধারা, শীতের শিশির হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর মাযারের মাহাত্ম্য বিন্দুমাত্র ম্লান করতে পারেনি।

সামাজিক জীবনে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর প্রভাব

হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর ধার্মিকতা, সহজ সরল জীবন যাত্রার প্রভাব সিলেটের সামাজিক জীবনে অত্যন্ত গভীর। সিলেট জেলার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা অত্যন্ত সরল জীবন যাপন করে থাকেন। অবশ্য চা বাগানের উৎকর্ষের সাথে সাথে সামাজিক মর্যাদা এবং স্তরের বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। কোন

কোন আধুনিক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে ঐতিহ্যবাহী ধার্মিকতাও নেই, সেরূপ সরলতাও নেই। প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী পরিবারগুলোর জীবন যাত্রা এখনও সরল, অনাড়ম্বর এবং নৈতিকতা কেন্দ্রীক। নিম্নে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হলো :

১. কিস্তি টুপি

সিলেট জেলাবাসীদের সরল জীবন যাত্রার একটি ছোট উদাহরণ দেয়া যাক। এখানকার শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত লোকদের সাদা কাপড়ের (কিস্তি) টুপি পরতে দেখা যায়। বাংলাদেশের অন্যান্য জেলায় সাধারণত অশিক্ষিত ও দরিদ্রগণই কিস্তিটুপি পরে থাকেন। কিন্তু সিলেট জেলার অত্যধিক সমৃদ্ধশালী, সাধারণ শিক্ষিত, মার্জিত রুচিসম্পন্ন শরীফ লোকদেরকেও ঘরে-বাইরে, অফিস-আদালতে সর্বত্র একটি অতি পরিষ্কার ধবধবে সাদা কাপড়ের কিস্তি টুপি পরে চলাফেরা করতে দেখা যায়।

২. ধর্মপরায়ণতা

সিলেটবাসীরা সাধারণভাবে অন্যান্য জেলার অধিবাসীদের চেয়ে সম্ভবত বেশি ধর্মপরায়ণ। ক্ষমতা ও সম্পদের দাপটে মানুষদের সাধারণত অপরাধমূলক কাজে বেশি লিপ্ত হতে দেখা যায়। মদ ও নারী শক্তিশালী জমিদার তালুকদারদের সামাজিক সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ও বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সিলেট জেলার জমিদার বা ভূ-স্বামীদের সে বদনাম খুবই কম। হযরত শাহজালাল (রহ.)ও তাঁর সঙ্গি-সাথীদের শিক্ষা-দীক্ষা ও সর্বোপরি এসব অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে ধর্মপরায়ণতা এর প্রভাব বিস্তার লাভ করে আসছে।

৩. হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতি

সিলেটের সামাজিক জীবনে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর অন্যতম প্রভাব হচ্ছে, হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতির ক্ষেত্র। এটা অবশ্য সত্য যে, হযরত শাহজালাল (রহ.) হিন্দু রাজা গৌড় গোবিন্দকে পরাজিত করে সিলেটে মুসলিম আধিপত্য স্থাপন করেন। কিন্তু হিন্দুদের প্রতি তাঁর কোনরূপ ঘৃণা বা বিদ্বেষ ছিল না। রাজা গোবিন্দ অত্যাচারী রাজা ছিলেন। তার অত্যাচারের শিকার শুধু বুরহান উদ্দীনের ন্যায় মুসলিমরাই ছিলেন না, অনেক হিন্দুরাও ছিল। গোবিন্দের পরাজয়ে অধিকাংশ হিন্দুই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। উল্লেখ্য, হযরত শাহজালাল (রহ.) হিন্দু ধর্মে আঘাত দেননি। তিনি কোন হিন্দুকে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করেননি। তাঁর কাছে হিন্দু মুসলিম সকলেই ছিল আদম সন্তান।

দীনকান্ত চক্রবর্তী সাহিত্য সিন্দু লিখেছেন, "পীর শাহ জালাল (রহ.)-এর গুণগানে বিমোহিত হইয়া বহু হিন্দু ইসলামের আশ্রয় গ্রহণ করিল। গোবিন্দ দেবের আত্মীয়-স্বজনও স্বধর্ম পরিত্যাগ করিল, এমনকি লাউড়ের ব্রাহ্মণ রাজ পরিবার ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়া অতঃপর রাজার স্থলে রোজা উপাধিতে সম্মানিত হইলেন।"[৩৩৮]

৩৩৮. শ্রী চক্রবর্তী সাহিত্য সিন্দু দীনকান্ত, *পীর শাহ জালাল, মাসিক শ্রী ভূমি* (করিমগঞ্জ : শ্রীভূমি কার্যালয়, ভাদ্র ১৩২২ বাংলা), পৃ. ৩১১-৩১২

Dhaka University Institutional Repository

সুরেন্দ কুমার দাস চৌধুরী লিখেছে, "হযরত শাহজালাল এবং তদীয় অনুসঙ্গীদের মধ্যে কেহ তখনও কোন অবস্থায় হিন্দুদের দেবীর প্রতি কোনরূপ অন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায় নাই। শ্রীহট্ট বিজয় অসি সাহায্যে সুসম্পন্ন হয় নাই। পাশবিক বল প্রয়োগের কোন নির্দশন কোথাও নাই। হযরতের অনুসঙ্গীরা প্রায়শ নির্জন ভূমিতে বাস করিয়া ইসলাম রূপ করতঃ কালাতিপাত করিয়াছিলেন। তাহারা নিজ নিজ তপসিদ্ধির প্রভাবে শত্রু হৃদয় জয় করিয়া বিনা রণে বিনা রক্তপাতে শ্রীহট্টে ইসলামের বেজয়ন্ত্রী উড্ডীন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।"[৩৩৯]

সিলেট জেলার হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির প্রধান কারণ হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর আদর্শ এবং শিক্ষা। তাঁর সঙ্গীরা যেখানেই গিয়েছেন মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখেছেন। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে ভালোবেসেছেন। সাধারণত দেখা যায়, যারা অন্ধভাবে ধর্মাসক্ত তারা অনেক ক্ষেত্রে পরধর্ম অসহিষ্ণু। এর কারণ ইসলামের সত্যিকার আদর্শ সম্বন্ধে তারা সুপরিচিতি নয়।

হযরত শাহজালাল (রহ.) ইসলামের আদর্শে শুধুমাত্র বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি ইসলামী আদর্শকে বাস্তব জীবনে রূপায়িত করে দেখিয়েছেন। তাঁর আদর্শ এবং শিক্ষাই যে সিলেটের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মূলিভূত কারণ তা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ক্ষেত্রে সিলেট জেলা এ উপমহাদেশের এক গৌরবময় আদর্শ স্বরূপ।[৩৪০]

সামাজিক জীবনে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর প্রভাব অপরিসীম। তিনি সুন্নাতে নববীর পূর্ণ অনুসারী এক মহান মনীষী ছিলেন। আধ্যাত্মিক জগতের উচ্চতর স্তরের একজন কামিল শায়খুল মাশাইখ ছিলেন। 'তরীকত বযুজ খিদমতে খলক নিছত' অর্থাৎ তরীকত সৃষ্টির সেবা ছাড়া কিছু নয়– আল্লামা শায়খ সাদী (রহ.)-এর এ চিরন্তন বাণী অনুসারে তিনি নিজে এবং তাঁর সঙ্গি-সাথীদেরকে জনসেবার জন্য উৎসর্গ করতে শিক্ষা ও দীক্ষা দিয়েছেন। যার বাস্তর প্রমাণ শত শত বছর পর আজও তাঁর এ খিদমত বদান্যতা জনশ্রুতি হিসেবে মানবের স্মৃতি কোটায় স্বর্ণাক্ষরে ভাস্বর হয়ে আছে। ইসলাম ও মানবতার সেবায় নিবেদিত প্রাণ হযরত শাহজালাল (রহ.) ও তাঁর সঙ্গি-সাথীদের সুদূরপ্রসারী কার্যক্রম যুগ যুগ ধরে আমাদের সামাজিক জীবনে উত্তম আদর্শ হিসেবে প্রভাব ফেলবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

---

৩৩৯. সুরেন্দ্র কুমার দাস শ্রী চৌধুরী, *শাহজালালের মাটি* (শ্রীহট্ট : শ্রী কনীন্দ্র চন্দ্র সা কুন্টি চাঁদ প্রিন্টিং ওর্য়াক, ১৩৪৪ বাংলা), পৃ. ৩৩

৩৪০. এ. জেড. এম শামসুল আলম, *হযরত শাহ জালাল কুনিয়াভী (রহ.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম পরিচ্ছেদ

হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর বিদায় ভাষণ

হযরত শাহজালাল (রহ.) তাঁর খলীফাদেরকে আহ্বান করে বললেন, মনে রাখবে, আল্লাহ তা'য়ালা এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোন শরীক নেই, তিনি বিশ্বজাহানের পালনকর্তা। আমাদের একমাত্র রব তিনিই। হযরত মুহাম্মদ (সা.) সৃষ্টির সেরা মানুষ। তাঁর কারণেই মহান আল্লাহ তা'য়ালা এ জাহান তথা সমগ্র জগৎ সৃজন করেছেন। মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত। সমস্ত কিছু মানুষের উপকারের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছ।

স্মরণ রাখবে, মানুষ সম্মানিত, তাই কোন অবস্থায় মানুষকে অবহেলা করা চলবে না। মানুষকে ঘৃণা বা অবহেলা করলে বা মানুষের মনে আঘাত দিলে তার ইবাদত মহান আল্লাহ তা'য়ালা কবুল করবেন না। হোক সে বেদ্বীন, বিধর্মী বা কাফির, মুশরিক। মনে রাখতে হবে, সবাই আল্লাহ তা'য়ালার সৃষ্টি, আর সৃষ্টির সেরা হচ্ছে মানুষ।[৩৪১]

মনে রাখতে হবে, সব মানুষের দিল খুবই পবিত্র জায়গা। কারণ, ঈমানদারের দিলের মাঝে মহান আল্লাহ বিরাজ করেন। তাই অমূলক ও ভ্রান্তধারণা হতে মন বা দিলকে সব সময় পবিত্র রাখতে চেষ্টা করবে। দিলের পরিচ্ছন্নতা যতই সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে হাসিল করতে পারবে ততই তুমি মহান আল্লাহর প্রিয় পাত্র হতে পারবে। তোমার উপর বর্ষিত হতে থাকবে মহান আল্লাহর অপার করুণা ধারা। আর যদি মনের ভ্রান্ত কল্পনার আবর্জনার স্তূপ পরিষ্কার করতে না পার তাহলে তোমরা নিজেরাই দেখবে যে অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছ। তোমাদের উপর হতে মহান আল্লাহর করুণাধারা বহুদূরে চলে যাবে। তোমাদের যদি এ অবস্থা হয় তাহলে কেমন করে তোমরা অপরকে সরল-সঠিক পথের দিশা প্রদান করবে।

মনে রেখ, পরকাল সাজাবার দায়িত্ব তোমাদের নিজেদের উপরই নির্ভর করছে। আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের বিবেক-বুদ্ধি দান করেছেন। এ অবস্থায় ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ বিচার করতে ব্যর্থ হও তবে তোমরাই বিপাকে পড়বে, অপর কারো কিছুই যাবে আসবে না।

মনে রেখ, মানুষ পাপ ও সওয়াবে বিজড়িত। গুনাহগার বলে কখনও কোন মানুষকে অবহেলা করো না। সুবহে সাদিক উদয় হলে যেমন রাতের আঁধার দূর হয়ে যায়, তেমনি আল্লাহর ওলীদের সাহচর্যে পাপিও কামেল ঈমানদারে পরিণত হতে সময় লাগে না। সেজন্য এটাও বিচিত্র কিছু নয় যে, তোমাদের সাহচার্য লাভ করে কোন পাপী ও বেদ্বীন পুণ্যাত্মা এবং ঈমানের নূরে নুরানী হতে পারে। আর এ প্রকার হলে তুমি বড়ই ভাগ্যবান বলে বিবেচিত হবে। তা হলে মহাবিচারের আদালতে ঈমানের পরীক্ষায় পাশ করে তুমি তাঁর নজরে প্রিয় পাত্র হিসেবে পরিণত হতে পারবে।[৩৪২]

তিনি বললেন, মানুষে ভেদাভেদ তৈরি ইসলামে অমার্জনীয়। সব মানুষকে তাই সম্মানের চোখে দেখবে। অনাথ, অসহায় মানুষদের প্রতি সর্বদা সদাচরণ করবে। ভুলেও তাদের সাথে খারাপ আচরণ

৩৪১.মাওলানা সৈয়দ মোঃ মিজানুর রহমান, *হযরত শাহজালাল ও শাহ পরান (র.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭

৩৪২.আলহাজ মাওলানা শহীদুল ইসলাম, *হযরত শাহজালাল (রহ.) ও শাহ পরান (রহ.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮

Dhaka University Institutional Repository

করবে না। অভাবী মানুষদের অভাব দূর করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। তাদেরকে দু' মুঠো ভাতের ব্যবস্থা করে দিতে পারলে তো খুবই উত্তম। তা যদি না পার তা হলে তাকে কাছে ডেকে বসিয়ে একটি সুন্দর সমাধান করে দিবে যাতে সে কোন কিছু করে তার জীবিকা নির্বাহের একটি পথ খুঁজে বের করতে পারে। এ প্রকার আচরণটুকু করতে পারলে বুঝবে যে, তুমি তার প্রতি যথেষ্ট মেহেরবান।

মনে রাখবে যে, পাপ– তা যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, তা পাপই। ক্ষুদ্র বলে কোন পাপকেই অবজ্ঞা করা যাবে না। মহাবিচার দিবসে এক যাররা পরিমাণ পাপের জন্য পাপীকে অকল্পনীয় শাস্তি ভোগ করতে হবে। অতএব সাবধান! যত ছোটই হোক না কেন কখনও পাপের পথে পা বাড়বে না। একথা ভালো করে মনে রাখবে যে, বিন্দু বিন্দু পানির সমষ্টিই একদিন মহাসাগরের সৃষ্টি করে থাকে অনুরূপ ছোট ছোট পাথর বা বালিকণার দ্বারাই বিরাট পাহাড়ের সৃষ্টি হয়।

প্রিয় বৎসরা! আমি আজ তোমাদেরকে কতগুলো মৌলিক কথা বললাম, এ কথাগুলো কিন্তু কিছু নতুন কোন কথা নয়। এসব কথা আগেই তোমাদেরকে বলেছি। একবার নয়, বহুবার বলেছি। তবু আবার তোমাদের স্মরণের জন্য সে কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করলাম। আমার মনে হয়, দ্বিতীয়বার আর আমি তোমাদের সামনে এ কথাগুলো বলার সুযোগ নাও পেতে পারি।

এ পর্যন্ত বলার পর হযরত শাহজালাল (রহ.) আকাশের দিকে তাকিয়ে উচ্চ আওয়াজে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দিলেন। তাঁর সাথে সাথে মুরীদেরাও উচ্চ আওয়াজে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দিয়ে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলল। এরপর হযরত শাহজালাল (রহ.) দুই হাত উত্তোলন করে মুনাজাত করলেন।

হে পরওয়ারদেগার আলম! তুমি বিশ্বজগতের প্রতিপালক, পালনকর্তা ও রিযিকদাতা। তুমি ইবাদত পাওয়ার একমাত্র উপযুক্ত। আমাদেরকে সরল সঠিক পুণ্যপথে পরিচালিত কর। হে দয়াময়, ক্ষমার অধিকর্তা! আমাদের ছোট-বড়, জ্ঞাত-অজ্ঞাত, জানা-অজানা যাবতীয় পাপরাশি ক্ষমা করে দাও। আমার বিগত দিনের পাপ ক্ষমা করে দাও। আমি যেন আগামী দিনে আর পাপে লিপ্ত হতে না পারি এর তাওফীক দান কর। আমরা যাবতীয় গুনাহ হতে তাওবা করছি। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

হযরত শাহজালাল (রহ.) তাঁর শাগরিদদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি কখনও হয়তো তোমাদের সামনে এমন কথা নাও বলতে পারি। হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর মুখে এমন কথা শ্রবণ করে তাঁর মুরীদেরা একে অপরের মুখের দিকে চাইতে লাগল। কারো মুখে কোন কথা বের হলো না। মুনাজাত শেষ হলে সবাই বলাবলি করতে লাগল, তবে কি হুযূর আমাদেরকে ছেড়ে চলে যাচ্ছেন! তিনি কি আমাদের কাছ হতে চির বিদায় নিচ্ছেন! যদি তাই হয় তাহলে আমাদের অবস্থা কী হবে? সবার চোখ অশ্রুতে টুইটুম্বর। বিশেষ করে হযরত সাইয়্যিদ নাসিরুদ্দীন (রহ.) সিপাহসালার তো কেঁদে কেঁদে ব্যাকুল। তিনি পরিষ্কারভাবেই উপলব্ধি করলেন যে, হুযূর আর বেশিদিন আমাদের মাঝে অবস্থান করবেন না। তাঁর জীবনকাল শেষ হয়ে এসেছে প্রায়। মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে যে মিশন দিয়ে প্রেরণ করেছিলেন তা সমাপ্ত হয়ে গেছে। তাই তিনি এমন কথা বলছেন।[৩৪৩]

৩৪৩.প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮-১৪৯

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম পরিচ্ছেদ

হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর প্রাণ বিয়োগ

১৩৮৪ খ্রিস্টাব্দ। যিলহজ্জ চাঁদের ২০ তারিখ পবিত্র জুমাবার হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর শরীর খুব দুর্বল অনুভূত হতে লাগল। আগের দিন বৃহস্পতিবার তিনি সারাদিন আগত ভক্ত-অনুরক্তদের সাথে সাক্ষাৎ দান করলেন। দিবাভাগে সবাইকে জমা করে আবেগময় ভাষায় শেষ ও বিদায় ভাষণ দান করলেন। তারপর আস্তানায় বৈঠককে বিশেষ বিশেষ লেকাদেরকে বিশেষভাবে নসিহত প্রদান করতে লাগলেন। দিন শেষ হয়ে রাত হয়ে গেল। ক্রমে রাত বাড়তে লাগল। হঠাৎ করে হযরত শাহজালাল (রহ.) সবাইকে তাঁর আস্তানা ছেড়ে বাইরে যেতে নির্দেশ দিলেন।

হযরত শাহজালাল (রহ.) বিছানা হতে উঠে পড়লেন। আপন হুজরায় অন্যান্য রাতের মতো প্রবেশ করলেন। হুজরায় প্রবেশের পূর্বে তিনি তাঁর বিশেষ খাদেমকে বললেন, কেউ যেন তাঁকে না ডাকে এবং তাঁর হুজরায় প্রবেশ না করে। হুজরায় প্রবেশকালে তিনি নিজ হাতে তাঁর হুজরার দ্বার বন্ধ করে দিলেন। হুজরার আলো নিভেয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি মহান আল্লাহ তা'য়ালার ধ্যানে নিমগ্ন হলেন।

দ্বার রক্ষী হুজরার খানিক দূরে দাঁড়িয়ে সারারাত কাটিয়ে দিল। মুহূর্তের জন্যও সে নিদ্রা গেল না। রাতের প্রথমার্ধে খাদেম হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর যিকিরের শব্দ শুনতে পেল; কিন্তু আওয়াজ ছিল সামান্য ক্ষীণ ধরনের। রাতের শেষার্ধে এ ক্ষীণ শব্দ আর শোনা যাচ্ছিল না। খাদেম ভাবল, হুযূরের শরীর দুর্বল তাই হয়তো তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন, সেজন্য যিকিরের শব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না।

রাত শেষ হয়ে গেল। সুবহে সাদিকের আলোর রেখা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। দিকে দিকে মসজিদের মিনার হতে মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে আযানের ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠছে জনপদ। ভোরের পাখিদের কলরবে মেতে উঠেছে চারিদিক। কিন্তু একি! এরকম ব্যতিক্রম তো আর হয়নি কোনদিন। হযরত শাহজালাল (রহ.) তো তাঁর হুজরার দরজা খুলছেন না। তিনি তো ঘুম হতে জেগে উঠছেন না। তাঁর নিদ্রা তো ভঙ্গ হচ্ছে না। তবে কি তিনি এখনো গভীর নিদ্রায় বিভোর! খাদেম ভাবছে এমনটি কোনদিন দিখিনি। তবে কি হুযূরের অসুস্থতা বেড়ে গেল? রোগের প্রকোপে তিনি কি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন? কিন্তু তিনি তো যাওয়ার সময় রোগের প্রচণ্ডতা তেমন বুঝতে দিলেন না। তবে কী হলো! তবে কি আমাদের দুর্ভাগ্য নেমে এলো! এ প্রকার ইতস্তত ও সশংয়ের মাঝে খাদেম ধীরে ধীরে ভেজানো দরজা সামান্য ফাঁক করল। দরজা খুলে তো খাদেমের চক্ষু স্থির।

ভেড়ানো দরজা সামান্য ফাঁক করে দরজা খুলে তো খাদেমের চক্ষু স্থির। হযরত শাহজালাল (রহ.) বসা অবস্থায় নেই। চিৎভাবে শুয়ে রয়েছেন। তাঁর শরীরে কোন স্পন্দন নেই। হার্টবিট উঠানামা করছে না। তাঁর এ অবস্থা দেখে খাদেম ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না লিল্লাহির বলে বাইরে চলে এলেন।

Dhaka University Institutional Repository

সামান্য সময়ের ব্যবধানে বিরাট ব্যাপার ঘটে গেল।[৩৪৪] মাত্র দুই কি তিন ঘন্টা পূর্বেও তিনি তাঁর মুরীদদেরকে উপদেশ দিচ্ছিলেন; কিন্তু তিন ঘণ্টার পরে তিনি আর ইহজগতে বেঁচে নেই। খোদার মহিমা বুঝা বড়ই মুশকিল!

হযরত শাহজালাল (রহ.) মুজাররাদে ইয়ামানী (রহ.) ১৩৫৪ খ্রিস্টাব্দে সিলেটে আগমন করেন এবং ১৩৮৪ খ্রিস্টাব্দে জিলহজ্জ মাসের ২০ তারিখে ৬২ বছর বয়সে ইন্তেকাল করে তাঁর মাওলার দরবারে গমন করেন। তবে প্রত্যক্ষদর্শী ইবনে বতুতার লক্ষ্য অনুযায়ী হযরত শাহজালাল (রহ.) ৭৪৬ হিজরী সনে সিলেটে ইন্তিকাল করেন। এ বিষয়েও এখন আর কোন দ্বিমত নেই। তাঁর মৃত্যু প্রসঙ্গে কয়েকটি তারিখের ভ্রান্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন।

৬৫৫ হিজরী সনে (?) জনৈক নিজামউদ্দীন আহমদ রচিত 'রাহাতুল কুলুব' নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর ইন্তিকালের সময় হযরত ফরিদউদ্দীন গঞ্জেশকর (রহ.)ও উপস্থি ছিলেন।[৩৪৫] এই নিজামউদ্দীন আহমদ হযরত ফরিদউদ্দীন গঞ্জেশকর (রহ.)-এর একজন মরীদ ছিলেন।

১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে লাহোরের জনাব গোলাম সারওয়ার লিখিত 'খাজিনাতুল আসফিয়া' নামক গ্রন্থে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর মৃত্যু তারিখ ৬৪২ হিজরী সন বলে উল্লেখ আছে।

এলাহী বখশ প্রণীত 'খুরশীদ জাহান নামা'য় হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর মৃত্যু তারিখ ৭৩৮ হি. সনে বলে স্থির করা হয়েছে।

হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর ইন্তেকালের খবর দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল। খবরটি যার কানেই পৌঁছাল সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাই হায় হায় করে চিৎকার করে আত্মচিৎকার করে উঠল। যেন তারা তাদের একান্ত আপনজনকে হারাল। সিলেট তথা সারা বাংলাদেশে শোকের ছায়া নেমে এল। হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর মুরীদ, শাগরিদ, ভক্ত- অনুরক্তরা পিতা-মাতা মৃত শিশুর মতো জার জার করে কাঁদতে লাগল।[৩৪৬]

অসংখ্য মানুষের ঢল

হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর ইন্তেকালের সংবাদ শ্রবণ করে তাঁকে শেষবারের মতো এক নজর দেখার জন্য চতুর্দিক হতে জনতার ঢল নামল। সবার চোখই অশ্রুসজল। কারো মুখে কোন কথা নেই, সবাই যেন জীবন্ত মরা লাশ। নিস্তব্ধ নির্বাক! তাদের যেন দুঃখ রাখার জায়গা নেই।

পবিত্র জুমাবার। লাখো জনতার ভীড়। জুমার নামাযের পর সকলে মিলে মিশে তাদের পরম শ্রদ্ধেয় হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর কাফন-দাফন কাজ শেষ করলেন। যারা জানাযায় শরীক হতে

৩৪৪.হযরত শাহজালাল (রহ.) ও শাহ পরান (রহ.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০-১৭১

৩৪৫.ড. এম. এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস;* ড. আবদুল করিম, *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৭১ বাংলা : ত্রয়োদশ শতকে বাংলাদেশে মুসলমান সমাজ বিস্তার করে।

৩৪৬.আব্দুল করিম, শাহজালাল (রহ.), *বাংলাপিডিয়া*, ভার্ষন ২.০.০, প্রকাশকাল ২০০৬ খৃ.। পরিদর্শনের তারিখ : ১১ জুন ২০১১

Dhaka University Institutional Repository

সুযোগ পাননি, তারা এসে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর মাযারে পবিত্র ফাতেহা পাঠ করতে লাগলেন। দীর্ঘদিন পর্যন্ত এ রকম চলতে লাগল। আজো পর্যন্ত এ অবস্থা বিরাজমান। একটি বারের জন্যও তাঁর পবিত্র মাযার দর্শকশূন্য হয়নি।[৩৪৭]

হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর পবিত্র দরগাহ শরীফ

হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর আস্তানার হুজরার কাছেই জঙ্গল পরিবেষ্টিত একটি চোট টিলার শীতল ছায়াতলে তাঁর মৃতদেহ সমাধিস্থ হয়। পরবর্তী সময়ে এখানেই তাঁর সমাধি ও মাযার নির্মিত হয়। মাযারের সংলগ্ন একটি বড় সুন্দর জামে মসজিদ আছে। মাযার এবং মসজিদের দেওয়ালে সাঁটা শিলালিপিতে খুদিত মূল্যবান কিছু তথ্য জানা যায়। এগুলো পুরানো স্মৃতির আওতাভুক্ত। তাছাড়া হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর ব্যবহৃত কতগুলো আসবাবপত্র ও তাঁর কাঠের নির্মিত পাদুকা মাযার এর পাশে সযত্নে সংরক্ষিত আছে। এগুলো হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর পবিত্র স্মৃতি হিসেবে সম্মানের সাথে সংরক্ষিত করা হচ্ছে।[৩৪৮]

৩৪৭.প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩

৩৪৮.প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর অবদান

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে

রাজনীতি ইসলাম বহির্ভূত কোন নীতি নয়, রাজনীতি মানে রাজার নীতি নয়। রাজনীতি মানে নীতির রাজা। বর্তমান বিশ্বে রাজনীতিকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। ভাবা হচ্ছে, ইসলাম আর রাজনীতি এক জিনিস নয়, তা আলাদা আলাদা। এর ফলে একদিকে যেমন ধর্ম কোনঠাসা হয়ে পড়েছে। অপরদিকে রাজনীতিও প্রাণহীন অসার একটি কাঠামোতে পরিণত হয়ে গেছে। আজ প্রতিটি দেশে চরম অশান্তি, অরাজকতা, মারামারি, কাটাকাটি ও যুদ্ধ বিগ্রহ চলছে। আজকের রাজনীতির এ অবস্থার জন্য দায়ী হলো ধর্মকে রাজনীতি থেকে আলাদা করা। ধর্মহীন রাজনীতি মানুষের কোন কল্যাণ সাধন করতে পারে না। যে রাজনীতিতে ধর্মের কোন স্থান নেই সে রাজনীতি সেচ্ছাচারিতায় ভরপুর। একজন মানুষের স্বৈরাচারী হওয়ার ক্ষেত্রে ধর্মহীন রাজনীতিই এককভাবে দায়ী।

আধ্যাত্মিক সাধক হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর রাজনীতি ছিল পরিপূর্ণ ধর্মভিত্তিক ও আদর্শ ধারার রাজনীতি। তাঁর কাছে ধর্মই ছিল মুখ্য, রাজনীতি ছিল গৌণ বিষয়। তিনি ভালো করেই জানতেন যে, ধর্মের আবহে গড়া রাজনীতি দ্বারা মানুষের যে কল্যাণ সাধন করা যায়, ধর্মহীন রাজনীতি দ্বারা তা কখনই সম্ভব হয় না। তাই পবিত্র ইসলাম ধর্মের আলোকে তিনি রাজনীতি পরিচালনা করতেন। ইসলাম তথা আল্লাহর আইন তাঁকে যে নির্দেশ প্রদান করতো সে মোতাবেক তিনি রাজনীতি করে জনসাধারণের কল্যাণ বিধান করতেন।

অস্ত্রের শক্তি ও আধ্যাত্মিকতার সমন্বয় সাধন

আমরা একটু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে বুঝতে পারব যে, কোনরূপ রক্তক্ষয় ব্যতিরেকে কীভাবে সিলেট ও তরফ বিজয় হয়েছিল। সিকান্দার গাজীর পর্যাপ্ত সৈন্যবল থাকা সত্ত্বেও বেশ কয়েকবার সিলেট অভিযান করেও তিনি সফলতা লাভ করতে পারেনি। তার একমাত্র কারণ ছিল, তিনি শুধুমাত্র অস্ত্রের শক্তির উপর নির্ভর করেছিলেন। আধ্যাত্মিক শক্তির ধারে কাছেও তিনি ছিলেন না। এজন্য শুধুমাত্র সামরিক শক্তি তার কোন কাজে আসেনি। অতঃপর যখন সাইয়্যিদ নাসির উদ্দীন (রহ.) সেনাপতির দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেন এবং তাঁর সাথে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর মতো মহান আল্লাহর ওলীর আধ্যাত্মিক শক্তি একত্রিত হলো তখন সিলেট বিজয় তরান্বিত হলো এবং রক্তপাতহীনভাবে সিলেট মুসলমানদের অধীনে এলো। তাঁর প্রচেষ্টায় সিলেটে সর্বপ্রথম ইসলামী হুকুমত কায়েম হয়।[৩৪৯]

৩৪৯.অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, *আল-ইসলাহ*, বৈশাখ-আশ্বিন, ১৩৬৪ বাংলা, পৃ. ১৮-১৯

Dhaka University Institutional Repository

তারপরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করুন, হযরত শাহজালাল (রহ.) বিজিত সিলেটের শাসন ক্ষমতা কার হাতে অর্পণ করলেন? তিনি সে লোকের হাতে সিলেটের শাসন ক্ষমতা অর্পণ করলেন যিনি ধর্মে ও রাজনীতিতে সমভাবে পারদর্শী ছিলেন। তিনি ছিলেন সিকান্দার গাজী। তার ওফাতের পর হযরতের সঙ্গী নুরুল হুদা আবুল কেরামত সাইদী হোসেনীর উপর এ বিজিত ভূমির শাসনভার দেয়া হয়। এই নরুল হুদাই শ্রীহট্টে হায়দার গাজী নামে পরিচিত।[৩৫০] সে সময় সিলেটে অনেক বড় বড় রাজনীতিবিদ ছিলেন, হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর সাথেও রাজনীতিতে পরঙ্গম অনেকে ছিলেন; কিন্তু হযরত শাহজালাল (রহ.) তাদের কারও হাতে সিলেটের শাসনভার অর্পণ করেননি। এর একমাত্র কারণ ছিল, তারা রাজনীতিতে পারঙ্গম হওয়া সত্ত্বেও ধর্মের দিক দিয়ে অপরিপক্ক ছিলেন। তাই তিনি তাদেরকে শাসনক্ষমতার অযোগ্য মনে করেছিলেন।

আল্লাহর রাসূল (সা.) একদিকে যেমন ছিলেন নবী ও রাসূল, অন্যদিকে তিনি ছিলেন বিশ্বমানবের সর্বাধিনায়ক। ওহুদের যুদ্ধের সময় মক্কার কোরাইশরা যখন মদীনা আক্রমণ করতে আসে তখন আল্লাহর রাসূল মদীনার সকল জনগণকে ডেকে মসজিদে নববীতে বসেই পরামর্শ সভা করেন। খন্দকের যুদ্ধে যে সমস্ত মুজাহিদগণ আহত হয়েছিলেন তাদের চিকিৎসা মসজিদে নববীতে সম্পাদন করা হয়েছিল।

মদীনায় হিজরত করার পর আল্লাহর রাসূল (সা.) দেখলেন সেখানে কোন শাসন ব্যবস্থা নেই। গোত্র প্রধানরা যা বলে গোত্রের লোকেরা তাই পালন করে। এক গোত্রের লোক অপর গোত্রের নেতার নিদের্শ মেনে নিতে রাজি নয়। গোত্রে গোত্রে রেষারেষি, মারামারি লেগে থাকত। নবীজি (সা.) ভাবলেন, আল্লাহ না করুন, এ অবস্থায় যদি মদীনা বাইরের শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয় তবে একে রক্ষা করা কোনভাবেই সম্ভবপর হবে না। তাই মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় বসবাসকারী সকল জাতি যেমন, ইহুদী, খ্রিস্টান ইত্যাদি সকল শ্রেণির লোকদের আহ্বান করে মসজিদে নববীতে বসে পরার্মশ করলেন। এ পরামর্শ সভায় সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের সাথে অনেক বিষয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং সে অনুযায় কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়। পরামর্শ সভায় সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, নাগরিক অধিকার, দেশরক্ষা নীতি ইত্যাদি অনেক বিষয় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং সে অনুযায়ী কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়। পরামর্শ সভায় একটি চুক্তিপত্র প্রণয়ণ করা হয়, এতে সবাই স্বাক্ষর করেন। তা ছিল ধর্মনীতি ও রাজনীতির এক অপূর্ব সমন্বয়। মূলত উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে ধর্ম ও রাজনীতির মাঝে কার্যত কোন পার্থক্য নেই। কারণ, ধর্মের মূল উদ্দেশ্য জনতার আত্মিক উন্নতি বিধান করে তাকে শান্তি ও কল্যাণকামী করে গড়ে তোলা। কোন একজন অপর একজনের অনিষ্ট কামনা করবে না। সমাজের শান্তি বিনষ্ট করবে না। নিজের স্বার্থকে তুচ্ছ মনে করে অপরের স্বার্থকে বড় করে দেখবে এবং অন্যের মান-সম্মানে কখনও আঘাত হানবে না। এ সবইতো ধর্মনীতির মূল কথা। রাজনীতির উদ্দেশ্যও তাই

৩৫০.সৈয়দ মুর্তজা আলী, *হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮-১৯

Dhaka University Institutional Repository

নয় কি? তবে কিছুটা পার্থক্য আছে। আর তা হলো, প্রচলিত রাজনীতিতে মানুষের তৈরি করা আইনের রশি দ্বারা বেঁধে মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা হয়, আর ধর্মের প্রথম কাজই হলো, মানুষের আত্মার উৎকর্ষ সাধন করা, তারপর তাকে আইনের আওতায় এনে নিয়ন্ত্রণ করা। প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ আত্মার উৎকর্ষ সাধন না করে মানুষকে শুধু আইনের রশি দ্বারা বাঁধতে চাইলে তা ফলপ্রসূ নাও হতে পারে। অপরদিকে যদি ধর্মনীতির মাধ্যমে মানুষকে প্রথমে তার কুস্বভাব দূর করে আত্মিক উন্নতি সাধন করে আইন দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা হয় তবে তার দ্বারা আইন লংঘিত হবার সম্ভাবনা কম থাকে। অতএব, শুধু রাজনীতি একাকি যেমন স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় তেমনি শুধু ধর্মনীতিও একাকি স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। উভয় নীতির সম্মিলিত যে নীতি সে নীতিই পরিপূর্ণ নীতি। আর তাই ইসলামী এ নীতিকে পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা বলা হয়।

হযরত শাহজালাল (রহ.) ইসলাম ও রাজনীতির সমন্বয় সাধন করে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিলেন বলে সিলেট ও তরফ বিজয় যেরূপ সহজ হয়েছিল এর শাসন ব্যবস্থা পরিচালনাও তদ্রূপ সহজতর হয়েছিল। আজকের দুনিয়ার মতো তিনি যদি ধর্মকে শুধুমাত্র নামায রোযার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখতেন, শাসন ব্যবস্থা বা রাজনীতিকে পৃথক করে দেখতেন, তা হলে সিলেটের ইতিহাস আজ আলাদাভাবে লিপিবদ্ধ করা হতো। হয়তো বা সেখানে সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত ইসলাম তথা মুসলমানের প্রাধান্যও থাকতো না।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আর্থ-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে

রাজস্বমুক্ত সিলেট

হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর কারণে সিলেটকে রাজস্ব মুক্ত করা হয়। সিলেটকে রাজস্ব মুক্ত করার কারণ হলো–

হযরত শাহজালাল (রহ.) আগমনের পূর্বে বাংলাদেশে রাজস্ব প্রথা প্রচলিত ছিল। আর রাজস্ব খুবই কড়াকড়িভাবে আদায় করা হতো। হযরত শাহজালাল (রহ.) বাংলাদেশ আগমন করে সিলেট অঞ্চলকে অত্যাচারী এক বিধর্মী শাসকের হাত থেকে রক্ষা করে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা চালু করেন।

তখন থেকেই মুসলিম শাসনামল শুরু হয়। হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর সম্মানার্থে মুসলিম আমল থেকেই সিলেট শহর বা কস্‌বে সিলেট করমুক্ত অঞ্চল করা হয়।

কথিত আছে, দিল্লীর সম্রাট তাঁকে নবাবী প্রদান করে একটি সনদ পাঠান। হযরত শাহজালাল (রহ.) তা প্রত্যাখ্যান করেন এই বলে যে, তিনি সংসার বিরাগী ফকির, তাঁর নবাবীর প্রয়োজন নেই। এক পর্যায়ে সম্রাট তাঁকে সিলেটের জায়গীর গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। হযরত শাহজালাল (রহ.) তাতেও রাজি হননি। শেষে সম্রাট আলাউদ্দিন খিলজী হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করে সিলেট শহরকে রাজস্বমুক্ত বলে ঘোষণা দেন। এ কারণে আজো সিলেট শহরের ভূমি রাজস্ব থেকে মুক্ত। হযরত শাহজালাল (রহ.) পাণ্ডুয়া ও বাংলার অন্যান্য স্থানে বিস্তর সম্পত্তির অধিকারী হন। এ সম্পত্তি বাইশ হাজারী এস্টেট নামে পরিচিত। এ সম্পত্তি এখনো ফকার, মিসকিন ও দরিদ্রদের সাহায্যার্থে ব্যয় হয়। হযরত শাহজালাল (রহ.) অনেক সম্পত্তি ক্রয় ও অর্জন করেন। তবে নিজের সুখ সমৃদ্ধির জন্য কিছুই রাখেন নি; বরং তা শরীয়তের বিধান অনুযায়ী ওয়াকফ করে দেন। ইসলামের অর্থনৈতিক বিধানও একদা বাংলার যমিনেই হযরত শাহজালাল (রহ.) বাস্তবায়িত করে আমাদের জন্য আদর্শ রেখে যান। বাংলার যমিনই ছিল হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর অর্থনৈতিক প্রোগ্রামের উৎস। কুরআন-সুন্নাহ ছিল তার দিক নির্দেশক।

সিলেটবাসীর দীর্ঘদিনে দাবীর প্রেক্ষিতে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর সম্মানার্থে ১৯৮৬ সালের ২৫ আগস্ট 'শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করা হয়।[৩৫১] সুরমা নদীতে তাঁর নামে 'হযরত শাহজালাল' ব্রিজও চালু করা হয়েছে।

এছাড়াও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (ময়মনসিংহ) ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে 'শাহজালাল হল', ল্যান্ড অব শাহজালাল বিমান, শাহজালাল এক্সপ্রেস, এমনকি শহর-উপশহর, রাস্তা-ঘাট, দোকান

৩৫১. https://www.sust.edu/about/university-facts-acts ; on dated : 18.07.2019

Dhaka University Institutional Repository

প্রভৃতি কত কিছু যে এ মহান দরবেশের নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে তার ইয়ত্তা নে রাখে? চলাফেরার সময় ও দৈনন্দিন জীবনে হাজার হাজার মানুষ শাহজালাল (রহ.)-এর নাম স্মরণ করে এবং মনের অজান্তে হলেও তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকে।[৩৫২]

হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর ধর্মীয় ক্ষেত্রেই যে কেবল অবদান রয়েছে তা নয়, আর্থ-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও তাঁর অবদানও অনস্বীকার্য।

৩৫২.দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, *হযরত শাহজালাল (র)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ধর্মীয় ক্ষেত্রে

হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর ধর্মীয় ক্ষেত্রে অবদান অপরিসীম। সিলেট অঞ্চলে তাঁর মাধ্যমেই ইসলামের প্রসার ঘটে। হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর পিতার মৃত্যুর পর তাঁর মামা তাঁকে লালন-পালনের ভার নেন এবং তাঁকে শিক্ষা-দীক্ষায় বড় করে তুলতে লাগলেন। সৈয়দ আহমদ কবির (রহ.) তাঁকে ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান দেন এমনকি তাঁকে উচ্চ কামালিয়াতে পৌঁছার সবক দান করেন।

একদিন সৈয়দ আহমদ কবির (রহ.) তাঁকে এক মুষ্টি মাটি দিয়ে বললেন, ভারতবর্ষের দিকে বেরিয়ে পড় এবং যে মাটির সাথে এ মাটির সাথে এমনটি রূপ, রস, ঘ্রাণের সাদৃশ্য খুঁজে পাবে সেখানে এ মাটি ছড়িয়ে দিয়ে আস্তানা গাঁড়বে। হযরত শাহজালাল (রহ.) তাঁর মামার দেয়া মাটির সাথে সিলেটের মাটির অবিকল মিল পেলেন। হযরত শাহজালাল (রহ.) যখন শ্রীহট্ট বর্তমান সিলেটে স্থায়ী কিয়ামগা বা আস্তানা নির্মাণ করলেন তখন সিলেটের অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ। কি মুসলমান কি অমুসলমান সকলেই অশিক্ষা কুশিক্ষার অমানিশার মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে। ব্যক্তি আচরণ, সামাজিক রীতি-নীতি বলতে তারা কিছুই জানত না।

স্থানীয় কিছু মুসলমান ধর্মাজ্ঞতার কারণে নানা কুসংস্কারে লিপ্ত ছিল। আচরণে অনেকটাই ছিল হিন্দুরীতি অনুরূপ। সিলেট তথা সারা বাংলাদেশের মুসলমানদের এমন নৈতিক ও ধর্মীয় অবনতির যুগসন্ধিক্ষণে বিজয়ী বীরনেতা ও আল্লাহর একজন মহান ওলী ও সমাজ সংস্কারক হিসেবে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর সিলেটে আগমন ঘটে। বাংলাদেশে তখনকার সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্মের এমন অধঃপতনের সময় তাঁর ন্যায় একজন ক্ষণজন্মা পুরুষের আবির্ভাব অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছিল। যেমনটি দেখা দিয়েছিল অন্ধকার যুগে আরবে মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাবের। হযরত শাহজালাল (রহ.) সিলেটে আগমন করে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে ইসলামের দিকে আহ্বান করলেন।

তাঁর আহ্বান ছিল অত্যন্ত মর্মস্পর্শী, ভাষা ছিল হৃদয়গ্রাহী, বাক্য ছিল অতিশয় স্পষ্ট। পরকালের বিভীষিকা ইত্যাদি বিষয় লোকেদেরকে সুন্দরভাবে বুঝাতে লাগলেন। ফলে ধর্ম ও শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে অবহিত হয়ে বিভ্রান্ত ও কুসংস্কারে লিপ্ত মুসলমানগণ সত্যিকারের পথের সন্ধান পেল। ধর্মের বিধি-বিধান, আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে অবহিত হয়ে ধর্ম পালনে তৎপর হয়ে উঠল। অপরদিকে অমুসলিমরা ইসলামের সাম্য-মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব এবং তাওহীদ তথা একত্ববাদের মর্মবাণী শুনে দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল। বিশেষ করে ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর পবিত্র হাতে বাইয়াত নিয়ে মুরীদ হয়ে মা'রেফাত তথা আল্লাহর প্রেম বিজ্ঞানে পারদর্শী ও উন্নীত হতে শুরু করল।

হযরত শাহজালাল (রহ.) এমনিভাবে অজ্ঞতার তিমিরে আচ্ছন্ন মানব সমাজকে দিয়েছেন নতুন আলোর পরশ। তুলে ধরেছেন তাদের সম্মুখে জ্ঞানের নতুন মশাল। ফলে শ্রীহট্টের সর্বশ্রেণির মানুষের বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে, তারা এতদিন কীভাবে মরীচিকার পিছনে দৌড়ালো শুধু শ্রীহট্টেই বা কেন

Dhaka University Institutional Repository

তিনি সারা বাংলাদেশের প্রতি জেলা, শহর, গ্রাম-গঞ্জ, প্রতিটি মহল্লা গলিতে এমনকি প্রতি ঘরে ঘরে ইসলামের অমৃত বাণীর অমূল্য আহ্বান পৌঁছে দেন।

হযরত শাহজালাল (রহ.) শ্রীহট্টে নিজের আস্তানায় থেকে সুযোগ্য সহচর খলীফাদের বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে দেন। তাঁরা প্রেরিত নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে ধর্ম প্রচার করতে থাকে এবং বিভ্রান্ত মানুষদেরকে শান্তির পথে আহ্বান করতে থাকে।

হযরত শাহজালাল (রহ.) যেমনি ছিলেন মহাজ্ঞানী, তেমনি ছিলেন অপূর্ব দার্শনিক। তাঁর দর্শন জ্ঞান দিয়ে বুঝতে পারলেন যে, ইসলাম শুধু নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, তাসবীহ-তাহলীলের মধ্যে সীমিত নয়। ইসলামের আদর্শ আরো ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। তাই তিনি ইসলামের ব্যাপক আদর্শ বিভিন্নভাবে সারা বাংলাদেশের মানুষের নিকট পৌঁছানোর জন্য কঠোর পরিশ্রম ও অক্লান্ত সাধনা করে গিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সামরিক ক্ষেত্রে

সিলেট বিজয়

হিন্দুস্তানের পূর্ব সীমান্তে পাহাড়, বন, নদী-নালায় ঘেরা প্রকৃতির রম্য নিকেতন সিলেট। এ সিলেটের টুলটিকর মহল্লায় বাস করতেন বোরহান উদ্দিন। তাঁর পুত্রের জন্মের পর আকিকা উপলক্ষ্যে গরু কুরবানী দেন। দুভার্গ্যক্রমে এক টুকরো গোশত একটি চিলের দ্বারা শ্রীহট্টে রাজা গৌড় গোবিন্দের মন্দিরে পতিত হয়। রাজা অনুসন্ধান করে বোরহান উদ্দিনের হাত কেটে দেন। সাথে সাথে নবজাত শিশুটিকেও হত্যা করে। বোরহান উদ্দিনের মনে প্রতিশোধের আগুন ধিক ধিক করে জ্বলতে থাকে। তিনি ব্যথিত চিত্তে গৌড় গমন করেন ও সুলতান শামস উদ্দিন ফিরোজ শাহের (১৩০১-১৩২২) নিকটে প্রতিকার প্রার্থনা করেন। তিনি আপন ভাগিনে সিকান্দার গাজীকে গৌড় গোবিন্দের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন।

সিকান্দার গাজী সোনার গাঁ থেকে পূর্ব দিকে রওয়ানা হয়ে সসৈন্য ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে উপস্থিত হলেন। এ স্থানে গৌড় গোবিন্দ তাঁকে আক্রমণ করলেন। কথিত আছে, গৌড় গোবিন্দ অগ্নিবাণ বর্ষণ করায় সিকান্দার গাজী পরাভূত হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এরপর সিকান্দার গাজী পরাভূত হয়ে দ্বিতীয়বার সৈন্য পরিচালনা করেও গৌড় গোবিন্দের আক্রমণে ব্রহ্মপুত্র নদী অতিক্রম করতে অসমর্থ হলেন।

তখন বর্ষাকাল, ভাটি অঞ্চলের এ প্রবল বর্ষার সাথে তুর্কি সৈন্যদের ইতিপূর্বে পরিচয় ঘটেনি। বর্ষার প্রকোপে সৈন্য শিবিরে নানা রোগ ছড়িয়ে পড়ল। কেউ কেউ মনে করল, হয়ত ভোজবাজির রাজা গৌড় গোবিন্দের যাদুর প্রভাবেই এ ভীষণ বর্ষা নেমেছে। অনেকেই ভীত ও নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ল। আক্রমণকারী সৈন্যগণ ছাত্রভঙ্গ হলো। পরবর্তী যুগে লিখিত 'বাহরিস্তানে ঘাইবী'তে দেখা যায়, ইসলাম খাঁর প্রেরিত সৈন্যবাহিনীর অধিনায়করা যুদ্ধে যাত্রা করার পূর্বে শুভদিন গণনা করে রওয়ানা হতো।

যাই হোক, সিকান্দার গাজী বার বার বিফল মনোরথ হওয়ায় সুলতান শামস উদ্দীন জ্যোতিষির স্মরণাপন্ন হলেন। জ্যোতিষগণ বললেন যে, কোন দরবেশের অধিনায়কত্ব ব্যতীত গৌড় গোবিন্দকে পরাজিত করার সম্ভাবনা নেই এবং উক্ত দরবেশের যে বর্ণনা তারা দিল তা সৈয়দ নাসির উদ্দিন সিপাহসালার-এর সাথে হুবহু মিলে গেল।

সিকান্দার গাজী তখন হযরত শাহজালাল (রহ.)ও তাঁর সাথীদের আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান হয়ে পুনরায় শ্রীহট্টের দিকে অভিযান করেন এবং সৈয়দ নাসির উদ্দিনকে এ সৈন্যবাহিনীর সিপাহসালার সেনাপতি করা হয়।

ইতোমধ্যে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর সাথে তিনশত এগারোজন দরবেশ অনুচররূপে যোগদান করেন। দরবেশ ও আউলিয়াদের শক্তিতে বলীয়ান এ বাহিনী বিনা বাধায় ব্রহ্মপুত্র নদী অতিক্রম করে কুমিল্লায় আসে। তৎপর হযরত শাহজালাল (রহ.) গৌড় গোবিন্দের রাজ্যের দক্ষিণ

Dhaka University Institutional Repository

সীমান্থিত নবীগঞ্জের নিকট চৌকি পরগণায় উপস্থিত হন। এখন থেকে হযরত শাহজালাল (রহ.) ও তাঁর সঙ্গীয় দরবেশসহ সৈন্যবাহিনী বাহাদুরপুরের নিকট বারাক নদীর দক্ষিণ তীরে উপনীত হলেন। গৌড় গোবিন্দ এ স্থানে নৌকা চলাচল বন্ধ করে দিয়েছিলেন। প্রবাদ আছে যে, হযরত তাঁর মৃগচর্মের জায়নামাযে বসে সাঙ্গপাঙ্গসহ নদী অতিক্রম করেন। অতঃপর তারা পূর্বদিকে যাত্রা করে শেখ ঘাটের দক্ষিণ দিকে বর্তমানে রেল স্টেশনের অদূরে সুরমা নদীর তীরে উপনীত হলেন। এখানেও গৌড় গোবিন্দ সুরমা নদীর তীরে খেয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। হযরত শাহজালাল (রহ.) পুনরায় তাঁর জায়নামাযে বসে নদী পার হলেন। ততক্ষণে গৌড় গোবিন্দের মনোবল ভেঙ্গে পড়ল। শামস উদ্দিন নাসির উদ্দিনের সাহায্যার্থে বিপুল সংখ্যক অশ্বারোহী ও সৈন্য প্রেরণ করেন। সম্ভবত এ বিপুল সৈন্যবাহিনীকে প্রতিরোধ করতে গৌড় গোবিন্দ সাহসী হন নাই। গৌড় গোবিন্দ তখন লৌহ নির্মিত এক ধনু শাহজালাল (রহ.)-এর নিকট এ বলে প্রেরণ করেন যে, যদি শাহজালাল বা তাঁর সঙ্গীরা কেউ এই ধনুকে শর যোজনা করতে পারে তবে তিনি বিনা যুদ্ধে শ্রীহট্ট ছেড়ে চলে যাবেন।

হযরত শাহজালাল (রহ.) তখন তাঁর সঙ্গীদের বললেন, "তোমাদের কেউ যদি জীবনে আসরের নামায কাযা না করে থাক তবে সে অগ্রসর হয়ে এস।" গোটা শিবির তালাশ করে পাওয়া গেল একমাত্র সিপাহসালার নাসির উদ্দিনকে। তিনি আল্লাহর নাম নিয়ে অবলীলাক্রমে লৌহ ধনুতে গুন যোজনা করলেন। গুনটানা লৌহ ধনু ফেরত পাঠানো হলো গৌড় গোবিন্দের কাছে। গৌড় গোবিন্দ ভীত হয়ে গড়দুয়ারের নিকট দুর্গপ্রাসাদে পালিয়ে গেলেন। হযরত শাহজালাল (রহ.) আল্লাহু আকবার আওয়াজ তুলতে তুলতে সসৈন্য সিলেট শহরে প্রবেশ করলেন। অর্থাৎ বিনা রক্তপাতে ৭০৩ হিজরী (১৩০৩ খ্রি.) সিলেট বিজয় করেন।

এ বিজয়ের তারিখ বঙ্গের সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের আমলের (১৫১২ খ্রি.) এক শিলালিপিতে পাওয়া যায়। শিলালিপিটি বর্তমানে ঢাকা যাদুঘরে রক্ষিত আছে। সিলেট শহরের আম্বরখানা মহল্লায় ১৫১২ খৃ. হোসেন শাহী শিলালিপি আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর সিলেট আগমনের সময় সম্বন্ধে ঘোরতর মতভেদ ছিল। এখন যে মতভেদ দূর হয়ে গেছে তা বলা যায় না। হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর জীবনী লেখকরা বিশেষ সময়েপ্রাপ্ত তথ্যাবলীর উপর নির্ভর করে নিজস্ব কল্পনা শক্তির সাহায্যে তাঁর সিলেট আগমনের সময় নির্ধারণ করেছেন।

১. হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর জীবনী রচয়িতা নাসির উদ্দিন হায়দারের মতে, ৫৬১ হিজরীতে (১১৬৫-৬৬ খৃ.) হযরত শাহজালাল (রহ.) সিলেট আগমন করেন। এবং সিলেটে ৩০ বছর অবস্থানের পর ৫৯১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, রাজা গৌড় গোবিন্দ কর্তৃক পরাজিত সেনাপতি সিকান্দার শাহ ছিলেন দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর ভাগ্নে।

আর এ তথ্যের জবাবে বলা যায়, মুন্সিফ নাসির উদ্দিন হায়দার কর্তৃক সন তারিখ সঠিক হতে পারে না। ১১৬৪ খ্রিস্টাব্দে (৫৬১ হি.) হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর সিলেট আগমনের তারিখ সত্য হলে বোরহান উদ্দিন কর্তৃক কোন বাংলার সুলতান বা দিল্লীর সুলতানের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করার প্রশ্নই উঠে না। কারণ, ১১৬৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতে মুসলিম আধিপত্য স্থাপিত হয়নি এবং মোহাম্মদ

Dhaka University Institutional Repository

ঘোরিও দিল্লী জয় করেননি। সুলতান মোহাম্মদ ঘোরি এবং মহারাজ পৃথিরাজের মধ্যে তরাইনের যুদ্ধ সংগঠিত হয় ১১৯১ এবং ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে, বখতিয়ার খিলজী নদীয়া জয় করেন ১২০১ খ্রিস্টাব্দে।[৩৫৩]

হযরত শাহজালাল (রহ.) সিলেট বিজয়ের সাল ১১৬৫ খ্রিস্টাব্দ (৫৬১ হি.) ধরে নিলে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর সাথে সিকান্দার গাজীর আগমন, শামসুদ্দীন ফিরোজশাহ অথবা শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ অথবা আলাউদ্দিন হোসেন শাহ বা অপর কোন গৌড় নৃপতির কাছে পুত্র শোকাতুর বোরহান উদ্দিনের সাহায্য প্রার্থনা অসম্ভব।

মুন্সিফ নাসির উদ্দিন হায়দার লিখেছেন যে, হযরত শাহজালাল (রহ.) দিল্লীতে নিজাম উদ্দিন আউলিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করেন। হযরত নিজাম উদ্দিন আউলিয়া সম্বন্ধে প্রামাণ্য ইতিহাস রয়েছে, তিনি ১২৩৬ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩২৫ খ্রি. (৭২৫ হি.) ইনতেকাল করেন। মুন্সীফ নাসির উদ্দিন হায়দারের বর্ণনা সত্য বলে ধরে নিলে আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হয় যে, হযরত নিজাম উদ্দিন আউলিয়ার জন্মের ৭১ বছর (১২৩৬-১১৬৫) পূর্বে তাঁর সাথে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ হয়।

নাসির উদ্দিন হায়দার হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর মাতুলের নাম উল্লেখ করেছেন সৈয়দ আহমদ কবির বলে। সৈয়দ আহমদ কবিরের পিতা হযরত সৈয়দ জালাল উদ্দিন সুরুখ বুখারী ৫৯৫ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। মাতামহের জন্মের ৩৪ বছর (৫৯৫-৫৬১=৩৪ বছর) পূর্বে পৌত্র কর্তৃক সিলেট বিজিত হতে পারে না।

উপরের আলোচনা থেকে এ বিষয় অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, নাসির উদ্দিন হায়দার কর্তৃক 'সুহেল-ই ইয়ামান' বর্ণিত সন তারিখ সত্য হতে পারে না। তবে এটা হতে পারে যে, নাসির উদ্দিন হায়দার শাহ বুরহান উদ্দিনের পূর্বপুরুষদের সিলেটে আগমনের তারিখেই হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর সিলেটে আগমনের তারিখ বলে ভুল করেছেন।[৩৫৪]

২. অনেকের মতে হযরত শাহজালাল (রহ.) ১৩৫১ এবং ১৩৫৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সিলেট আগমন করেন। নাসির উদ্দিন চেরাগে দিল্লী নামে এক দরবেশের উল্লেখ ইতিহাসে পাওয়া যায়। তার সম্বন্ধে Beale সাহেব লিখেছেন :

He is also called by Feristha Nasir Uddin Mahmud awardi, Surnamed Cherag-i Delhi or the candle of Delhi a celebrated Mohammedan saint who was a disciple of Shah Nizamuddin Aulia whom he succeeded on the Masnad of Murshid of spiritual Guide and died on Friday the 10th September 1365 A.D. the 8th Ramdhan 757 A.H. He is buried at Delhi in mausoleum which was biult before his death by sultan Firoz Shah Barbak one of his disciples and close to his tomb sultan Barbak was afterwards buried. He is the auther of a work called Khairul Majalis.[৩৫৫]

---

৩৫৩. এ. জেড. এম শামসুল আলম, *হযরত শাহ জালাল কুনিয়াভী (রহ.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭

৩৫৪. *আল-ইসলাহ*, শাহজালাল সংখ্যা, বৈশাখ-আশ্বিন ১৩৬৪ বাংলা, পৃ. ৬৪

৩৫৫. এ. জেড. এম শামসুল আলম, *হযরত শাহ জালাল কুনিয়াভী (রহ.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮

Dhaka University Institutional Repository

নাসির উদ্দিন চেরাগে দিল্লী সম্বন্ধে ঐতিহাসিক বদাউনি লিখেছেন যে, ফিরোজ তুঘলককে সিংহাসনে বসাবার ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত সন্দেহে নাসির উদ্দিন চেরাগে দিল্লীতে বন্দী করা হয় এবং ১৩৫১ খ্রিস্টাব্দে ফাঁসিতে নিয়ে যাওয়া হয়। খুব সম্ভব সুলতান ফিরোজ তুঘলক সিংহাসনে আরোহণের পর নাসির উদ্দিন চেরাগে দিল্লী মুক্তি লাভ করে এবং ১৩৫৬ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। ১৩৩১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩৫৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তাঁর বিশেষ কিছু জানা যায় না।

সিলেট প্রচলিত প্রবাদে শোনা যায় যে, সেনাপতি নাসির উদ্দিনের মৃত দেহ হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর অলৌকিক শক্তির প্রভাবে শূন্যে মিলিয়ে যায়। রজনী রঞ্জণ দেব মনে করেন যে, সুলতান ফিরোজ তুঘলকের নির্দেশে নাসির উদ্দিনের মৃত দেহ দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়। তাঁর ধারণা সুলতান ফিরোজ তুঘলকের বাংলা অভিযানকালে ১৩৫৩ খ্রিস্টাব্দে সৈয়দ নাসির উদ্দিন বাংলায় আগমন করেন। খুব সম্ভব ঐ সময়ে বাংলা ভ্রমণ কালে সৈয়দ নাসির উদ্দিন রাজা গৌড় গোবিন্দের বিরুদ্ধে সিকান্দার শাহকে সাহায্য করেন। উপরে বর্ণিত তথ্যের উপর ভিত্তি করে রজনী রঞ্জণ দেব নাসির উদ্দিন চেরাগে দিল্লীকে সিকান্দার গাজী এবং হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর সহযোগী বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং সিলেট বিজয়কাল ১৩৪৫-৫৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ধরে নিয়েছেন।

৩. পুরাতত্ত্ববিদ মোহাম্মাদ আশরাফ হোসেন সাহিত্যরত্ন মনে করেন যে, ১৩৫৪ সালে হযরত শাহজালাল (রহ.) কর্তৃক সিলেট বিজিত হয়। তাঁর সিদ্ধান্তের ভিত্তি সিলেট জেলার প্রচলিত প্রবাদ ও মুতাওয়াল্লী পরিবারের নিকট প্রাপ্ত একখানি প্রচারপত্র, রজনী রঞ্জণ দেবকৃত পুস্তক সুবিখ্যাত চিকিৎসক চক্রপানি দত্তের সিলেট আগমনের কল্পিত তারিখ এবং তাঁর নিজস্ব সাধারণ বুদ্ধি।

'চন্দ্রপক্ষ নেত্রবানে যে আঙ্ক হয়, সেই সনে খাই রাজা পাইল পরাজয়।' এর ব্যাখ্যা করে পাওয়া যায় ১২৩৫ শতাব্দ (১৩১৩ খ্রি.) আশরাফ হোসেন সাতিহ্যরত্ন মনে করেন যে, ১৩১৩ খ্রিস্টাব্দে গৌড় গোবিন্দ খাসিয়া রাজাকে পরাজিত করেন এবং তার দুই/এক বছর পূর্বে গৌড় গোবিন্দ সিংহাসনে আরোহণ করেন। গৌড় রাজ্য ছোট বিধায় সেখানে শান্তি স্থাপন রাজা গোবিন্দের ৫ বছর লাগার কথা নয়। তার মতে গৌড় রাজ্যে শান্তি স্থাপনে তিন বছরের অধিক প্রয়োজন হয়নি। তার ধারণা হযরত শাহজালাল (রহ.) সিলেট জেলার আগমনের এক বছর পর গৌড় গোবিন্দ শেষ বারের মত পরাজিত হয়ে রাজ্য ত্যাগ করেন। এ হিসেবে পুরাতত্ত্ববিদ মোহাম্মাদ আশরাফ হোসেনের মতে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর সিলেট বিজয়ের তারিখ দাঁড়ায় ১৩১২+৩+২৪+১৪+১=১৩৫৪ খ্রিস্টাব্দ।[৩৫৬]

পুরাতত্ত্ববিদ মোহাম্মাদ আশরাফ হোসেন মুতাওয়াল্লী পরিবারের নিকট থেকে প্রাপ্ত প্রচারপত্রের উল্লেখ করেছেন, তাতে লেখা ছিল– ১৮, ১৯, ২০ শে জিলহজ্ব ১৩৬৩ হিজরী মোতাবেক ১৯, ২০, ২১ শে কার্তিক ১৩৫১ বাংলা (১৯৪৪ খ্রি.) হযরত শাহজালাল মুজাররদ ইয়ামানী ৬২২ তম মৃত্যু বার্ষিকী উদযাপিত হলে মৃত্যুর সাল দাঁড়ায় ১৩২২ খ্রিস্টাব্দ (১৯৪৪-৬২২=১৩২২ খ্রি.) হায়দারের বর্ণনা ৩২ বছর বয়সে হযরত শাহজালাল (রহ.) সিলেট আগমন করেন, তা সত্য বলে মেনে নিয়েছেন। আশরাফ হোসেন সাহেব মনে করেন যে, ১৩২২ খ্রিস্টাব্দে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর মৃত্যু হতে পারে না।

---

৩৫৬. এ. জেড. এম শামসুল আলম, *হযরত শাহজালাল কুনিয়াভী (রহ.)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২

Dhaka University Institutional Repository

তা হবে তাঁর জন্ম সাল। তাহলে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর সিলেট বিজয়ের সাল দাঁড়ায় ১৩২২+৩২=১৩৫৪ খ্রিস্টাব্দে এবং এ সাল প্রচলিত গানের ছড়ায় প্রবাদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তিনি সিলেট ৩০ বছর আবস্থানের পর জান্নাতবাসী হন। ১৩৮৪ খ্রিস্টাব্দ W.W. Hunter এবং A. C. Allen সিলেট বিজয়ের সাল মনে করেছেন।

৪. সিলেটে প্রচলিত ছড়ায় দেখা যায় গৌড় গোবিন্দ ১৩৫৬ খ্রিস্টাব্দে পরাজিত হয়ে রাজ্য পরিত্যাগ করেন। পণ্ডিত রাজ চন্দ্র চৌধুরী গানের ছড়া এবং গোতুল রাজ গান সংগ্রহ করেছেন। এছাড়া এ গানগুলোর রচয়িতা পাগল ঠাকুর। ছড়ায় দেখা যায় ১২৩৫ শতাব্দী বা ১৩১৩ খ্রিস্টাব্দ গোবিন্দ সিংহ বংশোদ্ভূত খাসিয়া রাজাকে পুনিবিলে এক নৌযুদ্ধে পরাজিত করেন।

খাসিয়া রাজাকে পরাজিত করার পর ৫ বছর কাল রাজা গোবিন্দ রাজ্যে শান্তি স্থাপনে ব্যয় করেন। অতঃপর রাজা গোবিন্দ দুই যুগ ধরে শান্তিতে রাজত্ব করেন।

১৩১৩ খ্রিস্টাব্দে রাজা গৌড় গোবিন্দের সিংহাসনে আরোহণ, ৫ বছর শান্তি স্থাপনে ব্যয়, সুদীর্ঘ দু' যুগব্যাপী শান্তিতে রাজত্ব, ১৪ বছর ব্যাপী মুসলিম বাহিনীর সাথে সংগ্রাম কাল ইত্যাদি যোগ করে হয় ১৩১৩+৫+২৪+১৪=১৩৫৬ খ্রিস্টাব্দ।

৫. সুবিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ ডক্টর রাজেন্দ্র লাল মিত্রের মতে, হযরত শাহজালাল (রহ.) কর্তৃক গৌড়রাজ গোবিন্দ পরাজিত হওয়ার সাল ১৩৫৭ খ্রিস্টাব্দ। তাঁর মতের ভিত্তি ভাটেরার হোমের টিলার প্রাপ্ত প্রথম তাম্রফলক। বাংলা ১২৭৯ সালে শেখ কটাই নামক এক ব্যক্তি আট হাত মাটির নীচে দু'খানা তাম্রফলক পান। বাংলা ১২৭৯ সালে ডক্টর মিত্র ভাটেরায় প্রাপ্ত প্রথম তাম্রফলকের কেশব দেব এবং সিলেটের গৌড় গোবিন্দকে এক ব্যক্তি মনে করেছেন।

সিলেটর কোন কোন প্রবাদে দেখা যায়, রাজা গোবিন্দ এক যুগ শান্তিতে রাজত্ব করেন। কেশবদের এবং রাজা গোবিন্দকে এক ব্যক্তি ধরে নিয়ে ড. রাজেন্দ্র মিত্র মনে করেছেন যে, তাম্রফলক উৎকীর্ণ হওয়ার ১২ বছর পর হযরত শাহজালাল (রহ.) কর্তৃক রাজা গোবিন্দ পরাজিত হন। সে হিসেবে সিলেট বিজয়ের সাল দাঁড়ায় ১২৪৫+১২=১২৫৭ খ্রিস্টাব্দ।

৬. হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর জীবনী লেখকদের অনেকেরই ধারণা যে, হযরত শাহজালাল (রহ.) ১৩৮৪ খ্রিস্টাব্দে সিলেট বিজয় করেন। ১৩৮৪ খ্রিস্টাব্দে এ তারিখ নির্ধারণের খানিকাটা কারণ আছে। সিলেটে প্রচলিত কোন কোন লোক কথায় বলা হয় যে, সুলতান শামস উদ্দিনের আমলে সিকান্দার শাহ কর্তৃক সিলেট বিজিত হয়।

৭. সিলেট শহরের আম্বারখানা মহল্লায় শিলালিপি (১২৭৯ বাংলা) আবিষ্কারে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর সিলেট আগমন সময় সংক্রান্ত বিতর্কের উপর নতুন আলোপাত করেছে। এ শিলালিপি আবিষ্কারের পর পূর্বতন বহুতর্ক বিতর্কই মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। শিলালিপিখানার মূল অর্থ এবং ছবি এশিয়াটিক সোসাইটি জার্নালে প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালে। মি. E. H. E. Stapleton সর্বপ্রথম আম্বারখানা শিলালিপির উপর ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে Shaka Review-তে একটি প্রবন্ধ লিখেন। ফার্সী ভাষায় লিখিত আরবীর সমন্বয়ে এ শিলালিপিখানা বর্তমানে ঢাকা জাতীয় যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

Dhaka University Institutional Repository

সিলেট বিজয়ের ২৯৫ বছর পরে সুলতান হোসেন শাহের রাজত্বকালে ৯১৮ হিজরীতে শিলালিপিখানা আঙ্কিত হয়। তবুও এটাই হযরত শাহজালাল (রহ.) সম্বন্ধে সর্বপ্রাচীন দলীল। যে পর্যন্ত না এর আগেকার এবং অধিকতর নির্ভরযোগ্য কোন দলীল পাওয়া যায়। তাই এটাকে এ পর্যন্ত গ্রহণীয় দলীল ধরতে পারি। অন্তত একটুকু নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, সিলেট বিজয়ের সময় সম্বন্ধে এ শিলালিপির বর্ণনা সবচেয়ে কম প্রমাদপূর্ণ এবং অধিকতর নির্ভরযোগ্য। এ শিলালিপি সম্বন্ধে Stapleton লিখেছেন :

Thought not a contemperaious record, it giues almost certainly (both from the date as well as jeternal evidence) a truer version of the first nvasion of sylhet than traditions hither to been supplied to as. [৩৫৭]

শিলালিপির প্রদত্ত তারিখ স্থানীয় প্রবাদের সাথে অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ। স্থানীয় উপকথায় দিল্লীর সুলতান আলা উদ্দিন ঘোরী এবং আলা উদ্দিন ফিরোজ এবং বাংলার সুলতান শামস উদ্দিনের উল্লেখ দেখা যায়। ৭০৩ হি. (১৩০৩ খ্রি.) শামস উদ্দিন ফিরোজ শাহ (১৩০১-১৩২২) ছিলেন। বাংলার সুলতান আর আলা উদ্দিন খিলজী (১২৯৬-১৩১৬ খ্রি.) ছিলেন দিল্লীর সুলতান। সময়ের ব্যবধানে হয়ত সুলতান শামস উদ্দিন ফিরোজ শাহের নামের শেষাংশ সমকালীন খিলজী সম্রাট আলা উদ্দিনের নামের সাথে যুক্ত হয়ে আলা উদ্দিন ফিরোজ শাহে পরিণত হয়েছে। আর বাংলার সুলতানের নাম থেকে ফিরোজ শাহ বিচ্ছিন্ন হয়ে শামস উদ্দিন থেকে যায়। আলা উদ্দিন ফিরোজ শাহ ও দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শাহ তোঘলক কে এক ব্যক্তি কল্পনা করা যায় না। কারণ আলা উদ্দিন শব্দ ফিরোজ শাহ তোঘলকের নামের প্রথমাংশে ছিল না।

৭০৩ হিজরীতে সিলেট বিজয়ের সময়কাল হলে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর সাথে নিজাম উদ্দিন আউলিয়ার সাক্ষাৎ সময়ের দিক থেকে তা স্বাভাবিক এবং সম্ভব হয়। কারণ হযরত নিজাম উদ্দিন আউলিয়া (১২৩৬-১৩২৫/৭২৫ হি.) ৭০৩ হিজরীতে জীবিত ছিলেন।

শামস উদ্দিন ফিরোজ শাহ সোনারগাঁও এবং পূর্বাঞ্চল জয় করে ১৩০৫ খ্রিস্টাব্দে সোনার গাঁ থেকে এবং ১৩২২ খ্রিস্টাব্দে ময়মনসিংহের নিজামপুর থেকে স্বীয় নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলন করেন। ১৩০৪ খ্রিস্টাব্দের হোসেন শাহী মুদ্রা সিলেট শহরের কালিঘাট মহল্লায় অবস্থিত হয়েছে।

হোসেন শাহী শিললিপি আবিষ্কারের পর আধুনিক লেখকদের অনেকেই মনে করেন যে, সুলতান শামস উদ্দিন ফিরোজ শাহের আমলই ৭০৩ হিজরী। ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে সিকান্দার খান গাজী হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর সাহায্যে সিলেট জয় করেন।

সুলতান শামস উদ্দিন ফিরোজ শাহ দেহলভী সম্বন্ধে ঐতিহাসিক বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ করে এ সিদ্ধান্ত উপনীত হতে পারি যে, ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে (৭০৩ হি.) সুলতান শামস উদ্দিন ফিরোজ শাহের আমলেই তদীয় সেনাপতি সিকান্দার গাজী এবং নাসির উদ্দিন কর্তৃক হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর সাহায্য সিলেট বিজিত হয়।

---

৩৫৭. *জার্নাল অব দ্যা এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল* (কলকাতা, ১৯২২ খৃ.), পৃ. ৪১৩

Dhaka University Institutional Repository

তরফ বিজয়

তরফের শাসনকর্তা ছিলেন আচক নারায়ণ। তিনিও রাজা গোবিন্দের মতই মুসলমানদের উপর অত্যাচার ও নির্যাতন চালাতেন। তার স্বভাব-চরিত্রও রাজা গোবিন্দের মত ছিল। তিনি তার শাসনামলে তার রাজ্যে নুরুদ্দিন নামক একজন মুসলিম প্রজাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন। নুরুদ্দিনের অপরাধ ছিল তিনি গরু জবেহ করেছিলেন।

হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর সময়ে তরফ বিজয় করার জন্য তিনি সিলেট হতে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। যে জায়গায় আচক নারায়ণকে পরাভূত করার জন্য বাহিনী প্রেরণ করেন সে জায়গার নাম ছিল বিশগাঁও। তাদের প্রধান সেনাপতি ছিলেন সিপাহসালাহ সাইয়্যিদ নাসির উদ্দিন (রহ.)।

সিপাহসালাহ সাইয়্যিদ নাসির উদ্দিন (রহ.) তরফ বিজয়ের জন্য এক হাজার ঘোড়া সওয়ার ও তিন হাজার পদাতিক সেনা নিয়ে নদীপথে যাত্রা করেন। সিপাহসালাহ সাইয়্যিদ নাসির উদ্দিন (রহ.)-এর সাথে বারোজন দরবেশও ছিলেন। সিপাহসালাহ সাইয়্যিদ নাসির উদ্দিন (রহ.)-এর অভিযানের কথা শ্রবণ করে তরফের রাজা আচক নারায়ণ ভীত হয়ে পড়লেন। সামরিক শক্তি তার কম ছিল না। তথাপিও এ বিশাল বাহিনী ও তার সাথে সাধক দরবেশগণের আগমনে তার মনোবল ভেঙ্গে পড়েছিল। কারণ, ইতিপূর্বে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর সিলেট বিজয় ও রাজা গোবিন্দের শোচনীয় পরাজয়ের কথা তা অগোচরে ছিল না। রাজা গোবিন্দের সামরিক শক্তি কম ছিল না, তবুও তিনি পরাজিত হয়েছিলেন। কারণ, আধ্যাত্মিক শক্তির সাথে যুদ্ধ করে ময়দানে টিকে থাকা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং পরাজয় যখন অনিবার্য, অযথা যুদ্ধ করে জানমালের ক্ষতি করার কি প্রয়োজন। তাই প্রাণ ভয়ে রাজা আচক নারায়ণ সপরিবারে ত্রিপুরা রাজ্যে পালিয়ে গেলেন এবং সেখানেই আশ্রয় গ্রহণ করে দিনাতিপাত করতে লাগলেন।[৩৫৮]

বিনা যুদ্ধ ও বিনা রক্তপাতে মুসলমানদের হাতে তরফ বিজয় হলো। অত্যাচারিত, নির্যাতিত, নিপীড়িত সাধারণ জনতা আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে তরফের যমিনে হযরত সিপাহসালাহ সাইয়্যিদ নাসির উদ্দীনের সেনাবাহিনীকে স্বাগত জানান। ঘরে ঘরে উড্ডয়ন হলো ইসলামের বিজয় পতাকা।

যে তরফ এতদিন মুসলমান অধিবাসীদের কাছে নরক রাজ্য ছিল, সে তরফে আজ মুসলমান জনগণ সবচেয়ে বেশি খুশি। আজ তাদের জন্য আনন্দের দিন। আশীর্বাদস্বরূপ তরফে আগমন করেছেন। মুসলিম ক্ষমতা কার হাতে অর্পণ করেছিলেন তা জানা যায় নি।

দরবেশগণ হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর নির্দেশক্রমে তরফ এলাকাতেই অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। তারা তরফে আস্তানা গেঁড়ে জনসাধারণের মাঝে ইসলাম ধর্ম প্রচার-প্রসারের কাজ করেছিলেন। মানুষকে মানুষ হওয়ার সবক প্রদান করেছিলেন। শিরক বিদআত পরিত্যাগ করে মানুষকে এক আল্লাহর ইবাদতে আত্মনিয়োগ করতে উৎসাহ প্রদান করেছিলেন। এজন্য তরফকে এখনও বারো আউলিয়ার দেশ বলা হয়ে থাকে।

---

৩৫৮. সৈয়দ আব্দুল গফফার, *তরফের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬-৪১

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইসলামী সংস্কৃতির উন্নয়নের ক্ষেত্রে

হযরত শাহজালাল (রহ.) চতুর্দশ শতকের প্রথম দশকে তাঁর সঙ্গি-সাথীসহ সিলেটে আগমন করেন। ক্রমে সিলেটসহ বিভিন্ন অঞ্চলে উসলাম ধর্ম প্রচার লাভ করে, ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়। হযরত শাহজালাল (রহ.) ইসলামী সংস্কৃতি উন্নয়নে যখনি সুযোগ পেয়েছেন তখনি প্রতিষ্ঠা করেছেন মসজিদ, মক্তব, মাদ্‌রাসা ও অসংখ্য খানকাহ। এগুলোর মাধ্যমেই ইসলামী সংস্কৃতির উন্নয়ন সাধিত হয়। যার প্রমাণ হিসেবে নিম্নে কিছু মসজিদ, মাদ্‌রাসা ও খানকাহ-এর পুরাকৃতি স্থাপত্য তুলে ধরা হলো।

তরফ (লস্করপুর) মাদ্‌রাসা

প্রবাদ ছিলো, 'স্থানের নাম তরফ ঘরে ঘরে হরফ'। চতুর্দশ শতকের শেষার্ধে তরফ লস্করপুরে অনেকগুলো মক্তব ও মাদ্‌রাসা গড়ে উঠে। আরবী, ফার্সী এবং পবিত্র কুরআন, হাদীস এখানে শিক্ষা দেয়া হতো। তরফের শিক্ষিত আলিমগণ দিল্লীর বাদশাহ ও গৌড়ের সুলতানগণের গৃহ শিক্ষক নিয়োগ হতেন।

শামসুল উলামা, মুলূকুল উলামা, কুতুবুল আউলিয়া প্রভৃতি খেতাবধারী আলিম ও সূফীদের কর্মস্থল এই তরফ। সুদীর্ঘ চারশত বছর যাবত তরফ লস্করপুর ছিলো ইসলামী জ্ঞান চর্চার তীর্থ কেন্দ্র। তরফের মহাকবি সৈয়দ সুলতান নিজ পরিচয় দিতে গিয়ে এভাবে লিখেছেন :

"লস্করে পুরখানি আলিম বসতি
মুই মূর্খ আছি এক সৈয়দ সন্ততি।"

মুফতি মাদ্‌রাসা

সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে সিলেটের মুফতি পরিবারের মৌলভী জিয়া উদ্দিন এ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। সপ্তদশ শতকের প্রথম থেকে ১৮৩৭ সাল পর্যন্ত প্রায় ২০০ বছর এ মাদ্‌রাসা ফারসী ভাষার শিক্ষা কেন্দ্র ছিল। সে সময় রাষ্ট্রভাষা ফারসী থাকায় তার স্বতন্ত্র মূল্যায়ন ছিল। মাদ্‌রাসার ব্যয় নির্বাহতে সরকারীভাবে দিল্লীর সম্রাটগণ ৫৪২ হাল ভূমি লাখেরাজ দান করেন।

এ মাদ্‌রাসায় হিন্দু-মুসলমান সকলেই ফাসী ভাষা শিক্ষা করতেন। ১৮৩৭ সালে ফারসীর স্থলে রাষ্ট্রীয় ভাষা ইংরেজি হওয়ার ফলে মাদ্‌রাসাটি উঠে যায়। মাদ্‌রাসার জমিও বৃটিশ বেনিয়া সরকার দখল করে নেয়।

এভাবে সমগ্র দিল্লীর সালতানাতের হাজারো হাজারো দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও তার সম্পত্তি বৃটিশ তথা ইংরেজ সরকার তাদের আওতায় নিয়ে যায়। এবং সুপরিকল্পিতভাবে তা ধ্বংস করে ফেলে। দীনের ধারক বাহক প্রকৃত নায়িবে নবী উলামায়ে কিরাম ইংরেজদের হাতে নির্যাতিত ও নিপীড়িত হয়েও সীমাহীন ত্যাগ স্বীকার করে আজ পর্যন্ত মসজিদ, মক্তব, মাদ্‌রাসা ও খানকা নির্মাণে মুসলমানদের সার্বিক সহযোগিতায় টিকে আছে।

Dhaka University Institutional Repository

ফুলবাড়ী আজিরিয়া মাদ্‌রাসা

সিলেটের গোলাপগঞ্জ থানায় ফুলবাড়ীর মিরহাজরা বংশীয়গণ ফুলবাড়ীতে একটি মাদ্‌রাসা স্থপান করেন। এ মাদ্‌রাসা বহু বছর যাবত পূর্ব-উত্ত সিলেটে দ্বীনী ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। পরবর্তীকালে মৌলভী আজির উদ্দিনের নামে এর নামকরণ করা হয় 'আজিরিয়া মহিলা মাদ্‌রাসা'। ঊনবিংশ শতকের শেষে ও বিংশ শতকের প্রথম সিলেটের বড় বড় আলিমগণ এই মাদ্‌রাসার ছাত্র ছিলেন।

সূফী শিতালং ইবরাহীম ও মাওলানা শাহ ইয়াকুব বদরপুরী যিনি আল্লামা ফুলতলী সাহেব কিবলা ও আল্লামা মুশাহিদ (রহ.) দ্বয়ের পীর ও মুর্শিদ ছিলেন প্রমুখ আল্লামাগণ ফুলবাড়ী মাদ্‌রাসায় অধ্যয়ন করেন।

সৈয়দপুর শামছিয়া মাদ্‌রাসা

৩৬০ আউলিয়ার অন্যতম সৈয়দ শাহ শামসুদ্দীন বোগদাদী (রহ.)-এর স্মৃতি বিজড়িত গ্রাম সৈয়দপুর সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর থানায় অবস্থিত। সৈয়দপুরের শামছিয়া মাদ্‌রাসাটি প্রায় শতাধিক বছরের পুরনো। এই মাদ্‌রাসা অনেক জ্ঞানী-গুণী আলিম-উলামার জন্ম দিয়েছে। মাদ্‌রাসাটি বর্তমানে ফাজিল শ্রেণিতে উন্নীত। এছাড়া আল্লামা হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর আগমেন সেখানে আরেকটি কওমী (টাইটেল) মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ দু'টি মাদ্‌রাসায় সুশিক্ষার ফলে আজো বৃহত্তর সুনামগঞ্জের মধ্যে ইসলামী শিক্ষা ও আধুনিক প্রচলিত সাধারণ শিক্ষায় সৈয়দপুরের গ্রামে শিক্ষিতের হার অপরাপর সকল থানা ও উপজেলার মধ্যে শীর্ষে।

সৈয়দিয়া মাদ্‌রাসা, সিলেট

ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে হাজি সৈয়দ বতে মজুমদার মজুমদারীতে একটি মাদ্‌রাসা স্থাপন করেন। এটা সৈয়দিয়া মাদ্‌রাসা নামে খ্যাত। এ মাদ্‌রাসার প্রাধান শিক্ষক ছিলেন সোয়াতের অধিবাসী শামসুল উলামা আব্দুল ওহাব (১৮৫০-১৯২২)। দুর্লভপুরে কাজী মোহাম্মদ আহমদ সাহেবও এ মাদ্‌রাসায় কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। মজুমদারী ওয়াকফ স্টেট থেকে এ মাদ্‌রাসার ব্যয়ভার বহন করা হতো। পরবর্তীকালে এ মাদ্‌রাসাটি উঠে যায়।

জামেউল উলুম আলিয়া মাদ্‌রাসা, গাছবাড়ী

১৯০১ খ্রিস্টাব্দে মাদ্‌রাসাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৯ সালে মাওলানা আবু ইউসুফ ইয়াকুব সাহেব দিল্লী থেকে অধ্যয়ন শেষে গাছবাড়ী ফিরে আসেন এবং মাদ্‌রাসাটির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার আপ্রাণ চেষ্টায় জামাতে উলা খোলা হয়। পরবর্তীকালে আল্লামা মুশাহিদ বায়মপুরীর মাধ্যমে হাদীসের অধ্যাপনা শুরু হয়। এ মাদ্‌রাসা থেকে সিলেট ও সিলেটের বাইরে জেলাসমূহের অসংখ্য আলিম শিক্ষাগ্রহণ করেছেন।

গভর্নমেন্ট আলিয়া মাদ্‌রাসা, সিলেট

শতাব্দীর ঐতিহ্যে লালিত উপমহাদেশের অন্যতম ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্‌রাসা। এদেশে সরকারী ভিত্তিতে কোন আলিয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার দিক থেকে এটিই

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীন। অপর একমাত্র সরকারী আলিয়া মাদ্‌রাসা, মাদ্‌রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা, প্রথমত ১৭৮০ সালে কোলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৪৭ সালে ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। অথচ এর ৩৪ বছর পূর্বেই ১৯১৩ সালে 'সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্‌রাসা' প্রতিষ্ঠা পায়।

চতুর্দশ শতাব্দীতে সিলেট শহরের দরগাহ প্রাঙ্গণে স্থাপিত 'দারুল উহসান' ছিল তৎকালীন সময়ে শিক্ষা-সংস্কৃতি ও গবেষণার প্রধান কেন্দ্র। হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর নির্দেশে (স্বপ্নে) ১৫০৫ খ্রি. এখানে ইমারত নির্মিত হয়। হোসেন শাহীর শিলালিপিতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

এছাড়াও বিভিন্ন শিলালিপিতে মসজিদ নির্মাণের ফযিলত প্রসঙ্গে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন–

রুকুনউদ্দীন বরবক শাহের পুত্র মামসউদ্দীন ইউসুফ শাহের আমলে তিনখানি শিলালিপি সিলেট জেলায় পাওয়া যায়। এতে লেখা আছে– "আল্লাহ বলেছেন, 'মসজিদ খোদার জন্য'। নবী বলেছেন, 'যে দুনিয়াতে মসজিদ নির্মাণ করে আল্লাহ তা'য়ালা বেহেশতে তার জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন'।" এই মসজিদ বরবক শাহের পুত্র ন্যায়পরায়ণ ইউসুফ শাহের নির্মিত।[৩৫৯]

মৌলভীবাজার শহরের তিন মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে গয়বড় মৌজায় খোজার মসজিদ নামে একটি মসটিদ আছে। হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর দরগাহর পাশে যে মসজিদ আছে সেটি শাহজাহানের পুত্র আওরঙ্গজেবের সময়ে সৈয়দ বংশীয় মীর আব্দুল্লাহ শিরাজি পবিত্র মনে তৈরি করেন। এটি ১১১০ হি. সালে নির্মিত হয়।

এছাড়াও বন্দর বাজারের সংলগ্ন জেলখানার নিকটবর্তী শাহ আবূ তুরাবের মসজিদের শিলালিপি থেকে জানা যায় এ মসজিদটি ১১১৬ খ্রি. নির্মিত হয়।

গড়দুয়ারের মজুমদার বাড়ি সংলগ্ন মসজিদের শিলালিপি থেকে জানা যায় উক্ত মসজিদ ১২০০ হি. সালে কানুনগো মসুদবখত মজুমদার তৈরি করেন।

হযরত শাহজালাল (রহ.) মাদ্‌রাসা, মসজিদ ছাড়াও বহুসংখ্যক খানকা প্রতিষ্ঠা করেন। হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর পাণ্ডুয়া ও তাবরিজাবাদের খানকাহর অবদান সম্বন্ধে 'পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামে আলো' নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে, "নিপীড়িত বৌদ্ধ সমাজ ও হিন্দু সমাজের অবজ্ঞাগত অধিকার বঞ্চিত জনগণ দলে দলে এসে তাঁর (শাহজালাল রহ.) পদতলে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তাঁর হাতে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে মুক্তির পথের সন্ধান লাভ তরে। খানকাহ ও মসজিদ ছিল মুসলমানদের প্রধান শিক্ষাঙ্গন।[৩৬০] তাঁর খানকাহ তৎকালে বাংলার সমাজে আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

এভাবেই তিনি তৎকালীন বাংলাদেশের শক্তিশালী একটি মুসলিম সম্প্রদায় গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন।

৩৫৯.আব্দুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

৩৬০.*ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা* (এপ্রিল-জুন, ২০০৩), পৃ. ১৩৪

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

বাংলায় ইসলামী সংস্কৃতির উন্নয়নে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর অবদান শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটির আলোচনা শেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশে ইসলামী সংস্কৃতির উন্নতির সূতিকাগার এবং ইসলামী সংস্কৃতির গৌরবান্বিত অবস্থান সুসংহতকারী হিসেবে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর নাম অগ্রগণ্য। তাঁর আগমনে মানুষ ইসলামী সংস্কৃতির নবগাজরণের স্বরূপ দেখতে পেয়েছে। ইসলামী সংস্কৃতির বিপ্লব ঘটাতে তাঁর ৩৬০ জন সহচরবৃন্দ ছিল। যাঁরা প্রত্যেকেই বাংলাদেশে ইসলামী সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠায় অনন্য ভূমিকা রেখেছিলেন। তাঁদের অবদানে বাংলার মুসলমান প্রকাশ্যে ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুন বীরদর্পে পালন করেছে এবং পৌত্তলিকতা, শিরক, মূর্তিপূজা, জমিদারী-শোষণ, গৌরগবিন্দের সাম্রাজ্যতা, মুসলিম নির্যাতন-নিপীড়ন, বিভিন্ন অপসংস্কৃতি এই বাংলা থেকে উৎখাত করতে পেরেছে। হযরত শাহজালাল (রহ.) আযানের ধ্বনির মাধ্যমে গৌড়গবিন্দের সাম্রাজ্যতার অপসংস্কৃতির ভীত চির বিদায় হওয়ায় আজও বাংলায় মুসলিমদের উন্নত মমশির। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর খানকাহ, মসজিদ-মাদ্রাসা স্থাপন করছেন। বিধায় ইসলামের জয়জয়াকার অবস্থা আজও বিরাজমান। আজ বুকভরে মুসলমানগণ দিবালোকে কুরবানী, আযান, একামত, নামায-রোযা, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, ইসলামী জ্ঞানের গবেষণা চর্চা, ইসলামী সংস্কৃতি চর্চা করতে পারার পিছনে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর অবদান অপরিসীম। বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় তাঁর নেতৃত্বে বিরাট দরবেশ বাহিনী যুল্‌ম, অন্যায়, অসত্যের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম করেন তা আমাদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস। তাঁদের অম্লান স্মৃতি এই দেশের মানুষের মানসপটে চিরভাস্বর ও চিরজাগরুক থাকবে। হযরত শাহজালাল (রহ.) ও ৩৬০ আউলিয়া কর্তৃক সিলেট বিজয়ের পর সিলেট শহরে প্রবেশ করে গৌড়গবিন্দের ঐন্দ্রজালিক পাথর বা শিলকে 'হট' বা 'হটিয়া যা' বলে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর এ আদেশ থেকেই শিলহট, সিলট বা সিলেট নামের উৎপত্তি হওয়া এবং সেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় গোটা বাংলাদেশের মুসলমান গর্বিত ও ইসলামী সংস্কৃতির শক্তিতে বলিয়ান। অত্র অভিসন্দর্ভটিতে হযরত শাহজালাল (রহ)-এর জীবন ও কর্ম–অবদান ফুটে উঠেছে। সুতরাং তাঁর জীবনার্দশকে আমাদের বাস্তব জীবনে প্রতিফলিত করতে পারলেই তাঁর প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হবে। এ লক্ষ্যে 'বাংলায় ইসলামী সংস্কৃতি বিকাশে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর অবদান' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি অন্যতম ভূমিকা রাখবে বলে আশা করি।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

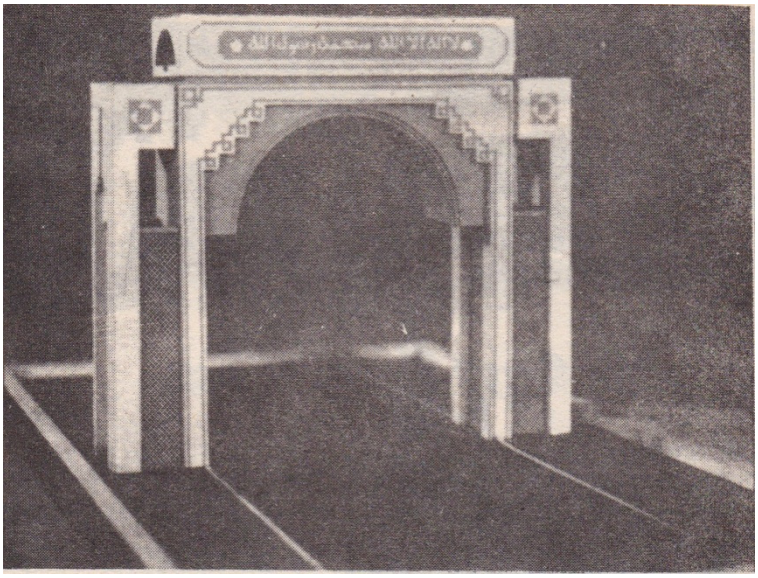

দরগাহ-এ শাহজালাল গেইট

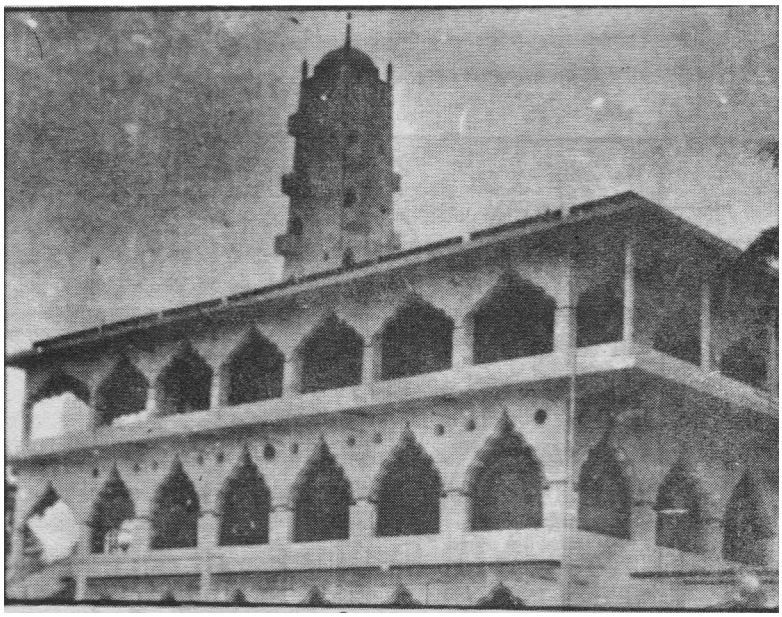

দরগাহ মসজিদ ও মিনারের একটি দৃশ্য

Dhaka University Institutional Repository

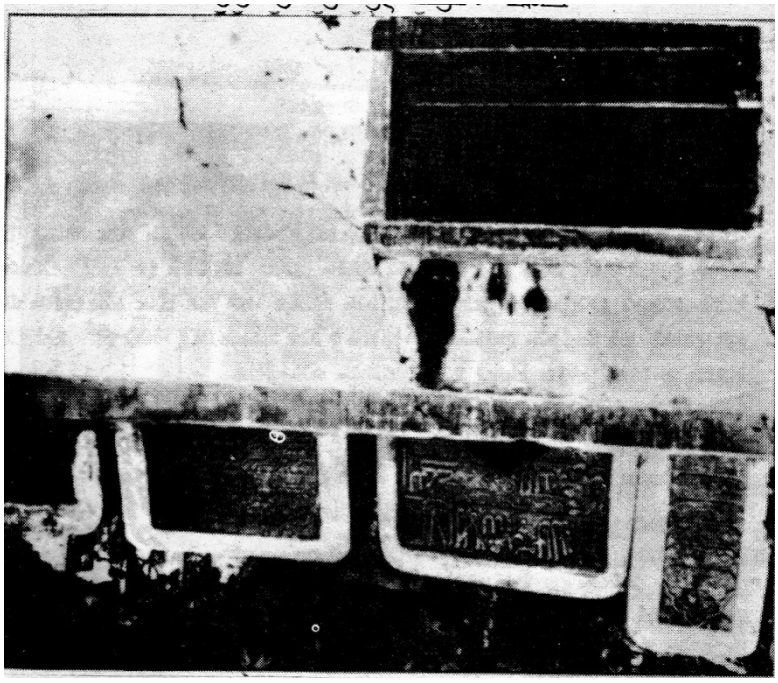

দরগাহ-এ রক্ষিত ঐতিহাসিক শিলালিপি

পশ্চিম এশিয়ার মানচিত্র

Dhaka University Institutional Repository

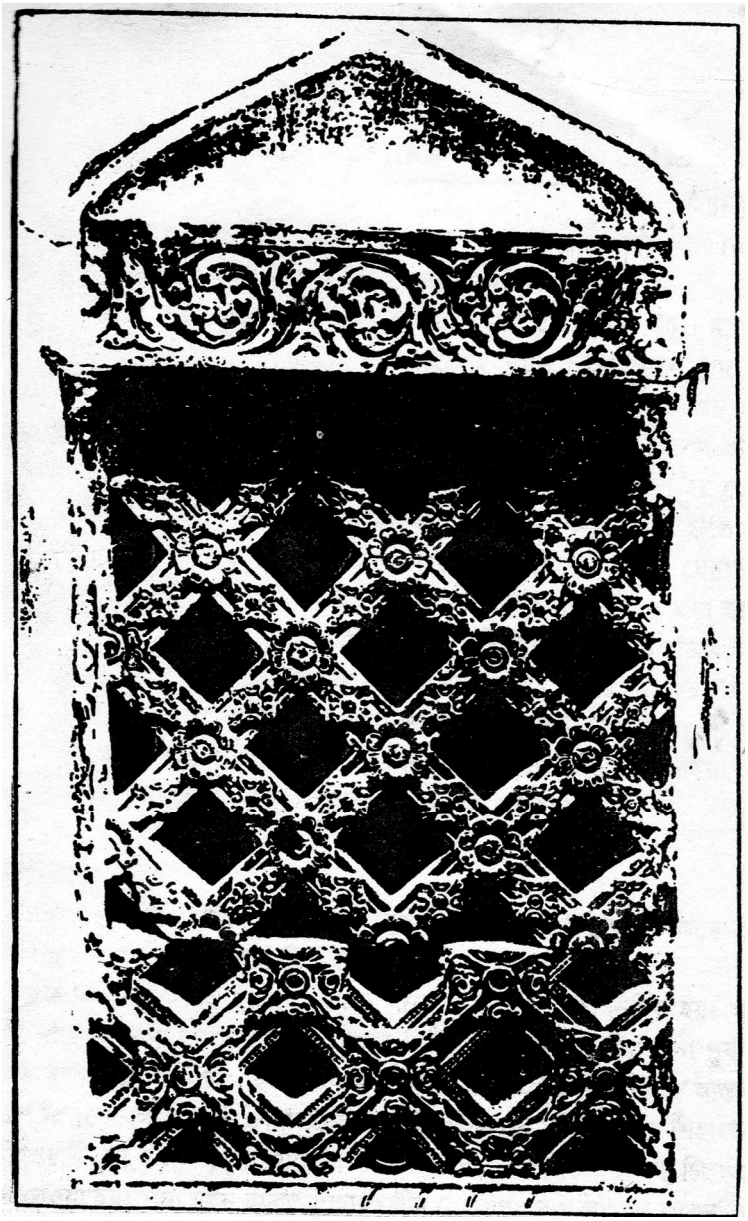

হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর স্মৃতিসৌধের জানাল

Dhaka University Institutional Repository

BARBAK SHAH
Deotala A. H. 868=A. D 1463

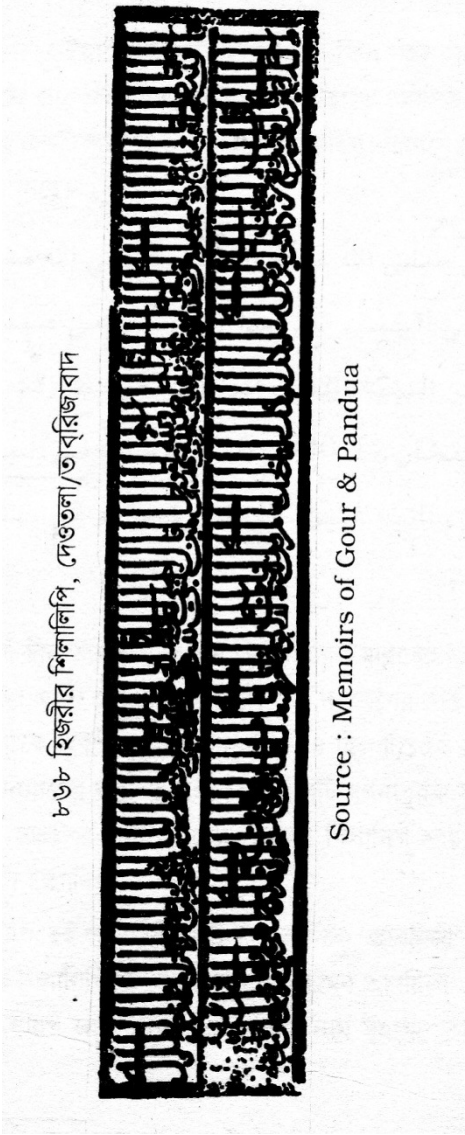

৮৬৮ হিজরীর শিলালিপি, দেওতলা/তাবরিজাবাদ

Source : Memoirs of Gour & Pandua

Dhaka University Institutional Repository

হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর চিল্লাখানা, দেওতলা/তাবরিজাবাদ

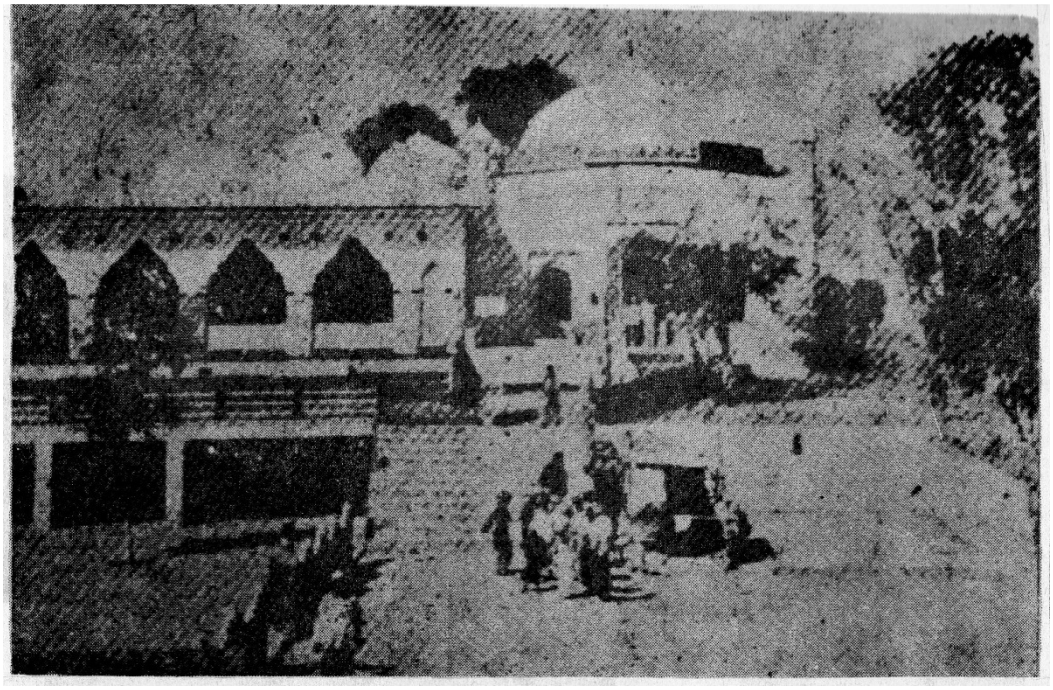

হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর মাযার ও সংলগ্ন মসজিদ

Dhaka University Institutional Repository

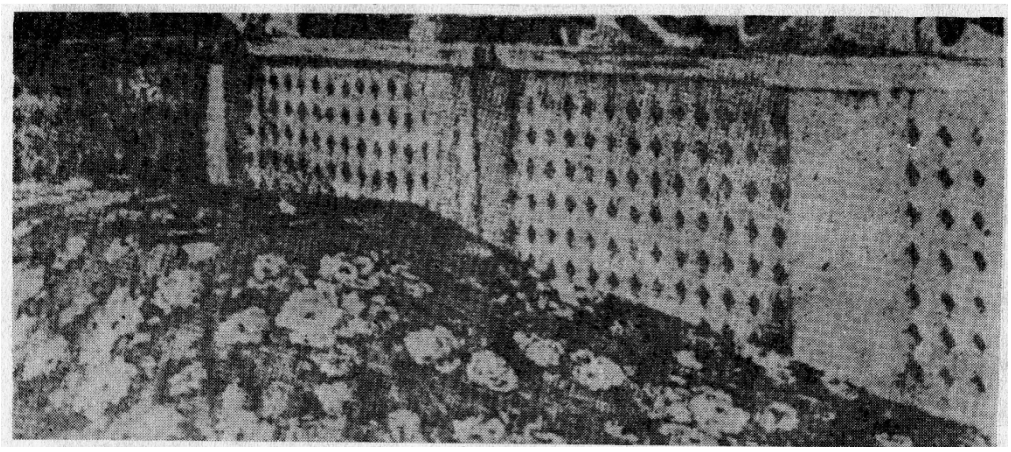

হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর মাযার

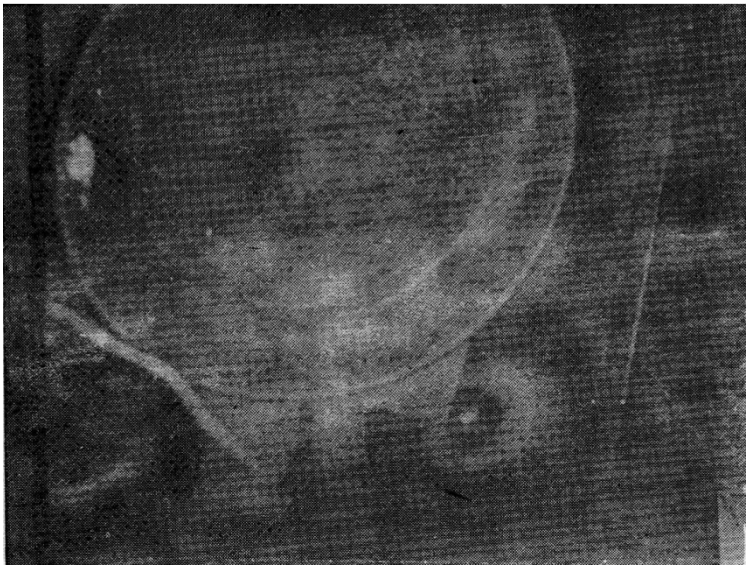

হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর ব্যবহৃত থালা ও বাটি
মাযারের খাদিম (সরকুম) পরিবারে সংরক্ষিত আছে।

Dhaka University Institutional Repository

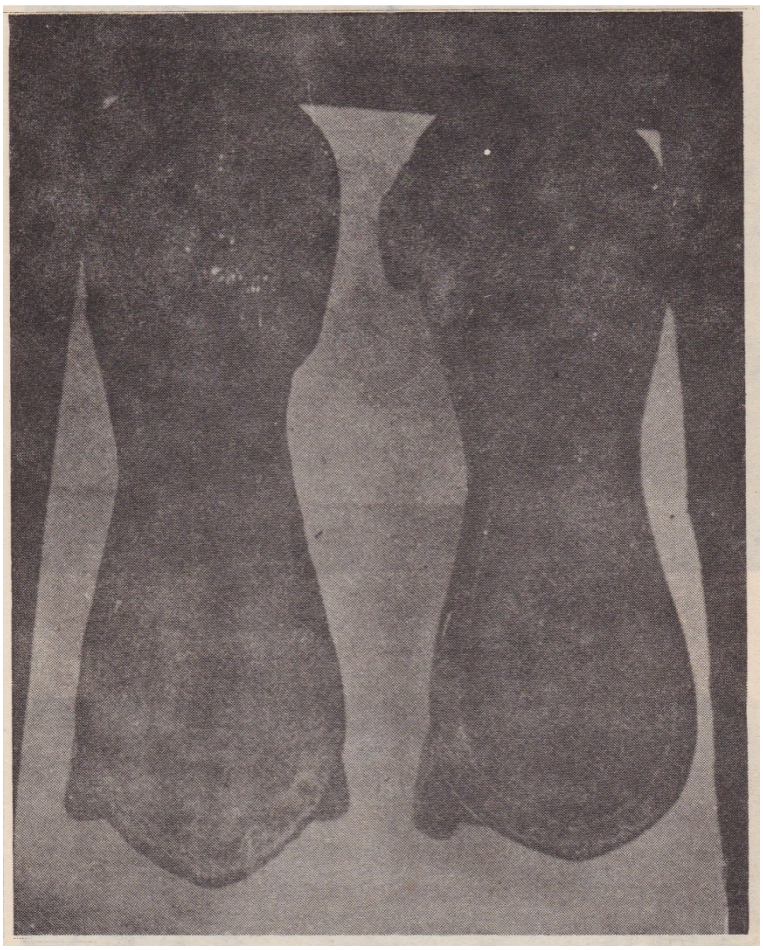

হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর ব্যবহৃত খড়ম
মাযারের খাদিম (সরকুম) পরিবারে সংরক্ষিত আছে।

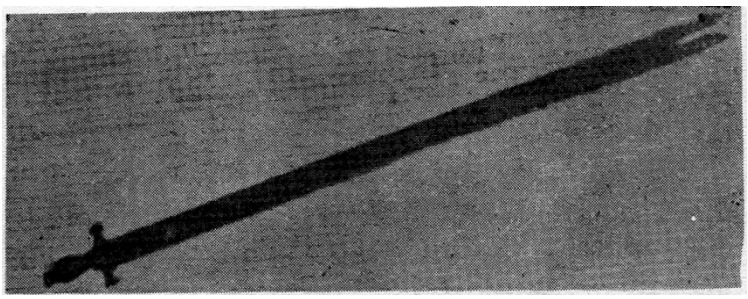

হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর তলোয়ার
মাযারের খাদিম (সরকুম) পরিবারে সংরক্ষিত আছে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

আরবী, উর্দু

- ইবন আবদিল বার : *ইস্তি'আব* (হায়দারাবাদ, দাক্ষিণত্য : ১২২৬ হি.), ৩য় খণ্ড।
- হাফিজ ইবন কাছীর : *কাসাসুল আম্বিয়া* (কায়রো : মাওকা'উ ইয়া'সূর, তা.বি.), ১ম, ২য় খণ্ড।
- ইব্ন জারীর আল-তাবারী : *তারীখুর রসূল ওয়াল মুলূক* (কায়রো : মাওকা'উল ওয়াররাক, তা.বি.), ১ম খণ্ড।
- ইবন জারীর আত-তাবারী : *তরীখুর রাসূল ওয়াল মুলূক* (মিসর : দারুল মা'রিফ, ১৩৫৭ হি.), ৩য় খণ্ড।
- ইবনুল আছীর : *আল-কামিল ফীত তারীখ* (মাওকা'উল ওয়াররাক, তা.বি.)।
- জালালুদ্দীন সুয়ূতী : *তারীখুল খুলাফা* (মিসর : মাওকা' আল-ওয়াররাক, তা.বি.)।
- তাবারানী : *আল-মু'জামুল আওসাত*, (কায়রো : মাওকা'উ জামি' আল-হাদীস, তা. বি.), ১৫শ খণ্ড।
- ইমাম মুসলিম ইবন হাজ্জাজ : *আস-সহীহ*, আল-কুতুব আস-সিত্তাহ (রিয়াদ : মাকতাবাতুর রুশদ, ২০০৫ খৃ.), ১ম খণ্ড।
- লুইস মা'লুফ : *আল-মুনজিদ ফীল-আ'লাম* (বৈরূত : দারুল মাশরিক, ১৯৮৬ খ্রি.)।
- আশ-শাওকানী : *ফাতহুল কাদীর* (বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, ২০০৭ খৃ.)।
- -- : *উর্দু দায়েরায়ে মাআরিফে ইসলামিয়্যা* (দানিশগা, পাঞ্জাব : ১ম সংস্ক., ১৩৯১ হি./১৯৭১ খৃ.), ৭ম খণ্ড।

বাংলা

- মুফতি আজহার উদ্দিন আহমদ সিদ্দিকী : *শ্রীহট্টে ইসলাম জ্যোতি* (সিলেট : ১ম সংস্ক., নভেম্বর ১৯৩৮)।
- মুফতি আজহার উদ্দিন সিদ্দিকী : *শ্রীহট্টে ইসলাম জোতি* (ঢাকা : উৎস প্রকাশন, ২০০২ খৃ.)।
- আব্বাস আলী খান : *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস* (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, জুন ২০০২ খৃ.)।
- আবুল কালাম আজাদ : *ইসলামী সংস্কৃতির রূপায়ণ*, অপ্রকাশিত।
- মাওলানা আব্দুর রহীম : *আল-কুরআ'নের আলোকে উন্নত জীবনের আদর্শ* (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৮ খ্রি.)।
- আবদুল মান্নান তালিব : *আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ ও ইসলাম* (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ২০০১ খ্রি.)।
- আব্দুল মান্নান তালিব : *বাংলাদেশে ইসলাম* (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮০ খৃ.)।

Dhaka University Institutional Repository

- প্রফেসর আহমেদ শরীফ উদ্দিন : *সিলেটের ইতিহাস ও ঐতিহ্য* (ঢাকা : বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, ১ম সংস্ক., জুলাই ১৯৯৯)।
- ডক্টর মোহাম্মদ এছহাক : *ইলমে হাদীসে ভারতীয় উপমহাদেশের অবদান* (ঢাকা : ই.ফা.বা., জুন ১৯৯৩ খৃ.)।
- অধ্যাপক কে আলী : *মুসলীম বাংলার ইতিহাস* (ঢাকা : আলী পাবলিকেশন্স, ১৯৯০ খৃ.)।
- চৌধুরী আব্দুল মালিক : *হযরত শাহজালাল* (কলিকাতা : ওরিয়েন্টাল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিসার্স লিমিটেড, তা.বি.)।
- চৌধুরী গোলাম আকবর সাহিত্যভূষণ : *ইসলাম জ্যোতি হযরত শাহজালাল (র)* (সিলেট : ১৯৭০ খৃ.)।
- চৌধুরী নূরুল আনোয়ার হোসেন দেওয়ান : *সিলেট বিভাগের ইতিহাস* (ঢাকা : সৈয়দা তাহেরা বেগম, ১ম সংস্ক., ২০০৬ খৃ.)।
- ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন : *ইসলামী সংস্কৃতি, জাতীয় সম্মেলন স্মারক* (ঢাকা : জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিষদ, ২০০৪ খ্রি.)।
- দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী : *হযরত শাহজালাল (র)*, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় সংস্ক., ১৯৯৫ খৃ./১৪১৬ হি.)।
- দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ : *সিলেটে ইসলাম* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তা.বি.)।
- নাসির হেলাল : *যশোর জেলার ইসলাম প্রচার ও প্রসার* (যশোর : সীমান্ত প্রকাশনী, নভেম্বর ১৯৯২ খৃ.)।
- নিজামী মালিক আহমদ : *দি লাইফ এন্ডটাইম অব ফরিদউদ্দিন গঞ্জেশকর* (ভারত : আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৫ খৃ.)।
- ফজলুর রহমান : *সিলেটের একশত একজন* (সিলেট : ফখরুল কবির খাঁ, ১ম সংস্ক., এপ্রিল ১৯৯৪ খৃ.)।
- আ. ন. ম. বজলুর রশীদ : *আমাদের সূফী সাধক* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তা.বি.)
- মালিক আনোয়ার : *সিলেট : ভাষা বৈচিত্র্য ও শব্দ সম্পদ* (ঢাকা : ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২০১৩ খৃ.)।
- মাওলানা সৈয়দ মোঃ মিজানুর রহমান : *হযরত শাহজালাল ও শাহ পরান (র.)*, (ঢাকা : রাবেয়া বুক হাউস, ১ম প্রকাশ, ২০১৪ খৃ.)।
- সৈয়দ মুর্তজা আলী : *হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস* (ঢাকা : উৎস প্রকাশন, ২য় সংস্ক., তা.বি.)।
- ড. মোহাম্মদ মুমিনুল হক : *সিলেটবিভাগের ইতিবৃত্ত* (ঢাকা : গতিধারা, ৪র্থ সংস্ক., ২০১০ খৃ.)।
- সৈয়দ মোস্তফা কামাল : *সিলেট বিভাগের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি* (সিলেট : রেনেসা পাবলিকেশন্স, ফেব্রুয়ারি ২০০০ খৃ., ১ম সংস্ক.)।
- সৈয়দ মোস্তফা কামাল : *সিলেট বিভাগের পরিচিতি* (সিলেট : রেনেসা পাবলিকেশন্স, ২০০৪ খৃ., ১ম সংস্ক.)।

Dhaka University Institutional Repository

- ড. এম. এ. রহিম
  অনু.: মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান : *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২য় সংস্ক., জুন ২০০৮ খৃ.), ১ম খণ্ড।
- এম. এ. রহিম : *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮২ খৃ.), ২য় খণ্ড।
- আলহাজ মাওলানা মোঃ শহীদুল ইসলাম : *হযরত শাহজালাল ও শাহ পরান (রহ.)*, (ঢাকা : সালাহউদ্দিন বইঘর, ২০১৫ খৃ.)।
- ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ : *ইসলাম প্রসঙ্গ* (ঢাকা : রেনেসাস প্রিন্টার্স লি., ১৯৬৩ খৃ.)।
- এ. জেড. এম শামসুল আলম : *হযরত শায়খ জালাল (রহ.)*, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩ খৃ.)।
- এ. জেড. এম শামসুল আলম : *হযরত শাহজালাল কুনিয়াভি (রহ.)* (ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল লি., ৩য় সংস্ক., আগস্ট, ১৯৯৬ খৃ.)।
- এ. জেড. এম শামসুল আলম : *মুসলিম সংস্কৃতি* (ঢাকা : মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ২০০২ খ্রি.)।
- শাহ ওয়ালী উল্লাহ : *জীবনী গ্রন্থ, শাহজালাল (রহ.)* (ঢাকা : ছাফা বুক করপোরেশন, ১৯৯৭ খৃ.)।
- সম্পাদনা পরিষদ : *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ৫ম সংস্ক., ২০০৭ খৃ.), ১ম খণ্ড।
- সম্পাদনা পরিষদ : *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১ম সংস্ক., ১৯৯৭ খৃ.), ২৩শ খণ্ড
- সম্পাদনা পরিষদ : *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ৫ম সংস্ক., ২০০৭ খৃ.), ১ম খণ্ড
- সম্পাদনা পরিষদ : *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা : ই.ফা.বা., ২য় সংস্ক., নভেম্বর ১৯৮৭ খৃ.), ২য় খণ্ড।
- আলহাজ হযরত মাওলানা সিরাজুল ইসলাম : *হযরত শাহজালাল (রহ.) ও শাহ পরান (রহ.)-এর জীবনী* (ঢাকা : তানিয়া বুক ডিপো, ৫ম সংস্ক., ২০১৬ খৃ.)।
- অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় : *বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর (১৩৩৮-১৫৩৮)* (ঢাকা : খান ব্রাদার্স এন্ড বেগ, এপ্রিল ২০০০ খৃ.)।
- সুরেন্দ্র কুমার দাস শ্রী চৌধুরী : *শাহজালালের মাটি* (শ্রীহট্ট : শ্রী কনীন্দ্র চন্দ্র সা কুন্টি চাঁদ প্রিন্টিং ওর্য়াক, ১৩৪৪ বাংলা)।
- হাসানদানী আহমদ : *বিব্লিওগ্রাফী অব দি মুসলিম ইন্সক্রিপশন্স অব বেঙ্গল* (এপেনডিক্স-২, দি জার্নাল অব এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান, ঢাকা ১৯৫৭ ভল্যুম-২)।
- --- : *বাংলা একাডেমী চরিতাবিধান* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২য় সংস্ক., জুন ১৯৮৫ খৃ.)।

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজি

- B. C. Allen, C. S. : *Assam District Gazetteers,* Vol. ii, Sylhet (1905)
- Azhar Uddin Ahmed : *Shahjalal and his Khadims* (Sylhet : Welsah Mission press, 1914).
- Dr. Enamul Huq : *Sufism in Bengal* (Dhaka : 1975).
- HAR Gibb : *Ibn Buttyta : Travels in Asia and Africa,* London, 1928.
- --- : Provincial Gazette rs of India, Eastern Bengal and Assam
- -- : *Inseription of Bangla,* Vol-iv

পত্র-পত্রিকা

- ওয়াইজড : *জার্নাল অব এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল*, কলকাতা।
- আব্দুল করিম : শাহজালাল (রহ.), *বাংলাপিডিয়া*, ভার্ষন ২.০.০, প্রকাশকাল ২০০৬ খৃ.।
- ড. আবদুল করিম, : *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৭১ বাংলা।
- মোহাম্মদ আব্দুল গফুর : *অগ্রপথিক, সীরাত সংখ্যা, মহানবী (সা.)-এর যুগে উপমহাদেশ* (ঢাকা : ই.ফা.বা, অক্টোবর, ১৯৮৮ খৃ.)।
- সৈয়দ আলী আহসান : অগ্রপথিক, ১০ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ইসলামের আরম্ভ ও ক্রমধারা (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খৃ.)।
- আহমদ হাসানদানী : *বিব্লিওগ্রাফী অব দি মুসলিম ইন্সক্রিপশন্স অব বেঙ্গল* (ঢাকা : ১৯৫৭ খৃ.), এপেনডিক্স-২, দি জার্নাল অব এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান, ভল্যুম-২।
- শ্রী চক্রবর্তী সাহিত্য সিন্দু দীনকান্ত : *পীর শাহ জালাল, মাসিক শ্রী ভূমি* (করিমগঞ্জ : শ্রীভূমি কার্যালয়, ভাদ্র ১৩২২ বাংলা)।
- চৌধুরী নুরুল আনোয়ার হোসেন দেওয়ান : *আমাদের সুফিয়ায়ে কিরাম, অগ্রপথিক সংকলন* (ঢাকা : ইফাবা, ১ম সংস্ক., জুন ১৯৯৫)।
- ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন : *ইসলামী সংস্কৃতি, জাতীয় সম্মেলন স্মারক* (ঢাকা : জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিষদ, ২০০৪ খৃ.)।
- কবি দিলওয়ার, : *সাপ্তাহিক বিপ্লব*, ঢাকা, ২৪ আগস্ট, ১৯৮৩ খৃ.।
- এম. নাজির আহমদ : *মাসিক পৃথিবী, বাংলাদেশে ইসলামের আগমন* (ঢাকা : জানুয়ারি, ১৯৯৭ খৃ.)।
- ড. ব্লকম্যান : *জার্নাল অব এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল* (কলকাতা : হারমিট অব কুনিয়া, ১৮৭৩ খৃ.)।

Dhaka University Institutional Repository

- মুহিউদ্দিন খান : *মাসিক মদীনা, বাংলাদেশে ইসলাম কয়েকটি তথ্যসূত্র* (ঢাকা : জানুয়ারি, ১৯৯২ খৃ.)।
- মুহিউদ্দিন খান : *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, বাংলাদেশে ইসলাম কয়েকটি তথ্যসূত্র *(এপ্রিল-জুন ১৯৯৮)*, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন)।
- সহিদুর রহমান : *অগ্রপথিক, রংপুরে ইসলাম প্রচার* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল ১৯৯৭ খৃ.)।
- --- : *ইসলামী ফাউন্ডেশন পত্রিকা* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৫ খৃ.)
- --- : *আল-ইসলাহ*, চৈত্র ১৩৭৪ বাংলা, পৃ. ৩১২-১৫, প্রবন্ধ : এ. জেড. এম শামসুল আলম।
- --- : *আল-ইসলাহ*, বৈশাখ–আশ্বিন ১৩৬৪ বাংলা, পৃ. ৯৭-৯৮, প্রবন্ধ : ড. এম আব্দুল কাদের।
- --- : *ইসলামী ফাউন্ডেশন পত্রিকা* (ঢাকা : ইফাবা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৫ খৃ.)।
- --- : *মাসিক ভারতবর্ষ* (২৯শ বর্ষ, ২খ, ১ম সংস্ক., পৌষ ১৩৪৮ বাংলা)।
- --- : *জার্নাল অব এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল* (জে.এ.এস.বি কলকাতা ১৯২২ খৃ.)।
- --- : *মাসিক ভারতবর্ষ* (২৯শ বর্ষ, ২খ, ১ম সংস্ক., পৌষ ১৩৪৮ বাংলা)।
- --- : http://ar.wikipedia.org/wiki
- --- : https://www.sust.edu/about/university-facts-acts dated : 18.07.2019

Dhaka University Institutional Repository